ঈশ্বরের
বাগান
অতীন
বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ কত কিছুই জানে না! এই আমার মত বইপোকাও জানত না যে নীলকন্ঠ পাখির দেশে একটা ট্রিলজি। আপনাদের কল্যানে সেটা জানলাম,আরও জানলাম যে অলৌকিক জলযান দুইখন্ডে ও ঈশ্বরের বাগান চারখন্ডে রচিত।। জানলাম,কিন্তু সব পর্বগুলি পাই না। অগত্যা সামনে যা পেলাম,তাই দিয়েই আপনাদের পাতে দেওয়ার কথা মনে হল। এটা দ্বিতীয় পর্ব,কথা দিলাম,সব পর্ব এখানেই দেব। হয়ত ধারাবাহিকতা ঠিক থাকবে না। তা নাই বা থাকল, কত কিছুতেই তো ধারাবাহিকতা থাকে না। এই বইগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুপ্রেরনা পেয়েছি,সাঁঝবাতির রুপকথার কাছ থেকে।

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

আবাদ	নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে (১ম ও ২য় পর্ব)
মানুষের ঘরবাড়ি	অলৌকিক জলযান (১ম ও ২য় পর্ব)
মানুষের হাহাকার	ঈশ্বরের বাগান (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব)
দেবী মহিমা	রাজা যায় বনবাসে
নগ্ন ঈশ্বর	সব ফুল কিনে নাও
দুঃস্বপ্ন	ফেনতুর সাদা ঘোড়া
বলিদান	শেষ দৃশ্য
রূপকথার আংটি	টুকুনের অসুখ
সুখী রাজপুত্র	গম্বুজে হাতের স্পর্শ
মানুষের সত্যাসত্য	জীবন মহিমা
রাজার বাড়ি	একটি জলের রেখা
সমুদ্র মানুষ	দুষ্টু হাইতিতি
পঞ্চযোগিনী	ধ্বনি প্রতিধ্বনি
দ্বিতীয় পুরুষ	বিদেশিনী
সুন্দর অপমান	মামার বাড়ি ভূতের বাড়ি
উপেক্ষা	সমুদ্রযাত্রা

গল্প সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব)

॥ এক ॥

এমন চোখে তাকাল অতীশ যে হাসিরাণী সহ্য করতে পারছে না। যেন মানুষটা শুধু তাকে দেখছে না, তার অভ্যন্তরও দেখার চেষ্টা করছে। শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। মানুষটাকে দু আড়াই-বছর ধরে জানে বলেই তার এই দেখা মন্দ লাগছিল না। কেমন নেশা ধরিয়ে দেয়। আর এই নেশাই রাতে কুম্ভ ভাঙিয়ে খায়। হাসি মনে মনে ঠোঁট টিপে হাসল। কুম্ভ পাশা-পাশি বসে আছে বলে অতীশের চোখ কোন দিকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারলে, ফের হয়তো লক্ষ্মীর পট কেনার মতো শোরগোল তুলে দিত। লক্ষ্মীর পট নিয়ে, কুম্ভ তাকে ধরে পিটিয়েছিল পর্যন্ত। কিন্তু এক জায়গায় কাত—না, হাত দেবে না। ছাড় বলছি। আবার শাড়ি তুলছ। এক ঝটকা। কুম্ভ লাথি খেয়ে নিচে পড়ে গেলেও দমে যায় না। জ্বালা উঠে গেলে আর কী করে! তখন সোহাগ, তখন ভালবাসা—কি চাই, সব দেব। সকালে উঠলে দেখা যাবে কুম্ভ নিজে উঠেই চা করে বউকে ডেকে তুলছে।

কুম্ভ অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, চায়ে মিষ্টি ঠিক হয়েছে দাদা ?

অতীশ হাসির দিকেই তাকিয়েছিল। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। একেবারে পুতুলের মতো, রবারের মতো নরম। সে বলল, তুমি খুব সুন্দর হাসি।

একি কথারে বাবা ! কুম্ভ হতবাক।

অতীশ এবার কুম্ভবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি খুবই ভাগ্যবান কুম্ভ-বাবু। আপনার পাটাতন বড় মজবুত। হড়কাবার ভয় কম।

কুম্ভ অবাক। সে একা একমাসে কত করেছে কারখানার জন্য তার একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিল। একটা কথাও কানে গেল না ! বানচুত হাসিরাণীকে মজাবার তালে আছে। কিন্তু সে জানে, মনে মনে যতই বিদ্বেষ থাকুক মানুষটার প্রতি তার আচরণে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না সেটা। সে জানে, অতীশবাবু খুশি হলে বৌ-রাণী খুশি হবে। অতীশবাবুর সার্টিফিকেটই হলগে তার জীবনের মোক্ষ। কারণ সে বুঝেছে, বৌ-রাণী থাকতে পেছনে লেগে কিছু হবে না।

অতীশের অবর্তমানে সে যেখানে যা প্রণামী দিতে হয় দিয়ে কাজ উদ্ধার করে এনেছে। তাতে তারও কিছু থাকে। আর থাকে বলেই দৌড়-ঝাঁপ করা। সে দৌড়-ঝাঁপ করার সময় আকারে ইঙ্গিতে এমন সাধু থাকার চেষ্টা করেছে যে, অতীশের মতো উপরয়ালার সঙ্গে কাজ করতে গেলে এ-ছাড়া তার উপায় নেই। বৌ-রাণীর সঙ্গে তার কোনো হট-লাইন নেই। সে কাবুলবাবুর মারফত একটা

হট-লাইন বৌ-রাণীর সঙ্গে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখছে, বড়ই অকেজো।

এই একমাসে কম করে হলেও কুম্ভ একশবার বলেছে, রাজার কপালগুণ ভাল, নাহলে এমন সৎ ভালমানুষ মেলা ভার। অতীশের গুণগান না করলে বৌ-রাণীর কাছ থেকে কাজ বাগাতে পারত না। সে বলেছে, কারখানা যে লাভের মুখ দেখেছে সেটা মানুষটার সৎ আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য। এ-সব সে কাবুলকে বলেছে। কুম্ভ জানে, কাবুল বৌ-রাণীর কানে ঠিক তার কথা তুলে দেবে। সে অতীশের আজ্ঞাবহ দাস। সুতরাং রাজা চোখ বুজে টাকা ঢাললেও সব ঠিক থাকবে। এই ফুসলানোটা ক্রমাগত একমাস ধরে চালিয়ে গেছে। সব মানুষকে দিয়ে সব হয় না। দিতে-থুতে হলে সে আছে। অতীশ-বাবুর কানে না গেলেই হল। এখন ভয়, সব না লোকটা তছনছ করে দেয়। খুবই অঙ্ক কষে এগোচ্ছিল—কিন্তু একখানা যা এক বগ্গা স্বভাব, যে কোন মুহূর্তে বলে দিতে পারে—পতিত জমিটাতে নতুন বিল্ডিং করে কী হবে! ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট। এখন কারখানায় দরকার ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল। তা না হলেই সব যাবে। নতুন বিল্ডিং করার সময় যে টাকা লোটার ফন্দি করে রেখেছে সেটা যাবে। হাসিরাণীকে সুন্দর লাগছে লাগুক, কিন্তু সবটা ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট বললে এক মাসের খাটা-খাটনিই পণ্ডশ্রম। পুরানো বাতিল ক্যানেস্তারা মেশিনে যে কমিশন থাকবে তাও যাবে। সবই লোকটা গোলমাল করে দিতে পারে। তক্কে তক্কে ছিল কখন আসে। এবং জপানোর কাজটা হাসিরাণীকে সামনে রেখেই শুরু করা গেছিল। লোকটার মাথায় যে আগের মতোই ভূত চেপে আছে! কারখানার কথায় পাটাতনের কথা আসে কি করে!

সে তবু শেষ চেষ্টা ভেবে বলল, দাদা অফিসে যাবার আগে এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নেবেন। এক সঙ্গে বের হয়ে যাব।

কুম্ভ বুঝতে পারছিল, এ শুয়োরের বাচ্চাকে সহজে কাবু করা যাবে না। আস্তে আস্তে করতে হবে। বংশদণ্ডটি তৈরী করে রেখেছে। খুব মোলায়েম করে ঢোকাতে হবে। সে আর কারখানার কোনো কথাতেই গেল না।

তখনই সহসা অতীশ খাওয়া থামিয়ে বলল, আচ্ছা কুম্ভবাবু, আপনি চারু বলে কাউকে চেনেন?

কুম্ভ ভূত দেখার মতো কথাটাতে আঁতকে উঠল। লাইনে আনার জন্য একটা নর্দমার মধ্যে ফেলে দেবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেটা বুঝি ধরা পড়ে গেল। এই নিয়ে যদি কথা ওঠে! যা একখানা এক বগ্গা মানুষ, সহজেই সব বলে দিতে পারে—কিছু বিশ্বাস নেই। কাবুলটাও জানে তার মাথার

মধ্যে কূট বুদ্ধির একটা আড়ত আছে। অতীশবাবু যদি বলে দেয়, তবে বৌ-রাণী ধরেই নেবে, সবই কুম্ভর কাজ। সে সব পারে। পিয়ারিলালকে ধরে একটা বেশ্যা মাগি ধার করে এনে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল কুম্ভ। ফাঁস হয়ে গেলে বৌ-রাণী তার চাকরিটাও খতম দিতে পারে। বৌ-রাণীর পেয়ারের লোককে একটা বেশ্যা মাগি ধরিয়ে দেওয়া এ-বাড়ির কেউ বরদাস্ত করবে না। তার বাবা যে রাজার এত প্রভাবশালী আমলা সেও না। চারুর ব্যাপারে ঠিক তাকেই সন্দেহ করছে বাবুটি। অতীশবাবু তার জবাবের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে।

সে বলল, চারুটা আবার কে? চারু-ফারু বলে কাউকে আমি চিনি না।

অতীশ বলল, সেই! পিয়ারীলালের কাছে একবার আজ যাব। পিয়ারী-লাল যে বলল তার ভাইজি হয়! রাতের ট্রেনে আমার সঙ্গে তুলে দিল! তারপরই মাথাটা অতীশের কেমন করতে থাকে—সত্যি চারু! না অন্য কেউ। না কি সেই ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়ে চারু নামক এক নারী মহিমায় নিমজ্জিত হয়েছিল—সেই এক মরীচিকা বুঝি। তখনই অতীশ দেখল, হাসিরাণী মেয়ের কাঁথা পাল্টাবার জন্য ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। মেয়েটা বড় বেশি চেঁচাচ্ছিল।

কুম্ভ গম্ভীর মুখে বলল, ও-সব বলতে যাবেন না। কী ভাবতে শেষে কী ভাববে! পিয়ারীলাল লোকটা সুবিধের নয়।

—কিন্তু চারুকে যে আমার সঙ্গে তুলে দিল!

—হতেই পারে না।

—পিয়ারীলাল বলল, ওর ভাইঝি।

—ওর ভাইঝি আছে জীবনেও শুনিনি।

অতীশ বলল, বহরমপুরে চারুর কে আছে! কিন্তু বহরমপুর আসার আগেই দেখি কামরায় নেই! কোথায় গেল!

কুম্ভ এবারে হা হা করে হেসে উঠল। বলল, দাদা আপনি ঠিক ছিলেন তো!

অতীশ বলল, সেই! অতীশ ওঠার সময় বলল, আপনার ঈশ্বরও আছে, শক্ত পাটাতনও আছে। বুঝতে পারছি আমার কিছু নেই। আমার কিছুই ঠিক থাকার কথা নয়।

অতীশবাবু বের হয়ে গেলে কুম্ভ কেমন বোকার মতো কিছুক্ষণ বসে থাকল। মগজ কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। অতীশবাবু চারুকে খুঁজছে।—চারু! চারুকে চাই। আচ্ছা লোকটা যে পাগল হয়ে যাচ্ছে, চারুকে কেন্দ্র করেই সেটা শুরু করা যেতে পারে। কুম্ভ কেমন বিড়বিড় করে বকছিল।

হাসিরাণী ঘর থেকে বের হয়ে বলল, এ কি বসে থাকলে কেন! বাজারে যাবে না! কখন রান্না করব! দাদাকে আবার খেতে বলেছ।

—দাদা! হুঁ।

হাসিরাণী যেন এই মানুষটাকে কিছুতেই বুঝতে পারে না। সকাল ভাল করে হতে না হতেই কাবুল জানালায় এসে ডেকে তুলেছিল কুম্ভকে—এই কুম্ভ শিগগির ওঠ্। তোর ম্যানেজারবাবু এসে গেছে। সারারাত ধস্তাধস্তি চলেছে।

—ধস্তাধস্তি!

—তাই বাবু। বৌদিকে তখনই বলেছিলাম ও নেই, বাসা খালি, খালি বাসা রঙ করানো ঠিক হবে না। বাসাটাকে বৌদি ভদ্রস্থ করতে চেয়েছিল। নিজে পছন্দ করে সব কিনেছে। আর মধ্য রাতে বাড়ি থেকে ফিরে একেবারে পাগলামির চূড়ান্ত। বৌদির সোফা সেট, বাতিদান খাট সব টেনে নিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

কুম্ভ শুনে মজা পাচ্ছিল। সে এমনই হোক চায়।

একজন বিশ্বাসী মানুষ চাই। কোম্পানী লুটেপুটে খাচ্ছে, মাথায় একজন বিশ্বাসী মানুষ বসিয়ে দাও। কুমার বাহাদুর শেষে এই হাফ ম্যাড লোকটাকে এনে হাজির করেছিলেন। দু-বছরে যা দেখাল! মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। বৌকে বাপের বাড়ি রেখে গেছে—কেমন এক অপার্থিব ঘোরের মধ্যে থাকে লোকটা! এখন সেই কি না প্রশ্ন করে গেল, চারুকে চেনেন? পিয়ারীলালের ভাইঝি চারু। বৌ-রাণীর পেয়ারের লোক এই অতীশবাবুটিকে চারু নামক এক বেশ্যা মাগি ধরিয়ে দিয়েছে, জানতে পারলে যে কি হবে! মগজ ঘামছিল কুম্ভর। সে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

কুম্ভ বৌর তাড়া খেয়ে উঠে বসল। বাজারে সকালে না গেলে পছন্দ মতো জিনিস কেনা যায় না। সকালে উঠেই বলে এসেছিল, দাদা, কাল রাতে কিছু ঠিক খাওয়া হয়নি। কখন এলেন? ট্রেন লেট ছিল বুঝি? হাসি আপনার জন্য চা করছে।

আসলে কুম্ভ জানে এই অতীশবাবু নামক পদার্থটিকে হাতের কব্জায় না আনা পর্যন্ত কাজ হাসিল হচ্ছে না। কিন্তু এত বেয়াড়া লোক নিয়ে চলাও দায়। এই যে চা খাবার সময় বাবুটির অনুপস্থিতিতে কারখানার এত কাজের খবর দিল তার জন্য কোন ধন্যবাদ নেই। কেমন ঘোরের মধ্যে থাকে সব সময়! হাসিরাণীকে কেবল দেখছিল।

সে বের হয়ে দেখল, কোনদিকে গেল! প্রাসাদসংলগ্ন মেসবাড়ি বাবুপাড়া, বাবুর্চিপাড়া, গোলঘর—আস্তাবলের দিকটায় এখন গ্যারেজ—সেখানে কুমার বাহাদুরের গাড়ি, বৌ-রাণীর গাড়ি, প্রাইভেট সেক্রেটারির গাড়ি থাকে। চল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি জুড়ে এই বাড়ির একটাই সদর রাস্তা। গেট দিয়ে ঢুকে রাস্তাটা প্রাসাদটাকে চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে।

মাথায় এখন তার চারু। পিয়ারীলালের ভাইঝি বলে বাবুটির সঙ্গে একই গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আসলে চারু যে পিয়ারির রক্ষিতা, ঠিক রক্ষিতাও বলা যায় না, দরকারে তাকে বাবুদের কাছে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে—বলতে গেলে চারু পিয়ারির হয়ে ভাড়া খাটে কিন্তু এই একটা লোক এসেই কারখানার দু নম্বরি মাল বানাবার ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে, পিয়ারি এবং অনেককে পথে বসাবার তালে ছিল—সেটা আর হতে দিচ্ছে না। সব রকমের ফন্দি ফিকির যখন ব্যর্থ তখনই কুম্ভর এই নষ্টামি মাথায় পেরেক ফুটিয়ে দিয়েছিল—আরে তাইত!

—শেঠজী, কিছু করা যাচ্ছে না। ম্যানেজার রাজি না।

—রাজাকো বলিয়ে কিছু কোরে দিন। এতকালের ব্যওসা। পথে বসে যাব।

—দু-নম্বরী মাল হবে না।

—ম্যানেজার সাবকো বলিয়ে হামি সব করবে ওসকা লিয়ে।

—আরে শেঠজি বহুত বকর বকর করতা। দ্যাখতা হায় ত আপ, কি চীজ আছে! সাধু পুরুষ।

—তব কেয়া হোগা?

—মরেগা।

—লেকিন ছ-মাহিনা হয়ে গেল, গদি বসে গেলে কেয়া হোবে?

—মুল্লুক মে চলে যাবে। লোটা লেকে আয়া, লোটা লেকে চলা যায়গা। কৈ দিককত নেই আছে।

—বাবু ঘর যায়গা।

তখনই কুম্ভ বুঝেছিল, হাসিরাণী বাবুর চোখে কাজল পরিয়ে দিয়েছে। আসলে জ্বালা ভেতরে। জোয়ান মানুষের বৌ অসুস্থ কুম্ভ টের পায়। উপোসী ছারপোকা। নরম গদিতে শুইয়ে দাও—ব্যস হয়ে গেল। সে আর পিয়ারি দুজনে মিলে ফন্দিটা এঁটেছিল—দাও তুলে একই গাড়িতে।

রাত দশটার ট্রেনে যাবে বাড়ি। বাবু একা যাচ্ছে। চারুকে ভাইজি বলে ফার্স্ট ক্লাসে তুলে দিয়ে এস। বাবুর জন্য একখানা টিকিট কেটে রাখ। যেন জানই না, হঠাৎ দেখা স্টেশনে, বাবু, ভাইজি যাচ্ছে। বহরমপুর যাবে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বলবে কাশীমবাজার। ব্যস হয়ে গেল। টিকিট ধরিয়ে বলবে, কাজে ফেঁসে গেছ যেতে পারছ না—বাবুটির দয়া চাইবে। তুলে দাও, বাকিটা দায় চারুর। চারু পারবে।

—লেকিন এক রাত? কুম্ভ একটু থেমে কথাটা বলেছিল।

—কেয়া বাত ?

—ফাঁস হো জায়গা তো তুমভি মরেগা, হামভি মরেগা।

—বহুত লীলা খেলা চলতা হ্যায়। লীলা খেলা সামজা ?

—লীলা ?

—আরে লীলা বোঝতা নেহি। লীলা মানে প্রেম মহব্বত, সামজা ?

—প্রেম মহব্বত কিসকা সাথ ?

—আর কিসকা সাথ, খোদ বৌ-রাণীকা সাথ।

—বহু-রাণী ! রাজাকা বহু !

—হাঁ হাঁ।

—আরে রাম রাম ! বহুত খারাপ বাত ! রাজাবাবু কুছ বলে না ?

—ভেঁড়া আছে। ভেঁড়া সামজা ?

—ভেড়া !

—আরে ম্যাড়া সামজা ?

—ম্যাড়া !

—ও ভি নেই সামজা ? তুমকো কোন টিকিট দিয়া মল্লুক ছোড়নেকো ? ম্যাড়া নেই সামজা ?

—টিকিট তো হাম খোদ কেটে লিয়েছি বাবু।

—ধুস্। উজবককা মাফিক বাত বোলতা হ্যায়। হাম বোলতা হ্যায় ম্যাড়া হলগে পাঁঠটা। পাঁঠটা সামজা ?

—হাঁ হাঁ।

তব রাজা বহু-রাণীকা এক রাম-পাঁঠটা। পোষতা হ্যায়। বৌ-রাণী রাজি হোনেসে সব ঠিক হ্যায়। কই গড়বড় হবে না। ফাঁস হয়ে যায়গা তো হাম মর যায়গা, তুম মর যায়গা।

—কাহে ?

—কাহে তুম জানতা নেই। দু-সাল দেখতা হ্যায়, কেয়া চিজ সামজা নেহি হ্যায়। পচা টাকার গন্ধ পায়।

॥ দুই ॥

অতীশ রাজবাড়ির গেটে ট্যাকসি দাঁড় করাল। মিণ্টুকে বলল, নামো। টুটুলকে কোলে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। বেশ রাত হয়ে গেছে। খেয়ে আসার জন্যই এই দেরি। মিণ্টুর মামার বাড়ির লোকদের রাজার বাড়ির নিয়মকানুন জানা না থাকারই কথা। সে নেমে দেখল, বড় লোহার গেটে তালা লাগানো হয়ে গেছে। ছোট গেটটা খোলা।

নির্মলা আসেনি। অসুস্থ। অতীশ মাসখানেক ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, ফিরে বাসাবাড়িতে একা। সে বিকেলেই চলে গিয়েছিল নির্মলাকে আনতে। নির্মলা আসেনি। সিঁড়ি ধরে নেমে আসার মুখে তার সঙ্গে নির্মলার মেজদির দেখা। চেম্বার থেকে ফিরছেন। তাকে দেখেই বলেছিল, তুমি !

সিঁড়ি ধরে টুটুল মিণ্টু লাফিয়ে নামছিল, আর তাদের বাবার সঙ্গে অজস্র কথা বলছিল। মেজমাসিকে দেখেই একেবারে কাবু। বাবার পেছনে গোপন করার চেষ্টা করছিল।

তখনই মেজদির ক্ষোভের গলা, ওদের এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

অতীশ নির্মলার মেজদিকে এমনিতেই সমীহ করে। ডাক্তার, তার উপর গাইনি। সে কাচুমাচু মুখে বলেছিল, ওরা কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আমার সঙ্গে যাবেই—বায়না।

—এখন গিয়ে তুমি ওদের জন্য বাসায় রান্নাবান্না করবে ! সত্যি দেখছি তোমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ। কাজেই শেষ পর্যন্ত রাতের খাওয়া সেরে তাদের ফিরতে হয়েছে। টুটুল মিণ্টুকে জোরজার করেও শেষ পর্যন্ত মামাবাড়িতে রাখা যায়নি। অতীশেরও ইচ্ছে ছিল না, ওরা মামাবাড়ি থাকে। একা বাসাবাড়িটাতে সে থাকতে ভয় পায়। রাজার কারখানার ম্যানেজার, বিশ্বস্ত মানুষ। অন্দরের দিকের বিশাল চার-পাঁচখানা ঘর মিলে তার থাকার জায়গা। রাতে একা থাকতে ভয় পায়। পুরানো প্রাসাদসংলগ্ন এই বাসাবাড়ি। রাতে একা থাকলে উপদ্রবের শেষ থাকে না। আর্চির প্রেতাত্মা তাকে এখনও তাড়া করে। এক জীবনে সে জাহাজে নাবিক ছিল। জাহাজ সমুদ্রে বিকল হয়ে গেলে তাকে আর বনিকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল—সে-সব কবেকার কথা ! আর্চি ছিল প্রতিপক্ষ। আর্চিকে সে জাহাজে খুন করেছিল—এইসব বিকার থেকে সে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা রাত হলেই তাড়া করে।

গেটের মুখে ট্যাকসি ছেড়ে দিতেই টুটুল মিণ্টু লাফিয়ে রাজবাড়ির ভিতর

ঢুকে গেল—যেন এরা এতদিন কোন জেলখানায় আটক ছিল—আবার নিজের জায়গায় তারা ফিরে এসেছে। দু-বছরে এই রাজবাড়ির গাছপালা, মাঠ, পুকুর এবং মানুষজন তাদের বড় কাছের। সামনে সেই বাসাবাড়ি—পাতাবাহারের গাছ। টুটুল বলছে; আমাদের বাড়ি। মিণ্টু বলছে, আমাদের পাতাবাহারের গাছ।

বিশাল এলাকা নিয়ে রাজবাড়ি। কলকাতার বুকে, মাঠঘাট, পুকুর, অতিথিভবন, বাবুপাড়া, বাবুর্চিপাড়া, মেসবাড়ি, নতুন বাড়ি—গোলাঘর এমন এক বিশাল রাজবাড়ির পক্ষেই থাকা সম্ভব। যেন এই নগরীতে আলাদা একটা গ্রহ তৈরী করে রেখে গেছেন রাজেনদার পূর্বপুরুষেরা। সে বাবুপাড়া পার হবার সময় এমনই ভাবছিল। গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকের রাস্তায় সব বাবুদের ঘরবাড়ি—অতিথিভবন। ভবনের এক কোনায় মানসদার ঘর। সে উঁকি দিয়ে দেখেছে, ঘর অন্ধকার। সময় করে যে তার কাছে একবার যাবে তাও হয়ে উঠছে না। রাজবাড়ির এই মানুষের সঙ্গেই যেন কোথায় তার মিল আছে। এখানে প্রথম যখন চাকরি নিয়ে আসে, তখনই মানুষটি তাকে কেন যে সতর্ক করে দিয়েছিল, নবীন যুবক তুমি খুন হয়ে যাবে। কতকালের প্রাসাদ! এখানে সেখানে গর্ত। কার গর্তে কোন অসতর্ক মুহূর্তে হাত দেবে—কে জানে! ছোবল খেতে কতক্ষণ!

রাস্তায় আলো। মেসবাড়ির দরজায় রান্নার ঠাকুর বসে ভাঙা পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। কুম্ভবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলছে। সদর বন্ধ। ভিতরে কার সঙ্গে বচসা হচ্ছে। এখানে এলেই নতুন বাড়ির পাশ দিয়ে অন্দর-মহলে তার বাসাবাড়ির রাস্তা। দুপাশে গন্ধরাজ, রক্তকরবী ফুলের গাছ। ঢোকার মুখে বাঁ-দিকে স্থলপদ্ম, জবা, ঝুমকোলতা এবং অপরাজিতার বাগান। বৌ-রাণী খুব সকালে, খাস বেয়ারা শঙ্খকে নিয়ে বাগানে ফুল তুলতে আসে। অতীশ তখন কেমন নিজেকে আড়ালে রাখতে ভালবাসে। যতটা এবং যতক্ষণ দূরে থাকা যায়। যেন দেখা হলেই বলবে, কীরে তুই এত ভীতু!

এই বাগানটা পার হলেই সদর পুকুর। সকাল থেকেই স্নানের জন্য ভিড়। বিশাল পুকুরের একপাশে অতিকায় দেবদারু গাছ, গাছটার মাথা বরাবর তাকালে দূরে রেলের তার দেখা যায়।

তার দরজার মুখে আবছা মতো অন্ধকার। অন্দরমহলের গাড়ি বারান্দার আলোটা বোধ হয় আজ কেউ জ্বালিয়ে রাখতে ভুলে গেছে। অবছা অন্ধকারেই দেখল, টুটুল মিণ্টু দৌড়ে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার জন্য অপেক্ষা। টুটুল ডাকছে, বাবা এস। মিণ্টু বলছে, বাবা দরজা খুলে দাও।

অতীশ বড় নিভৃতে হেঁটে আসছে। মাথা নুয়ে সে হাঁটে। সবসময় সে যেন নিরাপত্তা বোধের অভাবে কেমন উচাটনে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়,

তার কিছু হলে, টুটুল মিণ্টুর কি হবে! সে শুধু যেন, নির্মলা টুটুল, মিণ্টুর জন্যই স্বাভাবিক থাকতে চায়। পচা টাকার গন্ধ এত উৎকট আগে সে যদি জানত! পচা গন্ধ পেলেও ধূপবাতি জ্বালতে পারবে না। মিণ্টুরা বড় হয়ে যাচ্ছে। ওরা তাদের বাবার আচরণে ঘাবড়ে গেলে, বড় অসহায় হয়ে পড়বে। কত সুন্দর জগৎ শিশুদের। তারা জানেই না, মানুষ নিষ্ঠুর হয়, মানুষ খুন করে, মানুষ ধর্ষণ করতে চায়, বড় হতে হতে অজস্র কীটের বাসা বাঁধে মগজে। তারা শুধু জানে এই রাজবাড়িতে গভীর রাতে প্রাসাদের ছাদে কিংবা ফুলের বাগানে পরী নামে। দুমবার সিং মিণ্টুকে বলেছে, একটা ছোট্ট পরী তাকে ধরে দেবে। অতীশ এও বোঝে এই পরীর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মিণ্টু একদিন দেখতে পাবে, সে নিজেই আর এক পরী।

সে দরজার তালা খুলে বলল, এস। ওরা ঢুকেই অন্ধকারে ছুটবে বলে বলল, দাঁড়াও আলোটা জ্বালি। অন্ধকারে আলো জেলে দেখল দুই শিশু ততক্ষণে সামনের ঘরটিতে লাফিয়ে ঢুকে গেছে। একেবারে নিজের পৃথিবীতে ফিরে এসে মিণ্টু টুটুল কী করবে স্থির করতে পারছিল না। লাফ দিয়ে করিডোরের জানালায় উঠছে, লাফ দিয়ে চাতালে বেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকছে। দু'জনের মধ্যে কে কাকে ছুঁতে পারে এমন এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। মামাবাড়িতে তা হলে তারা ভাল ছিল না!

অতীশ বলল, তোরা কি হাতপা ভাঙবি! আয় জামাপ্যাণ্ট বদলে দিচ্ছি। মাসখানেক বাদে বাবাকে ফিরে পেয়ে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। গরম পড়েছে। অতীশের কথায় দু'জনের একজনও সাড়া দিচ্ছে না। অতীশ নির্মলার ঘরে। বাক্স খুলে মিণ্টুর বাড়িতে পরার ফ্রক প্যাণ্ট, টুটুলের জামা বের করছে। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে হাতমুখ ধুইয়ে জামাপ্যাণ্ট পরিয়ে দিতে হবে। বিছানা করে ফেলতে হবে। অনেক কাজ। সে আবার ডাকল, কি রে তোরা কোথায়!

কোনো সাড়া নেই। কী ব্যাপার! সে দরজায় উঁকি দিতেই অবাক! ভাইবোন কী নিয়ে টানাটানি করছে। কী সেটা! কাছে গিয়ে আরও অবাক। সেই ধূপবাতিদানটা, যা তার কাছে কোনো দেবীমূর্তির মতো। সহসা অতীশ কেমন পাগলের মতো দু'জনের কাছ থেকে মূর্তিটা কেড়ে নিল।

—না না, এটা তোমরা ধরবে না। এটা আমার। কখনও ধরবে না।

বাবার অদ্ভুত আচরণে ওরা দুজনেই ঘাবড়ে গেল। বাবাকে বড় চঞ্চল দেখাচ্ছে। বাবার চোখ কেমন হয়ে গেছে। গোল গোল। ওরা যেন এ-বাবাকে চেনে না।

ওরা সোজা দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা পুতুলটা নিয়ে কী করে দেখবে! ওরা দুজনই বড় সংলগ্ন। যেন ওরা বাবার কেউ না। ওরা ভাইবোন। মিণ্টু টুটুলের

হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা ওটা তুলে নিয়ে অনেক উপরে একটা কুলুঙ্গিতে রেখে দিল। ঠিক ঠাকুর দেবতা যেমন রাখা হয় তেমনি।

টুটুলের ভারি অভিমান। বাবা পুতুলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। এটা সে সহ্য করতে পারছে না। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে দিয়েছে। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে।

অতীশ মূর্তিটা কুলুঙ্গিতে রেখে ফিরে এসে বলল, কান্নার কী হল!

টুটুলকে কাঁদতে দেখলে মিণ্টুর কান্না পায়। মিণ্টু মুখ শক্ত করে রেখেছে।

অনেক রাত হয়েছে। সকালে উঠে রান্নাবান্না আছে। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে বাড়িতে চিঠি লিখবে ভাবছে—কারণ বাবাকে পেঁছিানসংবাদ না দিলে চিন্তায় থাকবেন। অথবা ভাববেন, শেকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাই সব। বাবা মা বাড়তি। কত কাজ। সে ওদের প্রায় জোর করেই বাথরুমে নিয়ে গেল। মিণ্টুর ফ্রক খুলে, প্যাণ্ট খুলতে গেলে দেখল, সে বাবার হাত সরিয়ে দিচ্ছে। প্যাণ্ট খুলতে দিচ্ছে না।

—কীরে লজ্জা করছে! বাবাকে লজ্জা কি! খুলে দিচ্ছি।

মিণ্টু দু-হাতে প্যাণ্ট ধরে রেখেছে অগত্যা অতীশ কী করে! একমাসে মেয়েটা মামাবাড়ি থেকে এত সব বুঝে গেছে। মামাবাড়ি গিয়ে কী বুঝেছে, মেয়েদের পুরুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতে নেই। তার লজ্জার উদ্রেক হয়েছে। অতীশ হেসে ফেলল! পাকামি! তবু মিণ্টু কেমন মুখ শক্ত করে দু-হাতে প্যাণ্ট চেপে রেখেছে। অতীশ আর জোরজার করল না। হাতমুখ ধুইয়ে দিল। বলল, যাও ও-ঘরে গিয়ে ছাড়। বলে প্যাণ্টটা মিণ্টুর হাতে দিয়ে দিল। ওটি দিতেই মিণ্টু এক দৌড়।

এই প্রথম অতীশ বুঝল, মিণ্টু বুঝে গেছে সে মেয়ে। বুঝে গেছে বাবা পুরুষ! কেমন বিচলিত বোধ করল অতীশ।

টুটুল সেই থেকে গুম মেরে আছে। সে দরজার পাশে লুকিয়ে আছে। যেন বাবা তাকে খুঁজে না পায়। অতীশ বাথরুম থেকেই ডাকল, টুটুল আয় বাবা। হাত পা ধুইয়ে দিচ্ছি। জামাপ্যাণ্ট ছেড়ে ফেল বাবা। তোর মা একটু ভাল হলেই নিয়ে আসব।

কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না।

সে ঘরে গিয়ে দেখল, মিণ্টু টুটুলের হাত ধরে বাথরুমে টেনে আনার চেষ্টা করছে। সে আসবে না বলে বেশ গোঁ ধরে আছে।

অতীশ বলল, আয়।

—ওটা আমাকে দেবে বল?

—কি দেব?

—পুতুলটা।

—ওটা পুতুল তোদের কে বলল!

মিণ্টু টুটুলের সঙ্গে সমস্বরে বলল, ওটা তো পুতুলই।

—না না। ওটা পুতুল না। তোমরা ধরো না! তা হলে মূর্তিটা রাগ করবে! আসলে এই দুই শিশু বুঝবে কি করে মানুষ জলে পড়ে গেলে খড়কুটো অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। শহরের নিষ্ঠুর নিরাপত্তাহীন জীবনে পুতুলটা কখন তাদের বাবার কাছে দেবী হয়ে গেছে তারা জানেই না।

—রাগ করবে কেন?

—বারে ওটা তোমরা ভেঙে ফেলতে পার।

—ভাঙব না বলছি তো!

অতীশ বুঝল, এখন এদের সঙ্গে অভিনয় করা ছাড়া উপায় নেই। সে বলল, আচ্ছা দেব। এখন হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। কাল দেব। কেমন! আমার লক্ষ্মী সোনা। সকালে উঠে কত কাজ আমাদের। মিণ্টু তো বড় হয়ে গেছিস—পারবি না, জলটল এনে দিতে। আটা মেখে দিতে!

—হ্যাঁ পারব।

—টুটুল বলল, হ্যাঁ আমিও পারব বাবা।

—বা সুন্দর। অতীশের চোখে কেন জানি জল চলে আসে। এই দুই শিশু বড় একা। মা তাদের অসুস্থ। অথচ বাবাকে ফেলে তারা থাকতে পারে না। মাসিরা কিছুতেই আটকে রাখতে পারেনি।

অতীশ বড় যত্নে তার দুই শিশুর হাতমুখ ধুইয়ে দিয়ে বিছানা করে দিল। মশারি টাঙিয়ে দিল। এক পাশে সে, তারপর টুটুল, শেষে মিণ্টু।

কিন্তু মিণ্টু রাজি না।—বাবা আমি তোমার কাছে শোব।

—ঠিক আছে, তুমি আমার পাশে শোবে।

—না আমি শোব। টুটুলের জেদ।

এ সব কথা মানুষের সংসারে মায়া জড়িয়ে দেয়। সে বলল, যাও, মশারির নিচে ঢুকে যাও। একি টুটুল। পা খালি কেন?

—আমার চটি কোথায়!

মিণ্টু নিজেরটা বের করে নিয়েছিল। টুটুল নেয়নি। খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারলে তার বেশি সুখ। অতীশ বলল, মশারির নিচে ঢুকে যাও। সে একটা তোয়ালে দিয়ে টুটুলের পায়ের পাতা সাফ করে দিল।—আর নামবে না। কেমন?

মিণ্টু মশারির নিচে ঢুকে বাবার বালিশ দুটো মাঝখানে রেখে দিল। টুটুলকে বলল, তুই ওপাশে। আমি এপাশে। বাবা আমাদের মাঝখানে শোবে।

অতীশ হাসল। বলল, তোরা মামাবাড়িতে এই করে মাকে জ্বালিয়েছিস খুব। না?

মিণ্টু বলল, জান বাবা, মেজমাসি মার সঙ্গে আমাদের শুতে দিত না।

অতীশ কেমন ঘাবড়ে গেল কথাটায়। নির্মলার শরীর ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে নির্মলা যে ডিপ্রেশনে ভোগে তা সে টের পেয়েছিল প্রথম মিণ্টু পেটে এলে। প্রথম কিছু খেতে পারত না। গর্ভবতী হলে যা হয়। পরে দেখেছে, সেটা কিছুতেই যায়নি। ডিপ্রেশন দেখা দিলেই, নির্মলার আহারের রুচি কমে যায়। কিছু খেতে চায় না। শরীর ভেঙে যেতে থাকে। বাবা বুঝতেন সব। নিজেই নানারকমের ছালবাকল সেদ্ধ করে খাওয়াতেন। এবং সংসারে অভাব-অনটন থাকবে—মানুষ যতই স্বাবলম্বী হোক, অর্থ মানুষকে সুস্থির থাকতে দেয় না। নিরাপত্তা যিনি দেবার তিনি তো মাথার উপরে আছেন। তুমি আমি ভাববার কে? সংসারে পোকামাকড় বাসা বানাবে—তোমার কাজ শুধু তাদের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করা। বাবার এ-সব কথাবার্তায় নির্মলা বোধ হয় জীবনে আস্থা ফিরে পেত। রক্তে আবার ঢেউ উঠত। দু-এক হপ্তা পরে নির্মলা গুনগুন করে গান গাইত। সহসা ডিপ্রেশন কেটে গিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করত গাছপালার ছায়ায়। এখানে বাবা নেই যে নির্মলাকে সাহস যোগাবে। মাথার উপর সংসারে কেউ না থাকলে সবাই বড় একা।

অতীশ বলল, শুতে দিত না কেন? কার কাছে থাকতিস?

মিণ্টু বোধহয় সব বোঝে। সে বলল, মার তো শরীর ভাল না। অসুখ। আমরা পাশে শুলে মার কষ্ট হবে না!

—কষ্ট হবে কেন?

—বারে রাতে আমরা নাকি মাকে জড়িয়ে থাকি। টুটুল ঘুমের মধ্যে পা ছোঁড়ে! মার পেটে তবে লাগবে না!

—অঃ। যাক, অতীশের ভিতরে যে আশঙ্কা উঁকি দিয়েছিল মিণ্টুর কথায় সেটা কেমন উবে গেল।

মিণ্টু বালিশে মুখ গুঁজে বলল, আমি আর কখনও মামার বাড়ি যাব না। দিদিমা কেবল বকে।

—দুষ্টুমি করলে বকবে না!

—জান বাবা, টুটুলটা না হাঁদা। কিছু বোঝে না। দিদিমার বিছানায় হিসি করে দিয়েছে।

—কি রে তুই হিসি করে দিয়েছিলি?

—না বাবা। দিদি মিছে কথা বলছে। বলেই সে উঠে দিদিকে খামচে ধরল।

—বাবা টুটুল আমাকে মারছে।

—ইস, তোরা এমন করলে আমি যাবটা কোথায়। টুটুল কী হচ্ছে! তোমরা ঘুমোবি না!

—দিদি কেবল মিছে কথা বলে।

টুটুল বিছানায় পেচ্ছাব করে দিতেই পারে। মাঝে মাঝে দেয়ও। অতীশ তাই রাতে উঠে টুটুলকে বাথরুমে নিয়ে হিসি করায়। ঘুমের ঘোরে টুটুল কিছু বোঝে না। অতীশ প্যান্টের ফাঁক দিয়ে নুনুটা অজান্তেই বের করে শিস দেয়। শিস শুনে শুনে কখন যে টুটুল অজান্তেই হিসি করে—হিসি হয়ে গেলে সে তাকে ঘাড়ে ফেলে আবার নির্মলার বিছানায় শুইয়ে দিত। এটা তার নিত্যকার কাজ ছিল। রাতে টেবিল থেকে লেখালিখি সেরে ওঠার পর কখনও লিখতে লিখতে বেশ রাত হয়ে গেছে বুঝলে, শোবার আগে টুটুলকে তুলে নিয়ে হিসি করিয়ে সে ঘুমাতে যেত। টুটুলের জন্য সংসারে এ-কাজটা করা হয়ে থাকে তার মামাবাড়ির লোকেরা জানবে কী করে! নির্মলা হয়তো কিছুই বলেনি।

মিণ্টু বলল, জান বাবা, দিদিমা না সারা সকাল কেবল গজগজ করে। মাকে বকে! বাবা তুমি মাকে নিয়ে আসবে না?

—সেরে উঠলেই নিয়ে আসব। তোমার মা শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু কেন জানি অতীশের আঁতে ঘা লাগে। নির্মলা তবে সেখানেও শান্তিতে নেই! না থাকারই কথা। তার মতো একটা গরিব মাষ্টারকে বিয়ে করে নির্মলা যে ভুল করেছে! নির্মলাকে সে বার বার বলেছে, ভেবে দেখ, আমরা খুব গরিব। বাবার যজন যাজন, কিছু জমি, আর আমার মাষ্টারি। এই মিলে তিনচারটি ভাইবোন মা বাবা মিলে আমাদের সংসার। ভেবে দেখ, তুমি কোনো ভুল করছ না তো, তোমাদের গাড়ি-বাড়ি, অর্থ প্রতিপত্তি তোমাকে পরে পীড়া দিতে পারে।

নির্মলার তখন এক কথা, আমি নাবালিকা নই।

হঠাৎ মিণ্টু কেমন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, মামাবাড়িতে থাকলে মা আমার মরে যাবে। মাকে না ওরা কেউ ভালবাসে না। বলেই মিণ্টু হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকল।

অতীশ কেমন হয়ে যাচ্ছে সব শুনে। ভিতরে অপমানের জ্বালা, নির্মলার প্রতি বাপের বাড়ির মানুষজনের অবহেলা, নিজের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা, বাবার প্রতি কর্তব্যবোধ সব মিলে তাকে অসহায় করে রেখেছে। সে জানে তার অফিসের সহকারী একটু আশকারা দিলে সেই তার হয়ে অজস্র অর্থের সংস্থান করে দিতে পারে। সে জানে, দু-নম্বরী মাল সরবরাহ করলে কুম্ভ নিজ থেকেই বলবে এ টাকাটা আপনার। কুম্ভ আভাসে অনেকবারই ইঙ্গিত

দিয়েছে, সে তখন চুপচাপ থেকে কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে শুনতে পেয়েছে—আর্চির প্রেতাত্মা দূরবর্তী মেঘের মতো গুড়গুড় করে ডাকছে—এই হলগে মানুষ, পাপপুণ্য, লোভ মোহ কাম ক্রোধের সে দাস। দাস···দাস··· দাস। বার বার কানের কাছে কথাটা কেউ যেন বলে যাচ্ছে। সে কোনো-রকমে দু-কান চেপে ধরতেই দেখল মিণ্টু বালিশে মুখ গুঁজে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্না তার থামছে না।

সে বলল, আমি তোমার মাকে নিয়ে আসব। কাঁদবে না। ঘুমাও। অনেক রাত হয়েছে। না ঘুমালে উঠতে বেলা হয়ে যাবে।

টুটুল ঘুমিয়ে পড়েছে। মিণ্টুও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরে আলো জ্বলছে।

—মাথাটা হঠাৎ কেন ধরে গেল বুঝতে পারল না। সে জানে, এ মুহূর্তে যদি সে চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকে তবে সেই অশুভ প্রভাব আরও তাকে পেয়ে বসবে। আজকাল এও দেখেছে, যখন আর্চির প্রেতাত্মার প্রভাব তার উপর কাজ করতে থাকে তখন একমাত্র মুক্তির উপায় নিজের লেখার মধ্যে ডুবে যাওয়া। ভাঙা ঝরঝরে কারখানার ম্যানেজার হয়ে যেন তার নরকবাস শুরু।

সে টেবিল ল্যাম্পটা তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দিল। ঘরের অন্য সব আলো নিভিয়ে দিল। করিডরের দরজা বন্ধ আছে কি না দেখতে গেল। সে এসেই যে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল মনে রাখতে পারেনি।

সে দেখল, না সবই বন্ধ আছে। সে এবারে সাদা পাতার উপরে জীবনের কিছু কথা লিখে রাখার জন্য টানা লিখে যেতে থাকল।

লিখতে বসলেই কত সব স্মৃতি ভেসে আসতে থাকে। আসলে সে যেন কোনো ছায়াছবি দেখতে পায়। মনের পর্দায় ছবিগুলো স্মৃতি হয়ে ভাসছে। তার মনে পড়ে সমুদ্র কি অসীম অনন্ত—বর্ণময় দ্বীপমালা—বন্দরে কত সব রহস্যময় মানুষ—কি বিচিত্র তাদের সুখ দুঃখ! যেমন বন্দরের সেই যুবতী, যে এসে তাদের নিয়ে গিয়েছিল, খৃস্টের উৎসবে খাওয়াবে বলে।

যুবতী এবং তার ঠাকুমা, হাতে লণ্ঠন, অন্ধকার বন্দরে তারা ভারতীয় নাবিকের সন্ধানে ছিল। কবে কোন কালে সেই বুড়ো মহিলা, তার স্বামী-পুত্রকে ভারতের মাটিতে রেখে গেছেন—ভুলতে পারেননি। সুদূর নিউ-প্লাই-মাউথ বন্দরে অন্তত একটি দিনের জন্য স্বামীপুত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ খোঁজেন। দু একজন ভারতীয়কে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান।

অতীশ তার নাবিক জীবনের স্মৃতি হাতড়ে বেড়াতে থাকল। যুবতী তাকে বলেছিল, ঠাকুমা আমার তৃপ্তি পান। তৃপ্তি কথাটাই বলেছিল। গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া, গান গাওয়া—বিশাল খামারবাড়ি, অ্যাগমণ্ট হিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়, বৃদ্ধার কী আনন্দ, যে সাত রাজার ধন এক মানিক পেয়ে

গেছে। দু-পাশের কৌরি-পাইনের ছায়ায় যুবতী গাড়ি চালিয়ে তাদের নিয়ে যাচ্ছে।

যুবতী তাকে বলেছিল, যেবারে বন্দরে কোনো ভারতীয় জাহাজ থাকে না, ভারতীয় কেউ থাকে না, ঠাকুমা সেবারে গীর্জায় যান না, শুধু ঘরে বসে থাকেন একটা ডেক-চেয়ারে। আর কিছু বললেই দরদর করে চোখের জল নেমে আসে। আমরা তখন কিছু বলি না। মেয়েটি বলত, আমাদের সাত-পুরুষ তোমার দেশে কাটিয়েছে। সবাই সেখানে মাটির গভীর উষ্ণতায় ডুবে তোমাদের দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে চলে এলাম। আমার ফাদার, গ্র্যাণ্ডফাদার ভারতবর্ষের কোনো গাছের ছায়ায় শুয়ে আছেন, সেখানে কবরভুমির উপরে ক্রস। ঠাকুমা সারাটা বছর যেন বেঁচে থাকেন, কখন আবার তাঁরা আসবেন। তাঁদের উৎসবে আমন্ত্রণ করবেন। তোমরা এলে ঠাকুমা যেন তাঁর পূর্বপুরুষদের হাতের কাছে পেয়ে যান।

এ-সব কাহিনী মনে পড়লে অতীশের মনে হয়, মানুষের জন্য অপেক্ষা করে থাকে শুধু অতীত। কেন এই জন্ম, কেন এই মৃত্যু? সে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজে বার বার। গম্ভীর অতলে ডুবে গেলে দেখতে পায়, সাদা পাতাগুলি হিজিবিজি লেখায় ভরে উঠেছে। ভিতরের অপমান প্রশমিত হয়। আর্চির প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করতে সাহস পায় না, কিংবা বনি, সহসা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে না, ইউ আর ক্যারিং দ্য ক্রশ। ইট ইজ দ্য সাফারিং অব হিউম্যান ম্যানকাইণ্ড।

যীশু কী তবে সেই ক্রশ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বধ্যভুমিতে —তিনি কী জানতেন, মানুষকে জন্মালেই পিঠে ক্রশ বহন করতে হয়—যীশু সে জন্যই নিজের ক্রশ পিঠে নিয়ে বধ্যভূমিতে যেতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করেননি!

সেও কি তবে সেই ক্রশ বহন করে চলেছে। সব অপমান, নির্যাতন জ্বালা-বোধ কি যীশুর ক্রশেরই প্রতীক। সে তার বধ্যভূমির দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছে—তত উৎকণ্ঠা, পীড়ন, দুর্ভাবনা। সে কেমন আর তখন লিখতে পারে না। অসার বোধ হয় সব। জানালা দিয়ে দূরের আকাশ চোখে ভেসে ওঠে। সে উঠে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা বড় নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। শুনতে পায়, ডোণ্ট বি পাজল্ড। স্ট্রাগল ইজ দ্য প্লেজার। যেন কাপ্তান স্যালি হিগিনস দু-হাত তুলে তার ভিতর সাহস সঞ্চার করে দিচ্ছেন। সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। সকালে উঠে কত কাজ। টুটুল মিণ্টুর জলখাবার, মিণ্টুকে খাইয়ে স্কুলে দিয়ে আসা। টুটুলকে আর কার কাছে রেখে যায়। ভেবে দেখল, সঙ্গে করে তাকে অফিসে নিয়ে যাওয়াই ভাল। সে এবারে মশারির কাছে গেল। গিয়ে দেখল দুই ভাইবোন গলা জড়াজড়ি করে

ঘুমিয়ে আছে। সে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকার সময়ই মনে করতে পারল বাবাকে চিঠি লেখা দরকার। কেউ বাড়ি থেকে না এলে এদের দেখা-শোনা কে করবে!

আবার টেবিলে এসে বসল।

লিখল, শ্রীচরণেষু বাবা।

লিখল, আমি মঙ্গল মতই বাসায় এসে পেঁৗছেছি। নির্মলার শরীর ভাল না। ও বাপের বাড়িতেই আছে। টুটুল মিণ্টু ওকে খুব জ্বালায়। এজন্য ওদের আমার কাছে নিয়ে এসেছি। অফিসের ভাত করে দেবারও লোক নেই। যদি এ-সময় মা এসে কটা দিন থাকেন ভাল হয়। প্রহ্লাদকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা এক প্রকার।

সে চিঠিটা অফিস ব্যাগে ভরে ভাবল সকালে যাবার পথে ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে যাবে। মা এলে টুটুলকে অফিসে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে না। কেমন দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে শুতে গেলে শুনতে পেল, রাজবাড়ির দেউড়িতে ঘণ্টা বাজছে রাত বারোটা। অনেক রাত, ঘুম আসতে একটা বেজে যাবে। সে সেই কবে থেকে যেন অনিদ্রার শিকার। বোধহয় নির্মলাকে বিয়ে করার পর থেকেই। নির্মলাকে বিয়ে করার পরই কেবল মনে হয়েছে, এও আর এক অলৌকিক জলযান। এখন আর তার জাহাজের কাপ্তান স্যালি হিগিনস নয়। সে নিজে।

তাকেই শেষ পর্যন্ত এই জাহাজ নির্দিষ্ট বন্দরে পেঁৗছে দেবার কথা।

সেটা কোথায় কতদূর সঠিক জানে না। সে পাশ ফিরে শুল।

টুটুল এক পাশে, অন্য পাশে মিণ্টু। সে মাঝখানে। তখনই মনে হল, টুটুলকে হিসি করানো হয়নি। সে বিছানা ভাসিয়ে দিতে পারে। টুটুলকে বুকে তুলে দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপর দাঁড় করিয়ে বলল, এই টুটুল, এই টুটুল।

টুটুলের ঘুম জড়ানো চোখ। সে বাবার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।

তাকে নাড়া দিল অতীশ। তারপর শিস দিতে থাকল।

টুটুলের ঘুম ভাঙছে না

সে আবার নাড়া দিল, এই টুটুল। লক্ষ্মী বাবা। হিসি করে নে। সে ফের শিস দিতে থাকল।

এই করে কখনও জাগিয়ে, কখনও মনে করিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে সে দেখল টুটুল হিসি করছে। সে আবার তাকে বুকে তুলে নিতেই আশ্চর্য উষ্ণতা টের পেল টুটুলের শরীরে। ঘুমের ঘোরে নরম কাদা হয়ে আছে। তাদের একমাত্র ভরসা সে। টুটুল মিণ্টুর একমাত্র অবলম্বন। পাশ ফিরে শুইয়ে দেবার সময় মনে হল, তার যে কোনো পাপ এদের মধ্যে সংক্রামিত হতে

পারে। তার পাপই আজ নির্মলার সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ। সে আর্চির চেয়ে কোনো দিক থেকেই মহানুভব নয়। শেষ পর্যন্ত এদের কোন অশুভ প্রভাবে আর্চি ফেলে দেবে কে জানে! তার চোখ জ্বালা করতে থাকল। নির্মলার অসুস্থতার সুযোগে যেন তাকে ছিনিয়ে নেবে একদিন কেউ। চারুর কথা মনে হল। এমন যার শরীর, এমন যে রমণে পটু তাকে সে স্থির থাকতে দেবে কেন! সে তাড়াতাড়ি টুটুলকে বুকে জড়িয়ে বিড়বিড় করে বকতে থাকল, সংসারে কেউ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে আলগা করে দিতে পারবে না। সন্তানের প্রতি মমতায়, নির্মলায় অসুখের দুর্ভাবনায়, কারখানার জটিল আবর্ত, চারুকে জোর করে কিছু করে ফেলার মধ্যে সে কেমন কাতর হয়ে পড়ল।

সে দুহাতে দুপাশ থেকে টুটুল মিণ্টুকে বুকের কাছে তুলে এনে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চিত হয়ে শুয়ে আছে অতীশ। একটা জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মাথার উপর কুলুঙ্গিতে সেই দেবী। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসতে থাকল। তার মনে হচ্ছিল সে নিজেই এক অলৌকিক জলযান। অনিশ্চিত জীবন নিয়ে কোনো দারুচিনি দ্বীপের দিকে ভেসে চলছে। যেন এক নিরুপম যাত্রা। সে কেমন এলোমেলো ভাবনায় ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকল। মনে হল তার, পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কিংবা প্রাণপ্রবাহের প্রাথমিক দিনগুলি থেকেই এই যাত্রা। সে বের হয়ে পড়েছে। সেই মহাবিশ্বে তার উৎপত্তি কবে, কী-ভাবে ভাসতে ভাসতে সে কবে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল—সে দিনটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কে জানে জানি না হয়ত গভীর এক আলোড়ন—আমরা তোমার বুকে বসবাসের জন্য নেমে এলাম—আমরা সবুজ শেওলা, আমরা সামুদ্রিক মাছ, আমরা উভচর প্রাণী, আমরা অতিকায় ডাইনোসর। অতীশ মুহূর্তে সেই প্রাগ-ঐতিহাসিক জীবনের মধ্যে ঢুকে গেল। দাঁড়িয়ে আছে এক ঢিবিতে। সে লম্বা বড় বৃক্ষের ডাল মটমট করে ভেঙে খাচ্ছে। পাতা শেকড়বাকড় এবং সবুজ অরণ্যের মধ্য দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। তার অতিকায় লেজটা ক্রুদ্ধ ফণার মতো দুলছে। গায়ে বড় বড় আঁশ। ও পাশে এক নারী প্রাগ-ঐতিহাসিক জীব তার অপেক্ষায় আছে রমণের জন্য। সেও অপার আনন্দে লেজ নাড়ছে। অতীশকে দেখে তার কী করুণ চোখ! গভীর মমতা—সে সহসা ছুটে আসছে। এসেই লেজ তুলে দিয়ে সে স্থির থাকতে পারছে না। প্রাণের এই অলৌকিক প্রবাহ চলছে তো চলছে। সেই প্রবাহসমূহ কীটপতঙ্গ, গাছ, লতাপাতা প্রাণিজগতে সৃষ্টির মূলে। সে তারই কোটি ভগ্নাংশের কোনো ছোট পরমাণু। আবার সে নিজেই এক মহাবিশ্ব। চঞ্চল অস্থির মহাবিশ্বের লাভা, অথবা বাবা যাকে বলেন; মহামায়া, তারই নিরন্তর নিরুপম যাত্রা। সে এক জটিল গ্রহ। যেমন এই মহাবিশ্বে অনন্তলীলা

চলছে, অতীশ নামক এক ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যেও সেই লীলা। যার ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না। কে টুটুল, মিণ্টু, নির্মলা, অথচ এদের জন্যই যত তার দুর্ভাবনা। সে জানে ঈশ্বর বলে কেউ নেই—তিনি সব গ্রহনক্ষত্রের সুতো ধরে বসে নেই, তবু ধূপদানিটাকে কোনো দেবীমূর্তি ভেবে সে কেন যে ওটা কুলুঙ্গিতে রেখে দিল! সবাই বলে, তিনি আছেন। ঈশম দাদা বলেন, তিনি আছেন, তাঁরই মেহেরবানিতে আমরা বাঁচি। শস্য ফলে। স্যালি হিগিনস বলেন, আর ইউ স্ট্রং অ্যাজ গড অ্যাণ্ড ক্যান ইউ সাউট অ্যাজ লাউর্ডলি অ্যাজ হি! ক্যান ইউ সাউট টু দ্য ক্লাউডস অ্যাণ্ড মেক ইট রেন! আর বাবা বলেন, অতীশ তুমি কিছুই পার না। তোমর যা কিছু সব তাঁর। বিধি নির্দিষ্ট মানুষ। তাঁকে অতিক্রম করে তোমার এক পা এগোবার ক্ষমতা নেই। তিনিই তোমার জন্মমৃত্যু, তিনিই তোমার ইহকাল পরকাল।

কিন্তু অতীশের মনে হয় কোন দৈব কারণে এই প্রাণপ্রবাহের জন্ম। সে কোটি কোটি বছর ধরে নিরুপম যাত্রায় বের হয়ে পড়েছে। ভেসে চলছে। এক অন্ধকার থেকে সহসা এই গভীর আলোকমণ্ডলে প্রবেশ, কোনো গুহা থেকে নির্ঝরিণীর মতো, বের হয়ে এসে আবার নদী উপনদী শাখানদী বেয়ে সেই অসীম জলকল্লোলে মিশে যাওয়া। ঈশ্বর নামক বস্তুটির কাছে সে কিছুতেই সারেণ্ডার করতে পারছে না। করতে পারলে, সে জানে মুক্তি পেত। কিন্তু তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা মানুষ। মানুষ না থাকলে ঈশ্বরও থাকত না। একটা পিঁপড়ের ঈশ্বর আছে কিনা সে জানে না। কিংবা গাছপালা এবং প্রাণিজগতে তার আধিপত্য কী রকম সে তাও জানে না।

আসলে বনির কথাই ঠিক—প্লিজ ইউ সারেণ্ডার। যে কারো কাছে। ইট, পাথর, গাছ, মহাবৃক্ষ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, সমুদ্র—যেখানে খুশি। যেহেতু তোমার বধ্যভূমি তৈরি, যেহেতু তোমার অবস্থান ক্ষণকাল, যেহেতু তুমি জান না মৃত্যু কি ও কেন, জান না—তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন, না আলোকময়, না তিনি কোনো যথার্থই স্বর্গীয় সুখ, যখন কিছুই জান না তখন সারেণ্ডার করতে আপত্তি কেন।

অতীশ বলেছিল, সেইজন্যই আপত্তি। আমি তার কিছুই জানি না। তাকে আমি চিনি না, বনি। তোমার বাবা কাপ্তান স্যালি হিগিনস হয়তো তোমাকে এমনই শিখিয়েছেন, আমার বাবাও বলেন তুমি নিমিত্ত মাত্র। বুঝি না, কেন এক অদৃশ্য শক্তির অধীনে আমাদের ক্রীতদাসের মতো বাঁচতে বলছ!

বনি তাকে প্রবোধ দিয়েছিল তিনি অজ্ঞাত হবেন কেন? তিনিই সব চেয়ে বেশি জ্ঞাত। সব সময় টের পাই তিনি আছেন। ঘুমে, জাগরণে, এই মহাসমুদ্রে তুমি আমি আর এই পাখি ছাড়া আর কে আছে? তাকাও, চারপাশে

শুধু অনন্ত জলরাশি। স্থির। আকাশ ধূসর। গভীর রাতে দেখ অজস্র নক্ষত্র সমুদ্রে কেমন জোনাকি পোকার মতো ছায়া ফেলে যাচ্ছে। দেখ, কি শান্ত আর নিস্তব্ধ সব কিছু। দ্যাখ আমাদের প্রিয় পাখি এলবা কেমন মাথা গুঁজে গলুইয়ে বসে আছে। দ্যাখ সে আবার সামনে উড়ে যাচ্ছে—আমি জানি, সেই খবর দেবে আমাদের, ডাঙা কোনদিকে। সে যেভাবে সারাদিন যেদিকে উড়ছে, আমরা বোট সেদিকেই নিয়ে যাব। ঈশ্বর না থাকলে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে ছোটবাবু আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না। প্লিজ তুমি গোঁয়ার্তুমি করো না। তাকে তুমি অস্বীকার করো না। বলে দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল বনি।

সমুদ্রজীবনের এক একটা দৃশ্য ভেসে এলেই সে কেমন বিপাকে পড়ে যায়। গভীর রাতে সেই এক বিপাকে সে কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। পাথরের ধূপদানিটা তার কাছে আর নিছক ধূপদানি নয়। কষ্টিপাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট, অজস্র ফোকর ধূপকাঠি গুঁজে দেবার জন্য। কেন যে মাঝে মাঝে তার মনে হয় বনির আত্মা এই মূর্তির ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। তার চরম ক্ষতির আশঙ্কার সময় কেমন দৈববাণী হয়—এটা তার মাথার বিকার কিনা সে জানে না। টুটুল মিণ্টুকে কিছুতেই ওটা আর দেওয়া যাবে না।

ঘুমটা লেগে এসেছিল—সহসা সমুদ্রের সেই সব দৃশ্য তাকে কেমন নাড়া দিয়ে গেল।

সে উঠে বসল। মশারি তুলে বাইরে বের হয়ে অনুজ্জ্বল আলোয় মূর্তিটার সামনে দাঁড়াল। মূর্তিটা কুলুঙ্গির ভেতর নীরব নিথর হয়ে আছে। চোখে কেমন সরল হাসি। সে বলল, বনি তুমি কী সত্যি এখানে আছ। এই মূর্তির ভেতর যদি থাক আমি তোমাকে স্পর্শ করলে টের পাব। যদি থাক, আমি সাহস পাব—আর নিছক মূর্তি হলে এখুনি আছড়ে ভেঙে ফেলব। বলে সে যেই না ভেঙে ফেলার জন্য তুলতে গেছে, কেমন এক বিদ্যুৎপ্রবাহ তার সারা শরীরে খেলে গেল। সারা শরীরে সেই প্রবাহ তাকে লোমহর্ষক কোনো ঘটনার সাক্ষী রেখে, নিদারুণ চঞ্চলতায় ডুবে গেল—বলল বনি, আমার সন্তানেরা কোনো অপরাধ করেনি—তাদের তুমি দেখ। তুমি এই ঘরে আছ, থাকবে। তুমি থাকলে আর্চির প্রেতাত্মা আমাকে তাড়া করবে না। আর্চির প্রেতাত্মার সঙ্গে আমি লড়ে যাব।

আর তখনই মিণ্টু টুটুল জেগে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, বাবা! বাবা!

অতীশের সম্বিৎ ফিরে আসছে। সে তার দুই শিশুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ার সময় বলল, তোমাদের মা ভাল হয়ে গেলেই নিয়ে আসব। তোমরা ঘুমাও।

ওরা ঘুমিয়ে পড়লে অতীশ ভাবল—তার নিরুপম যাত্রা এদের মধ্যেই শুরু,

এদের মধ্যেই শেষ। অন্তত তার জন্য না হলেও, তার সন্তানের জন্য কোনো এক ঈশ্বরের বড় দরকার।

॥ তিন ॥

সকালবেলা অতীশের ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে গেল। টুটুল মিণ্টু ঘুমে এখনও কাতর। টেনে না তুললে উঠবে না। এমনিতে রাতে শুতে দেরি হয়ে গেছিল। মামাবাড়ি থেকে ওদের দুজনকে নিয়ে এই বাসাবাড়িতে সে রাতে ফিরে এসেছে। নির্মলা কবে যে আরোগ্য লাভ করবে—দুশ্চিন্তায় রাতে তারও ভাল ঘুম হয়নি। মেজদির পরামর্শমতো সব হচ্ছে। দেশের বাড়িতে এক মাস ছুটি কাটিয়ে সে নির্মলার জন্য বড় অধীর হয়ে আছে। অথচ সেই নির্মলাই এল না। নির্মলার আর ক'দিন বিশ্রামের দরকার। টুটুল মিণ্টু তার দুই জাতক। বাবাকে এমনিতেই তারা সহজে কাছ ছাড়া হতে দেয় না। এক মাস বড় দীর্ঘ সময়। এই একটা মাস কাছে না থাকায় তারাও একটা বড় ভাল ছিল না।

সে ঘুম থেকে উঠেই ডাকল, এই মিণ্টু ওঠ। বেলা হয়ে গেছে, কত কাজ।

সে দ্রুত তার কাজগুলি সেরে ফেলছিল। বাসাবাড়িতে সে একা।

মিণ্টুকে স্কুলে দিয়ে টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে চলে যাবে ঠিক করেছে।

নির্মলার অসুখটা যে কী! তলপেটে ব্যথা। জরায়ু সংক্রান্ত কোনো অসুখ। জরায়ু কথাটা ভাবতেই মনে হল তার এমন এক আধার, যেখানে সব প্রাণিকুলের জন্ম এবং বড় হওয়া নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে সাহস পায়নি। অসুখটা সম্পর্কে নির্মলার মেজদিও কিছু স্পষ্ট বলছেন না, তবে বলেছেন ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। নির্মলার মেজদি সবে পাসটাস করে চেম্বার খুলে বসেছেন। নিজে একা দায়িত্ব নিতে সাহস পাননি। তিনি তাঁর এক প্রফেসরকে দিয়েও দেখিয়েছেন। কাজেই নির্মলা তার জন্যও যে কম অধীর নয়, কাল দুজনের দেখা হলে সেটা টের পেয়েছে। অথচ তার সঙ্গে ফিরতে সাহস পায় নি।

অতীশ এখন দ্রুত হাতের কাজ সারছে। স্টোভে তেল আছে কি না দেখল। সকালে ডিম ভাজা করল। পাঁউরুটি দিতে হবে টুটুল মিণ্টুকে। সে খাবার করে দুজনকেই ডেকে তুলল। খেতে দিল। মিণ্টুকে বলল, তুমি আজ থেকে আবার স্কুলে যাবে। তারপর ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারে বের হবার সময়

বলল, বাইরে বের হবে না। বাজার সেরে আসছি। তাড়াতাড়ি বাজার সেরে এসে ঢুকতেই তাজ্জব। কেজি ইস্কুলের ছাত্রী মিণ্টু পাকা গিন্নীর মতো ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। বাবার কাজ এগিয়ে রাখছে।

রান্নার জন্য বাথরুমের কল থেকে মিণ্টু এক বালতি জল এনে রেখেছে। বালতিটা ভারি। ভাই বোনে টেনে আনতে গিয়ে সারা করিডর জলে ভাসিয়েছে। মিণ্টু যে কত কাজের টুটুল যে কত কাজের বাবাকে সেটাই দেখাবার উৎসাহ বেশি।

অতীশ বলল, কী করেছিস! সারা বারান্দায় জল! কে করতে বলেছে তোদের!

টুটুল বলল, বাবা আমি না। দিদি।

মিণ্টু ভেবেছিল, বাবা খুব খুশি হবে। কিন্তু বাবা কেমন বিরক্ত মুখে বারান্দাটা দেখছে।

—মুছে দেব বাবা?

—না না। পারবে না। তুমি যাও পড়তে বসগে। কতদিন স্কুল কামাই।

মিণ্টু কেমন ক্ষোভের গলায় বলল, আমি স্কুলে যাব না।

—কেন যাবে না?

—দিদিমণি বকবে।

—দিদিমণিকে বলে দেব। পুরানো পড়াগুলো দেখগে। তোমার মার শরীর খারাপ বললে সব বুঝবেন।

কিন্তু মিণ্টু দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে লতাপাতা আঁকা ফ্রক। ডল পুতুলের মতো মনে হয়। মামার বাড়ি থেকে চুল সুন্দর করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। ঘাড় পর্যন্ত রেশমের মতো ফাঁপা চুল। কানে ইয়ারিং। হাতে কাচের চুড়ি। সে এই প্রথম যেন লক্ষ্য করল মিণ্টু সব বোঝে। ছোট আর নেই। সে বাবার কষ্টও বোঝে। বাবাকে সাহায্য না করলে, একা বাবা কত দিক সামলাবে।

মিণ্টু নালিশ জানাল, জান বাবা, টুটুল বাড়ি থেকে বের হয়ে পাতাবাহারের গাছের ডালে উঠে গিয়ে বসেছিল। টুটুল একদম কথা শোনে না।

এই একটা ভয় এই বাড়িতে। টুটুলের বড় পুকুরপাড়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব। কারণ পুকুরের পাড়ে একটা বড় কদমফুলের গাছ, সেখানে একবার দুটো নীল রঙের পাখি দেখেছিল। পাখি, প্রজাপতি, ঘাস, ফুল, জঙ্গল, পুকুরের পাড়ে—এবং মাঠ তারপর। দুমবার সিং টুটুল মিণ্টুকে বলেছে, পুকুরের পাড়েও পরীরা রাতে নামে। খেলা করে। পরীদের কথা টুটুল

মিণ্টু বড় মনোযোগ দিয়ে শুনতে ভালবাসে।

মিণ্টুই বলল, দুমবার এয়েছিল?

—কেন!

মিণ্টু কি জবাব দেবে বুঝল না। কেন এসেছিল, সে জানে না।

—কিছু বলল?

—মাইজী-এয়েছে? বলল।

—কি বললি?

মিণ্টু দুমবারের সঙ্গে যে অনেক কথা বলেছে জানালায় দাঁড়িয়ে তা বলতে ভরসা পেল না। সে দুমবারকে বলেছে, জান দুমবার-দা আমার মা না কেবল শুয়ে থাকে। মাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয় না। মা বিছানা থেকে উঠে আমাদের খাওয়াতে বসলে দিদিমা রাগ করে। মাসি রাগ করে।

—কী রে চুপ করে আছিস কেন?

—বাবা!

মিণ্টু অপলক তাকিয়ে আছে।

—বলছি দেশলাইটা আনতে।

মিণ্টু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে ছুটে গিয়ে দেশলাই নিয়ে এল।

টুটুল পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কী আনব? তুমি দিদিকে আনতে বললে কেন? বলেই মিণ্টুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে বাবার হাতে দিল।

মিণ্টু দুমদাম করে কটা কিল বসিয়ে দিল টুটুলের পিঠে।

—ইস তোরা আবার লাগালি! আমি কিছু জানি না, যা খুশি কর। ছোট ভাই হয় না! এ-ভাবে মারতে আছে।

টুটুল কাঁদেনি। টুটুল না কাঁদায় মিণ্টু আরও ক্ষেপে গেল। সে বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। টুটুল দেখল দিদি শুয়ে আছে। বাবা স্টোভ জেলে চাল ড্রাম থেকে নিচ্ছে। ডিম ধুয়ে রাখছে। আলু কাটছে। টুটুল আলু বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে। দিদি নেই—বাবার সব কাজে সে একা। প্রায় সাম্রাজ্য জয় করার মত বলল, আমি চাল ধুয়ে আনি বাবা। তুমি দাও। আমি পারব।

—তুমি পারবে না। দেখ তো দিদি কী করছে।

দিদি কী করছে জানার তার মোটেই আগ্রহ নেই। বরং সে দিদির ঘরে যেতেই সাহস পাচ্ছে না। গেলে আবার মারবে। সে কিছুতেই নড়ছে না। বাবার পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে।

—দিদি কী করছে দেখতে বলছি না!

—আমাকে মারবে। কেবল মারে। আমায় কান মলে দিয়েছে।

—তুই কিছু করিসনি! এমনি এমনি কান মলে দিল!

টুটুল চালের বাটিটা নিয়ে উঠে যাবার মতলবে আছে। অতীশ এটা বুঝতে পারে। এক মুহূর্ত টুটুল চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ওর বিদ্যারম্ভের জন্য কিছু আয়োজনের দরকার। বাবা বলে দিয়েছেন, পূজার আগে দিন-ক্ষণ দেখে জানাবেন। বিদ্যারম্ভ না হলে যেন ওকে বই কিনে দেওয়া না হয়। বাবা এও বলে দিয়েছেন। কী কী লাগবে, একটা পাথরের পাত্র। তার পিঠে চক-খড়িতে লেখা। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে যেন এটি করানো হয়। তারপর বাবা কী বুঝে বলেছেন, ঠিক আছে বিদ্যারম্ভ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি পঞ্চতীর্থকে নিয়ে আমি নিজেই যাব। তার মানে পূজার আগে একটা ছোটখাট অনুষ্ঠান। মিণ্টুর বেলায় এ-সব হয়নি। মেয়ে বলেই হয়নি। কিন্তু টুটুল অতীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সত্যি তো। বাবার ধারণা, আরও তাদের সন্তানসন্ততি হবে। টুটুলেই থেমে থাকবে না। সংসারে জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য পিতার অনেক দায়। অতীশ পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্যক্ষণ বিহ্বল হয়ে থাকল। তারপর কী ভেবে বলল, দ্যাখ না দিদি কী করছে। সাড়া পাচ্ছি না।

কিন্তু টুটুল নড়ছে না।

অতীশ এবার না পেরে ডাকল, এই মিণ্টু শোন।

মিণ্টু এক লাফে হাজির।

—যা তো মা, চালটা ধুয়ে আন। পারবি তো?

সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টুর সব ক্ষোভ উবে গেল। সে বাটিটা নিয়ে দৌড়ে গেল। অতীশ হা হা করে উঠল, আছাড় খেয়ে পড়বি তো। অত জোরে ছুটতে আছে!

টুটুলের বিদ্যারম্ভের জন্য বাবা বার বার বলেছেন, তোমার তো ঈশ্বরে বিশ্বাস কম। কিছু মান না। সংসারে থাকতে হলে কিছু মানতে হয়। তোমরা তো আর কলাগাছ ফুঁড়ে বের হয়ে আসনি। যা খুশি মানুষ করতে পারে না। বংশের প্রথম ছেলে—নিয়মকানুনগুলো মেনো। বড়টার তো সব কজন মেয়ে। পুত্র সন্তান না থাকলে মানুষের শেষ পারানির কড়ি থাকে না। বংশের হয়ে জল দেবার সেই একমাত্র অধিকারী। এ-সব বুঝতে শেখ।

টুটুলের বিদ্যারম্ভের বয়স হয়নি। কিন্তু বাবার ধারণা শহরে বাস করলেই মনের মধ্যে আগাছা জন্মায়। কে জানে কবে না ছেলেটাকে মা-বাবা মিলে অ আ শেখাতে শুরু করে দেয়। জীবনের শুরুতেই আচারবিচারহীন হয়ে পড়লে বংশের এই সন্তানটি তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের মতো ম্লেচ্ছ না হয়ে যায় সেই ভয়।

আর আশ্চর্য অতীশ নিজের বেলায় সে যতই এ-সব বিষয়ে অবহেলা দেখাক, পুত্রের বেলায় কেন যে এত দুর্বল! অনুষ্ঠান না করে সে টুটুলকে বইও কিনে দিতে পারবে না। কেজিতে ভর্তি করতে হলে এই বয়স। অন্তত স্কুলে এলে গেলে কিছুটা সময় নির্মলা নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু তা করারও উপায় নেই। চিঠিটায় সে ভাবল, দুটো লাইন যোগ করে দেবে। পূজার আগেই টুটুলের বিদ্যারম্ভ দেব ভাবছি। দিনক্ষণ জানিয়ে চিঠি দেবেন। কিংবা মাকে আসার সময় বলে দেবেন।

স্টোভ জেলে সে ভাত বসিয়ে দিল। ডিম সিদ্ধ দিয়ে দিল। আলু ঢেঁড়স সব। কাজের মেয়ে এখনও রেখে উঠতে পারেনি। কুম্ভবাবু সুরেনের বড় মেয়ে সুখীর কথা বলেছিল, রাখুন। দু বেলা খেতে দেবেন। সব কাজ করবে। সুরেন বামুন তার মেয়ে যদি থাকে তবে অতীশ জানে বাবার আপত্তি থাকবে না কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা কম। একজনকে ভরণপোষণ দিয়ে উদ্বৃত্ত কী আর থাকবে! বাবাকে টাকা পাঠাতে কষ্ট হবে। সে ডাকল, মিণ্টু এদিকে আয়।

মিণ্টু এলে বলল, তোরা এখানে দাঁড়া।

দরজা খোলা। বিড়াল কুকুরের উৎপাত আছে। সে প্রায় এখন ছুটে ছুটে কাজ করছে। বিছানা তুলে ফেলল। চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখল। মিণ্টু বাবাকে বলল, আমায় দাও না বাবা। আমি পারব। মিণ্টু এত বাবার কষ্ট বোঝে! পারবি? বলে মিণ্টুর দুগালে চুমো খেয়ে বলল, তুই আমার কষ্ট এত বুঝিস! তুই আমার সোনারে!

মিণ্টু ফিক করে হেসে দিল।

মিণ্টু একটুখানি ঝাঁট দিয়েই হাজির, বাবা এস।

অতীশ ভাতের মাড় গালছিল।—কী হল!

—এস না।

ভাতটা রেখে সে মিণ্টুর পিছু পিছু গেলে বলেছিল, হয়েছে?

তার বাবা কাজ দেখে খুশি হবে ভেবে কী ছটফট করছিল মেয়েটা!

বাবাকে খুশি করার মধ্যে ভারি আনন্দ। এদিক-ওদিক নোংরা পড়ে আছে। তবু অতীশ বলেছিল, সুন্দর হয়েছে। তারপর সে ঝাঁটাটা মেয়ের হাত থেকে নিতে গেলে বলল, দাও না আমি পারব। ঝাঁট দিচ্ছি তো!

—পেতে ঝাঁড় দেবে। এই যে দেখছ, এ-ভাবে।

—আমি তো জানি। তুমি সর না!

টুটুল সব দেখছিল। বাবা তাকে কিছু করতে দিচ্ছে না। সে তক্তপোশের নিচে ঢুকে তার পুতুলের বাক্স বের করে এক কোনায় বসে গেল। আর মিণ্টু সইতে পারল না।—এখন তোমার সময়, হ্যাঁ, তুমি বাবার সঙ্গে অফিস যাবে।

চল চান করিয়ে দিচ্ছি।

অতীশ শুনতে পাচ্ছিল সব। রান্নাঘর থেকে শুনতে পাচ্ছে, দিদি ভাইকে শাসন করছে।

মিণ্টু একেবারে তার জননীর গলায় বলছে, আমি তোমাকে চান করিয়ে দেব। একদম দুষ্টুমি করবে না। দুষ্টুমি করলে দেখবে দুমবারকে বলে দেব।

দুমবারকে টুটুল ভয় পায়। আবার দুমবার সিং যখন পরীদের গল্প বলে, তখন সে জানলায় দাঁড়িয়ে শোনে। পলক ফেলে না। দুমবারকে দেখলেই টুটুল বলবে, তোমার হাত দেখি।

—নেই। কিছু নেই।

—জ্যাব।

—নেই। কিছু নেই।

তাতেও টুটুল আশ্বস্ত হতে পারে না। টুটুলকে এখনও কিছুতেই প্যাণ্ট পরিয়ে রাখা যায় না। পরিয়ে দিলেই খুলে ফেলবে। মিণ্টুর ভারি সম্মানে লাগে!—হাঁদা কোথাকার। ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াতে তোর লজ্জা করে না! দুমবারকে ডাকব!

তখনই টুটুল সুড়সুড় করে প্যাণ্ট পরে ফেলে। দুমবার একবার হাতে একটা মরা কাঠ-ব্যাং নিয়ে এসেছিল, বলেছিল, টুটুলবাবু প্যাণ্ট না পরলে ওটা ওখানে ঝুলিয়ে দেব। সেই থেকে টুটুল দুমবারকে দেখলেই তার হাত দেখতে চায় জ্যাব দেখতে চায়।

টুটুলের ধারণা দুমবার সব সময় এদিক ওদিক লুকিয়ে থাকে। সে প্যাণ্ট খুলে ফেললেই দুমবার হাজির হবে। তবু সে খুলত না তা নয়। খুলে তক্তপোশের তলায় রেখে দিত। কিন্তু এবারে মামাবাড়ি থেকে এসে সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলেছিল, আমায় প্যাণ্ট পরিয়ে দেবে না বাবা। মাসিরা কেবল বকে।

সে এখন আর প্যাণ্ট খুলে ফেলে না।

নির্মলাদের বাড়ির আলাদা আভিজাত্য অতীশ এ-ভাবে টের পায়। আর তাঁর বাবা মা এক অন্য গ্রহের মানুষ যেন! সে নিজেও। বাড়িতে তার মনে আছে হাসু ভানু ছ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে নিজেও আট দশ বছর বয়স পর্যন্ত স্নান করতে গেলে, পুকুর পাড়ে প্যাণ্ট রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, সাঁতার কাটত। বাবার ধারণা, শরীর যতদিন খোলা মেলা রাখা যায়! বাবা জ্যাঠারা কোনদিন বলেননি, এই উলঙ্গ হয়ে জলে সাঁতার কাটছিস কেন। বড় জেঠিমা, মা কিছু বলত না। কেবল একবার মনে আছে, তাদের এই সাঁতার কাটা দেখে দেশের বাড়িতে পাগল জ্যাঠামশাইও সব

পাড়ে রেখে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মাস্টারমশাই পাড়ে দাঁড়িয়ে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গেছিলেন বাড়িতে। বড় জেঠিমাকে খবর দিতে। একমাত্র বড় জেঠিমাকেই পাগল জ্যাঠামশাই সমীহ করতেন। পাড়ে এসে দাঁড়াতেই জ্যাঠামশাই তাড়াতাড়ি নিরীহ বালকের মতো পাড়ে উঠে জিভে কামড় দিয়ে ফেলেছিল। বড়দা মেজদাকে সেদিনই জেঠিমা শুধু বলেছিলেন, আর কখনও জলে এভাবে নামবে না। তোমরা বড় হয়েছ। তোমরা তো জান মানুষটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

টুটুল তো মাত্র তিন বছর পার হয়ে চারে পড়েছে। মিণ্টু পাঁচ পার হয়ে ছয়ে পড়বে। এরই মধ্যে এরা এত বোঝে কী করে! মানুষের মধ্যে সরল সহজ জীবনটা কারা যেন ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে। সে প্রেসারে ডাল বসিয়ে তার নোংরা জামা প্যাণ্ট টুটুল মিণ্টুর সবার বালতিতে সার্ফ দিয়ে ভিজিয়ে রাখল। স্নানের সময় কেচে দেবে। একবার মিণ্টুকে বলল, কটা বাজে?

মিণ্টু দৌড়ে এসে বলল, আটটা।

একটু বাদে অতীশ ফের মিণ্টুকে ডেকে বলল, তোর চান হয়েছে?

মিণ্টু আয়নায় চুল আঁচড়াচ্ছিল। বলল, আমায় ডাকছ বাবা! বাবার কথা বড়ঘর থেকে ঠিক বোঝা যায় না।

মিণ্টু দৌড়ে এসে দরজায় দাঁড়ালে দেখল, মেয়ে তার স্কুলের পোশাক পরে, পায়ে কেডস জুতো মোজা পরে রেডি।—নে তুই খেয়ে নে। বলে ভাত বেড়ে পাখার হাওয়ায় ঠাণ্ডা করতে থাকল। ডাল সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত কচলে মেখে বলল, বসে পড় দেরি করিস না। কত কাজ।

মিণ্টু বড় সুন্দর করে খায়। একটা ভাত ফেলে না। টুটুল পাশে বসে দিদির খাওয়া দেখছে।

মিণ্টু এক গরাস ভাইয়ের মুখের দিকে বাড়িয়ে দিতেই টুটুল হাঁ করে দিল।

—ওকে দিচ্ছিস কেন?

অতীশ দ্রুত হাতে কাজ সারছে। কাঁধে তোয়ালে ফেলা। টুটুলের চান হয়ে গেছে। টিফিন বাক্সটা সার্ফে কলপাড় থেকে ধুয়ে এনে দু-পিস পাঁউরুটি আর একটা সন্দেশ পুরে মিণ্টুর ব্যাগে ভরে রাখল। একটা চিঠি লিখল, কেন মিণ্টু স্কুলে এক মাস যেতে পারিনি। চিঠিটা দারোয়ানের হাতে দিতে হবে।

অতীশ আবার দৌড়ে গেল ঘরে। ব্যাগ খুলে দেখল বই খাতা পেনসিল সব ঠিক নিয়েছে কি না। নির্মলা নেই। থাকলেও তার পক্ষে সব দেখা সম্ভব নয়। কেন জানি বুঝতে পারছে, তার জীবনে আরও প্রবল ঝড় উঠতে পারে। সবদিক সামলে সেই ঝড় থেকে দুই শিশুর আত্মরক্ষাই তার যেন এখন

সব চেয়ে বড় কাজ। মিণ্টুর খাওয়া হয়ে গেলে পাঞ্জাবি গলিয়ে বের হবার সময় টুটুলকে বলল, দিদিকে স্কুলে দিয়ে আসছি। কেমন—দুষ্টুমি করবে না। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করবে না কেমন?

আশ্চর্য টুটুল এখন বড় শান্ত। বাবা যা বলছে, তার বাইরে সে কিছু করতে পারে না যেন। এমন কি অতীশের মনে হয়েছিল, যাবার সময় সঙ্গে যাবে বলে বাহনা করতে পারে তাও না। বাবার কণ্ঠটা এতটুকুন ছেলেও কী টের পায়! এমন দুরন্ত শিশু একেবারে নরম কাদামাটির মতো। যেমন ভাবে রাখা হবে, তেমনি থাকবে যেন। বের হবার সময় শেকলটাকে তুলে দিল। রান্নাঘরের শেকল তুলে দিল। আলো নেভালো। কতরকমের অশুভ আতঙ্ক যে এই সময়ে অতীশের মন তোলপাড় করতে থাকে। সে বলল, একা ভয় পাবে না তো। অতীশের বড় ভয় জীবনের এই পুতুলের বাক্সটা কেউ না আবার চুরি করে ভাগে। টুটুল বলল, আমি না বাবা জানালায় বসে থাকব। এতটুকু নড়ব না।

পুরানো প্রাসাদ বাড়ি হলে যা হয়, বিশ ত্রিশ ইঞ্চি দেয়াল। জানালার শিক ধরে উঠে বেশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকা যায়। বাইরে বের হয়ে কী মনে হল কে জানে, সে বলল, জানালায় দাঁড়িয়ে কিন্তু পাতাবাহারের গাছ থেকে ডাল পাতা ভাঙবে না। গাছগুলো বড় হয়ে তার জানালার দিকে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানেই সে এক রাতে একা থাকার সময় দেখেছিল, আর্চি'র অবয়ব বাষ্প হয়ে সারা বাসাবাড়িটায় পাক খাচ্ছে। সে তখন কেমন হেঁকে উঠেছিল, তুমি কে?

দূর থেকে কেউ যেন হেঁকে গেছিল, আমি আর্চি'।

—তুমি কেন?

—আমাকে তুমি খুন করেছ। তোমার ক্ষমা নেই।

—সে তখন বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই বাষ্পাকারে অবয়বের মধ্যে, হঠাৎ দেখেছিল দুটো জোনাকি পোকা জ্বলছে। তারপর ধীরে ধীরে সে যখন প্রায় সংজ্ঞা হারাবার মতো তখন টের পেয়েছিল এটা বের হয়ে যাচ্ছে জানালার গরাদের ফাঁকে। এবং পাতাবাহারের গাছগুলির মধ্যে মিশে গেছিল। চোখের ভুল হতে পারে, বিভ্রম হতে পারে—সে বিশ্বাস করেনি, মানসিক বিকার থেকে সব হচ্ছে! পরে সত্যি কিনা দেখতে গিয়ে পাতাবাহারের পাতায় দেখছিল জল জমে আছে। কুয়াশা জমে পাতা ভিজে গেলে যেমনটা হয়।

অতীশ এই পাতাবাহারের গাছগুলির সামনেই টুটুলকে বসিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে। কোনো উপায় নেই। তার তো কেউ নেই। সে তো বলতে পারে না ঈশ্বর আপনি আছেন, ওকে এই মুহূর্তে আপনার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। কাকে বলবে। দুমবারকে! কিন্তু সে তো রাজবাড়ির মানুষ। তার-অন্য কাজ

থাকতে পারে। সুরেনের মেয়ে সুখীকে ডেকে আনবে।—একটু দরজায় দাঁড়াও আমি আসছি। কিন্তু সুখীকে গিয়ে পাবে কি পাবে না জানে না। মেয়েটা সারাদিন এ-বাসায় ও-বাসায় বসে থাকে। কেমন ছন্নছাড়া উদাস—ভেতরে কী এক জ্বালায় অতিষ্ঠ। হতেই পারে। স্বামী পরিত্যক্তা। ভেতরে জ্বালা থাকতে পারে। টুটুলকে তার হাতে রেখে যেতেও কেন যে ভরসা পাচ্ছে না!

মিণ্টু বলছে, চল বাবা। এই ভাই, তুই জানালা থেকে কোথাও যাস না। বাবা আমাকে দিয়েই চলে আসবে।

হঠাৎ কী মনে হল অতীশের কে জানে। সে বলল, টুটুল তুমি ঘরে গিয়ে বস। এখানে বসতে হবে না।

টুটুল উঠছে না।

—কী যাও!

—না আমি কিছু করব না। ভিতরে ভয় করে।

অতীশ বুঝতে পারে, সে এখানে বসে থাকবে বাবার প্রতীক্ষায়। বাবা তাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছে। টুটুল কী অভিমানে এবারে কেঁদে ফেলবে! অতীশ আর পারল না, এস আমার সঙ্গে। টুটুল যেন প্রাণ হাতে ফিরে পেল। সে খালি পায়ে ছুটে বের হয়ে এসেছে।

—খালি পায়ে না। চটি পরে এস। টুটুল আবার দৌড়ে গেল। চটি গলিয়ে বের হয়ে এল। কি উজ্জ্বল চোখ! কী অপার বিস্ময় বাবার হাত ধরে দিদিকে স্কুলে রাখতে যাওয়া। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। বাবার হাত থেকে তাকে কেড়ে নেবার মত শক্তি আর কারো আছে সে জানে না। সে যেতে যেতে সামনে যাকেই দেখল, বলল, আমার বাবা। আমার দিদি।

টুটুলের এই স্বভাব কবে থেকে। যাকেই দেখবে রাস্তায়, সে কার সঙ্গে যাচ্ছে বলবে। আমার বাবা, আমার দিদি ছাড়া এসময় আর তার মনে অন্য কোনো চিন্তা আসে না। এমন কি সেই অলৌকিক মোহময় পরীরা ছাদে কিংবা পুকুরপাড়ের কদমগাছটার নিচে নামে, তাও সে মনে করতে পারে না।

অতীশের তখন মনে হয়, ওদের বাবা ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কেউ বুঝি থাকবে না। সে যেতে যেতে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। গেটে সাদেক আলি দাঁড়িয়ে সেলাম দেয়। সে তার দিকে তাকিয়ে বলে, শোনো সাদেক, মিণ্টুকে স্কুলের দারোয়ান দিয়ে গেলে, তোমার পাশে বসিয়ে রাখবে।

গেটের পাশে একটা ঘর। মাথায় গম্বুজ। একটাই দরজা। দুটো খাটিয়া দুজনের। একজন রাতে, সাদেক দিনে। পালা করে পাহারা দেয়। মাথার উপর বিশাল এক দেবদারু গাছ। তার ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ

এদিকে না এলে, বিশেষ করে রাজার বড় আমলারা, সে টুলে বসে বন্দুকের নলে থুতনি রেখে ঝিমোয়।

সাদেক আলি বলল, জী সাব।

সাদেক আলি এর চেয়ে বেশি কথা বলে না। এই জী সাবই যথেষ্ট। মিণ্টুকে দিয়ে গেলে তার পাশে বসিয়ে রাখবে—আর সারাক্ষণ খোকিদি খোকিদি করবে। টেবিল থেকে নড়তে দেবে না। এই বিশাল রাজবাড়ির অনেক অলিগলি, কোথায় গিয়ে আটকা পড়বে নড়তে পারবে না—সাদেক আলি বেইমানি জানে না। সে জানে বেইমানি করলে আল্লার গজব মাথায় নেমে আসবে।

স্কুলের দারোয়ানের হাতে চিঠিটা দিয়ে অতীশ মিণ্টুর দিকে তাকাল। মিণ্টুর ভীতু মুখ—সে হাঁটু গেড়ে মেয়ের পাশে বসে কপালে চুমু খেল। বলল, কোন ভয় নেই। দিদিমণি বকবে না। তুমি যাও। মিণ্টু দৌড়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলে টুটুল বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।—বাবা আমাকে!

—অ! তাইতো!

সে হাম খেল টুটুলকে। টুটুলকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ট্রাম রাস্তা পার হতে হয়। এ-পারে গলির মধ্যে মিণ্টুর স্কুল, ওপারে গলি পার হলে, রাজবাড়ির সদর দরজা। অতীশ হন হন করে হেঁটে যেতে থাকল। ঘড়িতে দেখল নটা বাজে। হাতে সময় কম। টুটুলকে খাওয়াতে হবে, নিজের চান খাওয়া জামা প্যাণ্ট ধোওয়া, এ-সব কাজ সেরে ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রাম রাস্তায়।

সে বাগান পার হয়ে নিজের বাসাবাড়িতে ঢোকার মুখে দেখল, দরজা খোলা। কে এল!

কে শেকল খুলে তার অজ্ঞাতে বাসার ভিতরে ঢুকে গেল! সে কি যাবার আগে তবে দরজা হাট করে খোলাই রেখে গেছিল! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে! সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। বড় দ্বিধায় পড়ে করিডরে ঢুকে দেখল, এক জোড়া চটি। কে এল! তার অনুপস্থিতিতে কী রাজবাড়ির বৌ-রাণী অমলা এসে বসে আছে! অমলা কখনও তার বাসায় একা আসে না। বৌ-রাণীর কোথাও একা যাবার নিয়ম নেই। সঙ্গে খাস খানসামা শঙ্খ থাকবেই অথবা দুম্বার সিং। শঙ্খ কখনও ভিতরে ঢোকে না। সে করিডরেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আর তখনই তার চটির শব্দে যে গলা বাড়িয়ে দিল তাকে আশাই করতে পারেনি। নির্মলা! রোগা শুকনো মুখেও আশ্চর্য প্রশান্ত হাসি। অতীশকে দেখে টুটুলকে দেখে ওর মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে।

—তুমি চলে এলে ?

টুটুল বাবার কোল থেকে নামার জন্য ছটফট করছে। মাকে দেখে টুটুলও যেন প্রাণ পেয়ে গেছে।

—ভাল লাগল না। তোমাদের ছেড়ে আমি একা থাকতে পারব না। কিছুতেই না।

সে তার শরীরের সব গ্লানি উপেক্ষা করে টুটুলকে বুকে তুলে নিল। ভয় পুতুলের বাক্সটা। তাও না আবার চুরি যায় !

—আরে করছ কী !

—কিচ্ছু হবে না।

—টুটুল এমন করতে নেই। মেজদি রাগ করবে।

—করুকগে। বলে সে টুটুলকে কোলে নিয়েই রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, কী খাবে মানুষটা ! কী খেয়ে অফিস যাবে ! টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে একা পেরে উঠবে না। বাড়িতে শুয়ে থাকলেও যেন অনেক সুরাহা হবে অতীশের। আসলে সে তা বলতে পারছে না, তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি এক মাস কী ভাবে দিন কাটিয়েছি সে আমিই জানি। তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হয়।

অতীশ কিছুই আর বলল না। সেও কম প্রসন্ন নয়। কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। জীবনের অনেকগুলো ফ্রণ্ট তার, জীবিকার জন্য এক একটা ফ্রণ্টে সে একাই লড়ছে ! নির্মলা এসে পড়ায় অন্তত তার একটা ফ্রণ্ট মজবুত। সেখানে সে না থাকলেও হবে। সাদেক আলির কাছে আর মিণ্টুকে বাবার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে না। তবে প্রতীক্ষা মানুষের শেষ হয় না। সে জানে অফিস থেকে ফিরে দেখতে পাবে, তারা তিনজনই জানালায় দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়। সে ফিরলে বাড়ির সব প্রসন্নতা আবার জেগে উঠবে। নির্মলা তখন নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে বলতে পারবে, হাত মুখ ধুয়ে নাও। জলখাবার করে রেখেছি। সাজানো আছে। নির্মলা সংসারে না থাকলে অতীশ কত একা এই প্রথম যেন টের পেল। সে কেমন উদ্যমী মানুষের মতো বলল, আমি এসে সব করব। তোমার ভাত বসিয়ে দিচ্ছি। স্নান সারতে সারতে হয়ে যাবে। টুটুলের দিকে তাকিয়ে বলল, মা যা বলবে শুনবে। জ্বালাবে না। কী শুনতে পাচ্ছ ! দুষ্টুমি করবে না।

মা আসায় টুটুল এখন অন্য জগতে। সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মার সঙ্গে অজস্র কথা বলছে—আমি না মা, দিদিকে স্কুলে দিয়ে এলাম। জান মা পাগলটা না আবার গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

অতীশ বলল, কোথায় ! আমি তো দেখিনি !

—ঐ যে বাবা। লাঠি। মাথায় পুঁটলি। দেখলে না !

—ও হরিশ। কই আমি তো দেখলাম না।

—ট্রাম থেকে নেমে দৌড়ে গেল।

হরিশের এটা আছে। হরিশ পাগলা, সবই তার নিজের মনে করে। এমন কী এই কলকাতা শহরটাও তার নিজের। সে যে কোনো বাসে চড়ে বসে, ট্রামে উঠে পড়ে। ঠেলা খেয়ে আবার নেমে পড়ে। ওতে ওর কিছু আসে যায় না। একবার সাদেক আলিকে ধরে বেদম প্রহার। বেটা আমায় ঢুকতে দিবি না রাজবাড়ি ! রাজবাড়ি তোর বাপের। কার কে আছে ! কে মালিক ! তারপরই বগলের লাঠি মাথায় ঘোরাবার সময় শুধু একটিই বাক্য—দম মাধা দম, পাগলা মাধা দম। এখানে সেখানে উৎপাত করে বলে মারও খায়। দাঁতগুলি বোধহয় মেরেই ওর উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটা লম্বা দাঁত ঝুলে আছে ঠোঁটের বাইরে। এক গাল দাড়ি। তবে হরিশকে যারা চেনে, তারা কিছু বলে না। সাদেক আলি মার খেয়েও বলেছে, হুজুর ওর কোনো কসুর নেই। কসুর আমার। রোজ একবার রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ঢুকতে চায়। দিই না। বলে, শালা তোর জমিদারী ! তুই ঢুকতে দিবি না ! ব্যাটা পাগল ! কার জমিদারি—সব আমার ! আমায় তুই আটকে রাখবি ! আল্লার দুনিয়ায় কোনটা কার কেউ বলে দিয়েছে ! আহাম্মক বেটা চেরটাকাল নল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলি ! কার জন্য ! কার পাহারায় ! কে বেটা কাকে পাহারা দেয় ! তারপর উপরের দিকে হাত তুলে বলেছিল, আল্লার কাছে কয়ে দ্যাখ কী কয়। বেটা রাজবাড়ির মুখে মুতে দি। সত্যি সে সেদিন রাজবাড়ির সদর দরজার সামনে মুতে দিয়ে কোনদিকে চলে গেছিল। অনেকদিন তাকে আর এদিকটায় দেখা যেত না। আবার বোধহয় ফিরে এসেছে।

আর তখনই নির্মলার আবদার, আজ অফিসে যেও না।

অতীশ চোখ তুলে নির্মলাকে দেখল। চোখ মুখ বড় অধীর। ভেতরে তার বিদ্যুৎ খেলে যায়। রক্তে তুফান ওঠে। তারও ইচ্ছে করছে না যেতে। কতদিন পর যেন যুগ যুগ পার হয়ে গেছে, একটা মাস এত দীর্ঘ হয়। সে এই প্রথম টের পেয়েছে। নির্মলা স্বামীসঙ্গ পাবার জন্য কাতর। টুটুল পায়ে পায়ে ঘুরছে। একটু জড়িয়ে ধরে যে আদর করবে তারও উপায় নেই। অসুস্থ নির্মলা যেন সব কিছু অগ্রাহ্য করে তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবার জন্য ছুটে এসেছে। মেজদি জানেই না জীবনের এই রকম রহস্যে কী মজা আছে।

সে বলল, না গেলে হবে না। আজ ক্যাস বুঝে নেবার কথা। সনৎবাবু যাবেন।

—বলে পাঠাও না, শরীর ভাল নেই।

অতীশ হাসল। তারপর ইশারায় কিছু বললে, নির্মলা বাথরুমে ঢুকে গেল।

অতীশ টুটুলকে বলল, দেখ তো তোমাকে মামার বাড়ি থেকে কি দিল?

—কী দিয়েছে বাবা?

—দেখ না। এই তো সব পড়ে আছে। টুটুলকে কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে দিতে চায়। সে মার ব্যাগ বাক্স হাঁটকাতে পারলে ভারি খুশি।

অতীশ বলল, কী আছে?

—পুডিং।

—চুপচাপ বসে খাও। আসছি। স্নানে যাচ্ছি কেমন!

টুটুল বলল, আমি সব খাব।

অতীশ এত অধীর হয়ে উঠছে বাথরুমে ঢোকার জন্য যে এতটা খেলে টুটুলের অনিষ্ট হতে পারে তাও মাথায় আসছে না। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত টুটুল বাবা মার কথা ভুলে থাকুক—কারণ সে তো বোঝে না বাবা মা কত অস্থির হয়ে আছে। সে বলল, পারলে খাবে। আমি যাচ্ছি কেমন! তোমার মা বাথরুমে। আমি স্নানে যাচ্ছি।

অতীশ খুব সতর্ক পায়ে বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিল।

॥ চার ॥

অতীশ অফিসে ঢুকতেই সুধীর বলল, বাবু আপনার ফোন এয়েছিল।

অতীশ বলল, কিছু বলেছে?

—আপনি এলে ফোন করতে বলেছে। সুধীর তার টেবিল ডাইরিতে ফোন নম্বর লিখে রেখেছে দেখল। নির্মলাদের বাড়ির ফোন। সে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। নির্মলা চলে আসায় ওর মেজদি, বাবা মা সবাই বিরক্ত হতে পারে। ওরা কী বোঝে, অতীশের কাছে এলেই নির্মলা ফের অসুস্থ হয়ে পড়বে। নির্মলা তার স্ত্রী কে বলবে!

সে তবু ফোন তুলে বলল, কে বিমলা?

হ্যাঁ। ধরুন। মেজদি কথা বলবে। মেজদি অতীশদার ফোন।

ওর মুখটা ভয়ে চুন হয়ে গেল। মেজদির কথাবার্তায় কোনো রাখঢাক নেই। ডাক্তার, তার ওপর গাইনি, কথায় রাখঢাক কম।

—এই কে অতীশ!

—হ্যাঁ।

—শোনো, নির্মলা চলে গেছে। ও ঠিকমতো গেছে তো? কারো কথা শুনল না। আর কটা দিন কিছুতেই থাকতে চাইল না। শোনো ওর কিন্তু রেস্টের দরকার। মনে হচ্ছে ডি-সি করতে হবে না। ফ্যাকাসে ভাবটা কেটে গেছে। হিমগ্লোবিন নর্মাল। আর কিছুদিন থাকলে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠত। সে যাকগে, ওকে কোনো ভারি কাজ করতে দেবে না। আর শোনো…

অতীশ টের পাচ্ছে, মেজদি কেমন আমতা আমতা করছে ঠিক কীভাবে কথাগুলো বলা যায় বুঝতে পারছে না।

অতীশ এবার কেমন মরীয়া হয়ে বলল, আচ্ছা মেজদি, অসুখটা কি…। ওর কী ইউটেরাসে সত্যি টিউমার হয়েছে!

অসুখটা ইনফেকশান থেকেই মনে হয়। টিউমার হয়নি। হরমোন ডিজব্যালেন্স থেকেও হতে পারে। স্যার গত সোমবার দেখেছিলেন। বলেছেন, নাইনটি পারসেন্ট কিওর। তবে কী জান অসুখটা একটু ভাল হয়ে গেলেই মনে করে সেরে গেছে। হ্যাঁ শোনো, তোমরা কিন্তু মানে…আমি বলছিলাম ওকে আলাদা বিছানায় শুতে দেবে। টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে তুমি আলাদা বিছানায়। বুঝলে কিছু!

অতীশের বলার ইচ্ছে হল, কিছুই বুঝলাম না। কারণ সে জানে আলাদা বিছানা কোনো দেয়াল তুলে দিতে পারে না। সে বলল, হ্যাঁ বুঝেছি! আসলে মেজদি সোজাসুজি না বলে ঘুরিয়ে বলে দিলেন,…নিষিদ্ধ। কিন্তু সেতো নির্মলা ঘরে ফেরার পরই…।

সে ফোন ছেড়ে দিতে পারছে না। দুটো চিরকুট হাজির। দুজন কাস্টমার দেখা করতে চায়। একজন আবার কানপুর থেকে এসেছেন। বাইরে কুম্ভবাবুদের ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যানেজারবাবুর অনুমতির জন্য তারা অপেক্ষা করছে।

—ওর ওষুধ সব ব্যাগে ভরে দিয়েছি। ঠিক মতো যেন খায়। তুমি দেখবে খায় কিনা!

—দেখব।

—কোনো কমপ্লিকেশন এরাইজ করলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। ওর স্বভাব তো তুমি জান। নিজের কথা একদম ভাবে না। খুবই অদূরদর্শী। নিজের কষ্টের কথা কাউকে সহজে বলে না।

অতীশ এর কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না।

—এত করে বলি, তোর শরীর ভাল না থাকলে ছেলে মেয়ে দুটো মানুষ হবে কী করে, কে দেখবে! অসুখটা একদিনের নয়। আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

অতীশ সব শুনে যাচ্ছে। যতক্ষণ কথা বলবে শুনে যেতেই হবে। আর

কোনো অভিযোগই তো মিথ্যে নয়। নির্মলা যে অদূরদর্শী, চাল নেই চুলো নেই—এমন একটা লোকের সঙ্গে চলে যাওয়াই তার প্রমাণ। নির্মলা খুবই অবুঝ যুবতী। মাঝে মাঝে এটা তার নিজেরও মনে হয়েছে। কতবার বলেছে দ্যাখ, আমরা উদ্বাস্তু, কলোনিতে থাকি, কিছু কুঁড়েঘর, কলা গাছ, পেঁপে গাছ কিছু আম গাছ নিয়ে আমাদের বাড়ি। তুমি ভেবে দেখ। আমার সামান্য স্কুলের মাইনেতে সংসার চলে। জমিজমার আয় তেমন কিছু নেই। অত বড় ঘর থেকে এসে তুমি এডজাস্ট করতে পারবে কিনা!

নির্মলার তখন এক কথা, আমি কি কিছু বুঝি না মনে কর!

—বুঝবে না কেন! ভুল করছ এটাই আমার বার বার মনে হয়। তোমাকে তো মেজদি বলেই দিয়েছে, তোদের দুজনেরই মাথা খারাপ আছে।

—কার মাথা কত সাফ আমাকে আর বোঝাতে এস না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। বাড়িতে ফিরলে আটকে দেবে। তারপর থেকেই মনে হয়েছে যে এতটা ভরসা নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসতে পারে, তাকে সে অবহেলা করে কী করে! বরং মনে হয়েছে, কিছু একটা করতে হবে, নির্মলার সম্মান তার সম্মান। নির্মলাকে অপমান করলে তার লাগে। আসলে যেন বাপের বাড়ির মানুষেরা বুঝিয়ে দিতে চায় সে নির্মলার বড় ক্ষতি করেছে। সে ভাবল, এমন কিছু করবে না, যাতে তার বাপের বাড়ির লোকেরা মজা পায়। অবশ্য মজা যে পাচ্ছে, এটা সে নির্মলার অসুখ দিয়েই টের পাচ্ছে। মেজদি আজই ইনফেকশনের কথাটা বলল। এতদিন এটা বলেনি। নির্মলা সেরে ওঠায় বোধহয় এটা বলতে সাহস পেয়েছে। সে নাবিক ছিল এক জীবনে, জাহাজের ছোটবাবু, বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেললে নাবিকেরা নেমে যায়। নাবিকের স্বভাব যেমন, যে-কোনো ঘরে, যে-কোনো নারীর সঙ্গে রাত কাটানো—সে তা থেকে ব্যতিক্রম বিশ্বাস করবে কি করে! বিশ্বাস নাই করতে পারে। মেজদি কী এরপরই বলবে, তোমারও কিছু পরীক্ষা করা দরকার। ব্লাড স্টুল ইউরিন সব।

মেজদি কখন ফোন ছেড়ে দিয়েছে, সে টেরই পায়নি। হঠাৎ কেন যে মাথাটা তার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—নির্মলার জন্য সে কোথাও যেতে চায়—তার সুখের উৎস সন্ধানে সে বের হয়ে পড়েছে, আর তাকে এত অবিশ্বাস! এমন যে একটা লজঝড়ে কোম্পানির ম্যানেজার, এটাও যেন নির্মলার সুখের জন্য কোনো এক উৎসের সন্ধান। রাজার বাড়িতে সে থাকে। রাজার কারখানার সে ম্যানেজার। নাবিক হলেই কি চরিত্র খারাপ হয়, এ কেমন ধারণা! নির্মলাও হয়েছে তেমনি, সহ্যের বাইরে চলে না গেলে সে কিছুতেই তার কষ্টের কথা অতীশকে জানাবে না। পাছে তার মানুষটা অযথা চিন্তা করে। নির্মলা চায় তার মানুষটা সব রকমের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাক। এমন কি সে এও দেখেছে, বাবার মাসোহারা

সময়মতো পাঠাতে না পারলে যখন মেজাজ অপ্রসন্ন তার তখন নির্মলার এক কথা, আমি তো আছি। ভাল হয়ে গেলে ঠিক একটা মাস্টারি পেয়ে যাব। তখন অসুবিধা হবে না। তুমি দেখ না, তোমার বন্ধুবান্ধবদের বলে! আমিও কাগজ দেখে এপ্লাই করছি। হয়ে যাবে মনে হয়। অযথা এতো ভাববে না তো! দুজনে চাকরি করে ঠিক দুটো সংসার চালিয়ে নেওয়া যাবে।

তাকে অপ্রসন্ন দেখলেই নির্মলা কেমন ভয় পেয়ে যায়। এই বুঝি প্যাকেট প্যাকেট ধূপবাতি আনার জন্য ছুটবে। সে তখন দিশেহারা হয়ে যায়। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় কী নির্মলার তবে হরমোন ডিসব্যালেন্স ঘটেছে! সে তো বলতে পারে না, নির্মলা আসলে এই আমার নিয়তি। বনি আমার ভিতর সাহস যোগায়। আর্চির প্রেতাত্মা আমাকে তাড়া করছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঈশম, কাপ্তান স্যালি হিগিনস আর আমার বাবা। মাথার উপর দেখতে পাই সে অতিকায় পাখিটা উড়ছে—যে আমাকে বনিকে ডাঙায় পেঁছে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।

অথবা সে ভাবে তার নিজের মধ্যেই কি হরমোন ডিসব্যালেন্স ঘটে! মাঝে মাঝে যে-জন্য সে আর্চির প্রেতাত্মাকে দেখতে পায়। অথবা গন্ধ পায়, পচা টাকার দুর্গন্ধ। তার নার্ভাসনেস থেকে যদি এসব হয়। হতেই পারে। সে তো সেই জাহাজে পালিয়ে গিয়েছিল কাজ নিয়ে দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য। তখন নির্মলা ছিল না, টুটুল মিণ্টু ছিল না। বাবা মা ভাইবোনের জন্যে সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। সেই গ্রহে অবশ্য কোনো অশুভ আত্মার প্রভাব ছিল না। সবকিছু ছিল নির্মল—জীবন সূর্যের মতো দিগন্তে উঁকি দিয়ে উঠে আসছিল। কিন্তু বনিই তার কাল। তার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই সে আর্চিকে খুন করেছিল। আসলে ওটা তার এক ভিন্ন গ্রহ। সে গ্রহ থেকে ধীরে ধীরে সে কবেই বিচ্যুত হয়েছে। নতুন গ্রহে সে এখন হাজির। মিণ্টু টুটুল নির্মলা তার উপগ্রহ। তাই নিয়ে মহাবিশ্বের অনন্ত জিজ্ঞাসার মতো মহাকালের গর্ভে এখন সে পাক খাচ্ছে।

আর এ-সময়ই সুধীর এসে বলল, ডাকব স্যার!

সে ফোনটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। টেবিলের ফাইলপত্র একদিকে সরিয়ে রেখে বলল, বল আসতে।

বেশ সুদর্শন এক প্রৌঢ় মানুষ এসেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কাস্টমাররা অধিকাংশই অবাঙালী। ভাঙা হিন্দিতে অতীশ তাদের সঙ্গে কথা বলে। যারা অতীশের সঙ্গে কথা বলে তারা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। ফলে উভয়ের কথোপকথনে যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হাসির উদ্রেক হতে পারে। অবশ্য, সুধীর কিংবা কুম্ভবাবু অথবা কারখানার অন্য শ্রমিকদের সামনে এমন ভাষাতেই কথা বলার প্রথা—এটা তাদের সহ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু এই মানুষটি তাকে বাংলাতেই বলল, বোধহয় প্রবাসী বাঙালী। দেখুন এটা। বলে সে তার ব্যাগ থেকে একটা কালো রঙের কনটেনার বের করল। কনটেনারটি টেবিলে রেখে বলল, আমার চিঠি বোধহয় পেয়েছেন? সব জানিয়েছি।

এতক্ষণে অতীশ মানুষটি কোন কোম্পানির তরফ থেকে এসেছে বুঝতে পারল। গলার টাই সামান্য আলগা করে দিচ্ছিল কথা বলার সময়। টাইয়ের নটে কোনো গণ্ডগোল নেই তো! অতীশও জাহাজে কাজ করার সময় টাই ঠিক পরতে পারত না। তার সতীর্থরা টাইয়ের কত রকমের নট আছে শিখিয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ এদেশী লোকেরা নটে গণ্ডগোল করে থাকে। টান মারলে ফাঁস লেগে যেতে পারে বোঝে না।

—চিঠি! কাস্টমার অতীশকে একটি চিঠি ফাইল থেকে খুলে দেখাল।

—হ্যাঁ। এবারেও ঢাকনা টাইট হয়েছে। ফিটিং ঠিক নেই। বলে কনটেনারটি অতীশের দিকে বাড়িয়ে দিল। অতীশ ঢাকনা খুলতে গিয়ে দেখল সত্যি বড় বেশি টাইট। ভ্যাকুয়াম করা মুখ। সামান্য লুজ ঢাকনা না দিলে মাল নষ্ট হয়। কামড়ি আলগা হয়ে যায় জোরজার করে ঢাকনা লাগাতে গেলে। চিঠির মধ্যে সব ত্রুটির উল্লেখ আছে।

অতীশ জানে সারা দিনমান এই চলবে। কতজন যে হরেক রকমের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে থাকবে! অতীশ বলল, ঠিক আছে বিলে লেস করে দেব। তবে চেকিংয়ে লোক যাবে। ডেমেজড কনটেনার রেখে দেবেন।

কাস্টমারটি এতদিন দেখেছে, যে পারসেন্টেজ ডেমেজড বলে লিখে পাঠাত সিট-মেটাল সেটাই মেনে নিত। এই নতুন ম্যানেজারবাবুর আমলেও সে তিনবার মাল নিয়েছে। দুবার ডেমেজড মালের পারসেন্টেজ কম লিখেছিল বলে, কোম্পানীকে চিঠি লিখেই রিবেট পেয়ে গেছে। কারণ কুম্ভবাবু নতুন ম্যানেজারটি আসার পরই চাউর করে দিয়েছে, সাবধান, মাথা খারাপ লোক আছে। হিসেব করে চলবেন। সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছে। এতে ধারণা হয়েছে, আরও বেশি দেখালে মন্দ কী! এবং সে শুনেছে, ম্যানেজার কাজ ভাল বোঝেন না। কুম্ভবাবুই তাকে চালায়। কিন্তু এতো ফ্যাসাদে পড়া গেল। কোনো মালই এবারে ডেমেজ হয়নি। কিছুটা রিবেট হাতিয়ে নেবার তালে এসেছিল। কিন্তু এখন যা দেখছে, তাতে বড় অবিশ্বাসের কাজ হয়ে যাবে। অবশ্য ব্যবসাতে এগুলো চালু, এ জন্য কুম্ভবাবু কমিশন নিতেন। অর্থাৎ ডেমেজ এলাউ করলে একটা পারসেন্টেজ কুম্ভবাবুর পকেটে চলে যেত। পুরানো কর্মীর কথার গুরুত্ব দিতেন ম্যানেজারবাবু।

কাস্টমারটি এমন সরলভাবে কথা বলছে যে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। অতীশ যদি মেজদির সঙ্গে ফোনে কথা না বলত তবে বোধহয় সেও রিবেট এলাউ করত। কিন্তু মাথা উত্তপ্ত হয়ে থাকলে যা হয়, সংশয়, শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে, সুতরাং সে বলল, আমাদের লোক যাবে।

—কাকে পাঠাবেন?

—আমি নিজেও চলে যেতে পারি।

কাস্টমার ভদ্রলোকটি সহসা কেমন গভীর গাড্ডায় পড়ে গেল। কিন্তু বিষয়ী মানুষেরা সহজে ঘাবড়ে যায় না। টিকে থাকার নাম জীবন এমন ভাবে। অপর পক্ষকে বুঝতে দেওয়াই হবে না, আদৌ সে এ-নিয়ে ভাবছে। কিন্তু অতীশের অত্যন্ত সতর্ক চোখ—বুঝতে পেরে বলল, চা খান। মনে মনে ভাবল শত হলেও কাস্টমার। তারপর বলল, কোথায় উঠেছেন।

কাস্টমারটি সিগারেট বাড়িয়ে দিল। নিজেও একটা ধরাল। কেমন আলস্য শরীরে যেন চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, এ-জন্য স্যার অতদূর যাবেন! আমরা তো কোনোদিন রাখিনি। স্ক্র্যাপ করে দিয়েছি। বাজারে কে-জি দরে বিক্রি হয়ে গেছে। এবার থেকে রেখে দেব।

অতীশের সামনে ডাঁই করা ভাউচারের ফাইল। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তবে সই। বিশেষ করে টি-এ, এবং এনটারটেনমেন্ট বাবদ খরচগুলি তাকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হয়। টাকা পাচার হয়ে যাবার এটা একটা রন্ধ্রপথ।

—হয়ে যখন গেছে, কী আর করা। ভবিষ্যতে করবেন না। অতীশ ভাউচারে সই করছে। মুখ না তুলেই কথা বলছে। মুখ তুলে কথা বললে, আজ সারাদিন কেন, আগামীকালও কাজ সেরে উঠতে পারবে না। আজই সনৎবাবু ভাউচারে কাউণ্টার সই করবেন বলেছেন। কিছুটা কাজ সেরেই তিনি বলবেন, বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। রাতে সেরে রাখব। সনৎবাবু কোম্পানী থেকে যে এলাউন্সটা নেন, সেটা অতীশের মাইনের চেয়ে বেশি। আসলে রাজা অর্থাৎ রাজেনদা তার মাথার উপর আর একটা চেকপোস্ট বসিয়ে রেখেছে। তার সামান্য মাইনে, লুজিং কনসার্ন হলে যা হয়। যারা আগে কাজ করে গেছে, মাইনের বদলে, এদিক ওদিক থেকে টাকা তুলতেই ব্যস্ত ছিল। মাইনেটা ছিল ফাউ। রাজার এতে খুব যেত আসত না। তিনি একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিক তাতেই তাঁর সুখ। কিংকর নারায়ণের অন্তত তাই ছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ ওরফে, কুমার বাহাদুরের হাতে এস্টেট চলে আসতেই চারপাশে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতে গেলেন, কোথায় কিরকম টাকা ওড়ে। এখানটায় দেখলেন টাকা ওড়ে, তবে যে যার খুশিমতো পকেটে পুরে নিয়ে যায়। কুম্ভবাবু তখন কে কি নেয়, কীভাবে নেয় তার খবর দিয়ে যেত। কারণ কুম্ভ ভেবেছিল চেয়ারটা তার দখলেই আসবে। কারণ তার বাবা রাজার

বিশ্বাসী আমলা।

ফোন বেজে উঠল ফের।—হ্যালো।

—রাম রাম বাবুজী।

—বলিয়ে।

—মাল কব মিলে গা।

বেল টিপলে সুধীর হাজির। অতীশ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—সুপারভাইজারকে ডাক। তারপর বলল, চা দে।

অতীশ চায় লোকটি এখন উঠে যাক। মালের অর্ডারপত্র কুম্ভবাবু নেয়। কিংবা হরিচরণ। নতুন ছেলেটিকে কুম্ভবাবুই তাকে বলে ঢুকিয়েছে। কারখানা ছোট হলে কী হবে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী—সব ঝকমারি পোহাতে হয়। ই এস আই, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, সেল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, তিন মাস অন্তর অন্তর বোর্ড মিটিং, রেজলিউশন, পারচেজ প্রোডাকশন রেজিস্টার, এমন হরেক রকমের কত দায় আছে তার। কোনো সেক্রেটারি নেই। ব-কলমে বলতে গেলে সনৎবাবুই ওপর ওপর সেটা করেন। কাজ মেলা বলেই হরিচরণ কুম্ভবাবুর লোক হওয়া সত্ত্বেও অতীশ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে রাজি হয়েছে। জানে হরিচরণ কুম্ভর বাধ্যের—কুম্ভ ঢুকিয়েছে, বাধ্য না হওয়াটাই অস্বাভাবিক কিন্তু যা তাকে পীড়ন করে, হরিচরণের মতো সৎ ছেলেটিকে কুম্ভবাবু বছর না ঘুরতেই অসাধু করে তুলবে! সে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না দিলে কিংবা সে যদি পছন্দমতো অন্য লোক এপয়েণ্ট করতে চাইত—পারত না। কুম্ভর বাপ রাধিকাবাবুকে দিয়ে রাজার কানে তুলত, কী কাজ, ওটা আমরা তুলে ফেলতে পারি। পারি বলে ঠিক, কিন্তু পরে অতীশকে ঝুলিয়ে রাখার স্বভাব। কোনো রিটার্ন ঠিক সময়ে সাবমিট না হলেই অতীশের নামে চিঠি। সময়ে এরিয়ার পড়লে তার নামে চিঠি, মাঝে মাঝে অতীশের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হয়—এ কি জগঝম্প জায়গা! এক দণ্ড মাথা তুলবার ফুসরত নেই। তারপর ইউনিয়ন কর্মী বিক্ষোভ, ই এস আইয়ের দৌলতে ফল্স মেডিক্যাল—কোম্পানির হাফ-মাইনে, অন্যত্র ফুরনে ডবল রোজগার—নিজের বিট মেশিন, কামড়ি মেশিন ফেলে অন্য কনসার্নে ফুরনে কাজ চলে। বেটারা বেইমান। মরবি। সব মরবি। আমিও মরব। তোরাও মরবি। পাশাপাশি আরও কয়েকটা সিট মেটালের কারখানা আছে। সবগুলিরই ব্যক্তিগত মালিকানা। নো প্রোডাকসন, নো পে। এমন একটা লজঝড়ে ভাঙা জাহাজ বন্দরে ভিড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার কেন, কাপ্তান স্যালি হিগিনসেরও ছিল না।

সুপারভাইজার এলে ফোন দিয়ে বলল, কথা বলুন।

অতীশ দেখল সুধীর তখন চা দিয়ে গেছে। সে ভাউচারে সই করতে করতে কথা বলছে কাস্টমারের সঙ্গে, টুটুলটা আবার ফাঁক পেয়ে দরজা গলিয়ে পুকুরপাড়ে চলে যায়নি তো! পুকুরটা একটা মারাত্মক বধ্যভূমি মনে হয়। টুটুলকে আসার সময় বার বার সাবধান করে এসেছে। ইস নির্মলাকেও বলতে ভুলে গেছে, দরজায় তালা দিও, নাহলে কোন ফাঁকে পরী খুঁজতে বের হয়ে যাবে টুটুল। সামনে বিশাল পুকুর, পড়ে টড়ে গেলে সর্বনাশ।

আসলে অফিসে বের হবার মুখে সে খুব খুশি ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন পর অন্তরঙ্গতার সুখ কোনো এক সুষমায় নিয়ে যেতে পারত তাকে —কিন্তু বার বার একটা মুখ, চারু, চেনা নেই জানা নেই, সে যে কী করে বসল! এটা ব্যভিচার! এই অপরাধ বোধ থেকে নির্মলার সঙ্গে বের হবার সময়ও একটু হেসে কথা বলতে পারে নি। চারুই তাকে পীড়নের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ফলে সব ভুলে গেছে। স্টেশনে পিয়ারিলাল চারুকে ট্রেনে তার সঙ্গে তুলে না দিলে জানতই না চারু বলে কোন যুবতী আছে পৃথিবীতে। এখন কুম্ভবাবু বলছে, চারু বলে কেউ নেই। সবটাই আপনার ঘোর থেকে! নির্মলাকে বলেনি তালা লাগিয়ে দাও। নির্মলার যা ভুলো মন, কিংবা এতদিন পর বাপের বাড়ি থেকে এসে সব গোছগাছ করতে যদি ব্যস্ত হয়ে পড়ে! বের হবার মুখে বলা উচিত ছিল, খেয়ে শুয়ে পড়বে। আমি এসে করব। তবে কতটা শুনত সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে। মাস দেড়েক বাপের বাড়ি থাকলে যা হয়। সব এলোমেলো।

—উঠি স্যার।

—হ্যাঁ, আচ্ছা। ঠিক আছে, মালের অর্ডার পাঠালে একটু আগে পাঠাবেন। এখন নরম টিনের বড় অভাব। লাইসেন্স, কোটা কখন কি মিলবে বলা মুশকিল। বাজার থেকে ইমপোর্টেড টিন তোলা যায়—হার্ড, খুবই—হার্ড, দাম তিনগুণ। হার্ড বলেই কামড়ি খুলে যায়।

অতীশ দরজা পর্যন্ত কাস্টমারকে এগিয়ে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল।

সুপারভাইজার তখন কাকে যেন বলছে, ও আমি কিছু বলতে পারব না। ম্যানেজার বাবুকে সাথ বাত কিজিয়ে।

অতীশ বলল, আপনি যা হয় বলে দিন, আমাকে দেবেন না।

সুপারভাইজার মহাফাঁপরে। কী করে! ফোনের মুখ চেপে অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, এ-সপ্তাহে মাল যাবার কথা ছিল।

—গেল না কেন?

—পি সি আর সি টিনই নেই।

—তার মানে!

—বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

—ওকে বলে দিন তবে। আমাকে দিয়ে কী হবে ?

—শুনতে চাইছে না। বলছে, ওর লোকজন বসে যাবে। লোকসানে পড়ে যাবে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

কেমন তিক্তবিরক্ত হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে বলল, বলিয়ে।

—মাল কব মিলেগা বাবুজী ?

—দেখি কী করতে পারি। বলেই সে ফোন ছেড়ে দিল। কুম্ভবাবুকে ডেকে পাঠাল। বলল, শেঠজীর মাল এ হপ্তায় দেবার কথা ছিল।

—এই অর্ডারবুকটা নিয়ে আয় তো। কুম্ভ গলা বাড়িয়ে হরিচরণকে ডাকল।

কুম্ভ এতেও মজা পায়। মাল কথামতো দিতে না পারলে দায় আদায় সব ম্যানেজারের। তবে একটা জায়গায় সহসা খচ করে কামড় দিল। তিনি তো মাসখানেক ছুটিতে ছিলেন। তার চার্জে ছিল সব। কুম্ভ সম্ভবত হারতে রাজি না। অর্ডার বুকটা পাল্টে দেখে বলল, তাই কথা আছে।

—গেল না কেন ?

অতীশ খুব গম্ভীর। মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। ভাউচার দেখছে। সই করছে।

—যাবে কী করে ! জোর করে যদি অর্ডার লিখিয়ে যায়, আমরা কী করব ! এত করে বললাম, শেঠজী হবে না, বাজারে মাল নেই—দিন তো ফোনটা বলেই সে শেঠজীকে ফোনে পেয়ে গেল। আরে আপতো আচ্ছা আদিম হ্যায়। আপলোগকো বোলা না বাজার মে মাল মিলতা নেই। জোরজার কিয়া, হামলোক ক্যা করেগা, আপতো বোলা না, ঠিক আছে লিখে নিন, পেলে দিবেন। না পেলে কোত্থেকে দিবেন !

অপর প্রান্তে কী কথা হচ্ছে অতীশ বুঝতে পারছে না। সে শুধু কুম্ভর কথাই শুনছে।

কুম্ভ ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল, যত্ত সব গাঁজাখোর লোক নিয়ে পড়া গেছে। কিচ্ছু মনে রাখতে পারে না। অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন, বললাম হবে না, পি সি আর সি বাজারে নেই। কিছুতেই মানবে না। নেই—আসবে। বাজার খালি থাকে কখনও। লিখে লিন। হয়ে যাবে। নিজে গাঁজা ভাঙ খায় বলে, ওকী ভাবে আমিও শিবঠাকুর। একেবারে জোঁকের মুখে নুন।

অতীশ এত কথা শুনতে চায় না। সে বলল, বাইরে যারা বসে আছে, ওদের, কথা বলে ছেড়ে দিন। দেখছেন তো কী হয়ে আছে টেবিল !

কুম্ভ ভিতরে তখন নানা কারণে উচাটন। যেভাবে খুঁটিয়ে সব ভাউচার দেখছেন, তাতে করে ধরা পড়ে যেতে পারে। স্ক্র্যাপ বিক্রির টাকা এত কম

কেন ! ডায়মণ্ডহারবার কেন গিয়েছিলেন। যাওয়া আসার ট্যাক্সি বিল কেন, সে হেসে বলল, দাদা অত খুঁটিয়ে দেখলে আজ কেন আগামী সপ্তাহেও শেষ হবে না। আমি দেখে রেখেছি, নিশ্চিন্তে সই করতে পারেন।

অতীশ ভাবল, সে পারে ঠিকই। যা ভাউচার হয়ে গেছে তা আর পাল্টানো যাবে না। সনৎবাবু তাকে শুধু বলবে, এগুলো মিস-ইউজ অফ মানি। কুম্ভ যে এসব জায়গায় না গিয়েও কোম্পানির টাকা মেরে দিচ্ছে, সোজা কথায় চুরি করছে—কিছুতেই সনৎবাবু তা বলবেন না। কেবল তাকে বলবেন টাকা যাতে মিস-ইউজ না হয় দেখবে। পরে তিনি কুম্ভকে ডাকবেন, ডেকে সব জানতে চাইবেন—কেন কি দরকারে—কিন্তু প্রতিবারই দেখেছে, এমনসব অকাট্য যুক্তি তুলে ধরে কুম্ভবাবু যে, কোম্পানির ভালর জন্যই এই টাকা খরচ করতে হয়েছে। সনৎবাবুর মত প্রবীণ এবং ঘুঘু লোকও টের পান সব, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেন না। কেবল বলবেন, ঠিক আছে, এ-ধরনের কাজে আমাকে আগে বলে নেবে। ব্যাস এই পর্যন্ত। এবং সনৎবাবু যতক্ষণ থাকে কুম্ভবাবুর মুখ বড় মলিন, এবং আজ্ঞাবহ দাস, তার নিজস্ব পৃথিবী বলতে কারখানা ছাড়া আর কী আছে—এমন মুখ। শুধু একটা জায়গায় তার জোর, বাবা তার রাজার দুনম্বরী টাকার হিসাব রাখে। বেশি ঘাঁটাতে সাহস পাবে না। কুম্ভ বলল, না দাদা, বাইরে যারা আছেন, ওদের সঙ্গে আপনিই কথা বলুন।

—ওরা কী জন্যে এয়েছে জেনে নিন, কেন আমার সঙ্গে দেখা করবে।

—এরা বস্তির লোক। আমাকে কিছু বলবে না। আপনার সঙ্গে ওরা কথা বলবে বলছে।

অতীশের মুখটা কেন জানি খুব গম্ভীর হয়ে গেল। কুম্ভবাবু তাহলে এদের চেনে। এই গোটা বস্তি অঞ্চলটাই রাজার। ট্যাক্স আদায়, বিল, ভাড়া সব রাজার প্রাইভেট অফিস থেকে আদায় হয়। রাজবাড়ির শ্রীনাথ প্রতিদিন এই অঞ্চলে ঘুরে যায়। তারই কত দাপট সে দেখেছে। আর কুম্ভবাবুর বাপ, রাজার বড় আমলা, কুম্ভবাবু রাজবাড়ির বড় আমলার জ্যেষ্ঠপুত্র। তার দাপট আরও বেশি থাকার কথা। অথচ নিজে কথা না বলে তার কাছে ভিড়িয়ে দিতে চাইছে।

অতীশ বলল, এরা আপনাকে চেনে ?

—চিনবে না কেন ?

—ওরা জানে আপনি সুপারিনটেনডেনটের ছেলে ?

কুম্ভ ঠিক বুঝতে পারছে না, অতীশবাবু তার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন !

কুম্ভ হাতের আংটি আলগা করে অন্য আঙুলে ঢোকাচ্ছে। বিচলিত

হলে সে এটা করে।

—কী, জানে ওরা ? আপনি রাজবাড়ির প্রভাবশালী মানুষ।

—জানবে না কেন !

—তাহলে আপনিই কথা বলুন। আমার সময় হবে না। বলুন। আপনার কাছ থেকে আমি পরে জেনে নেব।

কুম্ভ আর পারল না। ফস করে বলেই ফেলল, আমাকে বলেছে।

—এই যে বললেন বলেনি। অতীশ মাথা তুলছে না।

—না মানে, ওরা আমাকে ধরেছে, আমি বলেছি, আমার কোনো কথা দেবার ক্ষমতা নেই।

—আপনার না থাকলে আমার থাকবে মনে করলেন কি করে ?

—আপনি ওপরওয়ালা। কথা দেওয়া না দেওয়া আপনাকেই মানায়।

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে আমার হয়ে কথা বলতে বলছি। আপনি যা বলবেন, ধরে নেবেন এটা আমারই কথা। দায়দায়িত্ব আমার নিন, কথা বলুন গে। আসলে অতীশ কোনরকমে এই কঠিন জট থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। মনে হয় সবটাই প্রেতাত্মা আর্চির কাজ। কুম্ভ যেন আর্চির প্রেতাত্মা বহন করে বেড়াচ্ছে।

কুম্ভ এমন ফাঁপরে পড়বে আগে অনুমান করলে কিছুতেই এদের লেলিয়ে দিত না। আসলে সে চেয়েছিল, বুঝুক ম্যানেজারগিরি করা কাকে বলে, ঠেলা কতদিক থেকে আসে। রাজা নতুন কারখানা করছে, বিল্ডিং উঠবে, ক্যানেস্তারা মেশিন বসবে, নতুন শেয়ার ফ্লোট করবে রাজা, বস্তির সব পান্ডাদের বলে বলে মাথাভারি করে রেখেছে। এই তল্লাটে কারখানা, পান্ডাদের সঙ্গে দেখা হলেই এক কথা, কুম্ভবাবু আর কিন্তু মানব না। পাড়ার একটা ছেলে কাজ পাবে না। বে-পাড়ার লোকে ভর্তি করে রেখেছেন। বস্তির বেকার যুবকরা যাবে কোথায় !

কুম্ভ ওদের বলেছিল, আমি কে ? জানেনই তো, আগে ছিল, বুড়ো ম্যানেজার, সে তার দেশবাড়ি থেকে সবলোক সাপ্লাই করেছে। এখন নতুন ম্যানেজার এসেছেন, গোঁয়ার লোক, নিজে যা বুঝবে তাই করবে। এক চুল নড়ান যাবে না। মাথায় গোলমাল আছে। যখন তখন ধূপবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকে।

—গোলমাল !

—আরে মশাই অই। কারখানা চালাবে, ঘুষ দেবে না, খোলা বাজার থেকে মাল কিনতে গেলে নিজে দরদাম করবে ! তুই কারখানার ম্যানেজার এসব কী তোর শোভা পায় ! আমরা আছি কী করতে ! চরম অবিশ্বাস আমাদের। ভাল করলেও খারাপ, খারাপ করলে তো কথাই নেই। এই তো

রাজা নতুন ক্যানেস্তারা মেশিন কিনবে, নতুন বিল্ডিং হচ্ছে, আপনাদের একটা ছেলে কাজ পাবে ? পেলে আমার কান মলে দেবেন।

—কেন পাবে না। এটা কি তার বাপের জমিদারী !

—সে আর কে বলে ! আপনারা দেখা করে আগে থেকেই গাওনা গেয়ে রাখুন। আমি তো আছিই। বাবাও বলেন, রাজার বস্তি, বস্তির বেকার যুবকরা কাজ পেলে রাজারই সুনাম।

তারাই এখন এসেছেন।

কুম্ভকে এখন তাদের সামলাতে হবে। অতীশবাবু এমন প্যাঁচে ফেলে দেবে সে অনুমানই করতে পারেনি। অতীশবাবু ভুল করলে সাত খুন মাপ, —ও কী বোঝে ! নতুন, তুই তো জানিস সব, জেনে তুই অতীশ বলল বলেই— এ ভাবে ওদের কথা দিলি !

কুমার বাহাদুর ফিরে এলে অভিযোগ, কিংবা বৌ-রাণীর অভিযোগ, তুই কুম্ভ ওদের কথা দিলি !

কী করব ! অতীশবাবু বললেন, ওঁর হয়ে কথা বলতে।

ঠিকই করেছে। ও কী বোঝে সব ! কুম্ভর মাথায় চড়াৎ করে একটা কাক যেন মল ছিটিয়ে দিয়ে গেল। এমনই মনে হচ্ছে, রাগে ক্ষোভে সে কি করবে বুঝতে পারছে না। বোঝে না তো এখানে বসালে কেন ! কে বলেছিল ? এত প্রাণপাত করা, তবু বিশ্বাস নেই। আমি ছ্যাঁচড়া স্বভাবের। আমি কিছু জানি না। যা বলবে করব, তার এক চুল বাইরে যাব না। সে বিরক্ত মুখে বের হয়ে গেল। অতীশ লক্ষ্য করল না যাবার মুখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে কুম্ভ কী দেখছিল ! চোখ জ্বলছিল। কাউকে খুন করার আগে মানুষের চোখে এমন আগুন জ্বলে ওঠে।

ঘাড় গুঁজে আর কতক্ষণ থাকা যায়। কুম্ভ বের হয়ে গেলে অতীশ সোজা হয়ে বসল। ঘাড়ে হাত বুলোচ্ছে। পিঠটা কেমন ধরে গেছে। হরিচরণ গুচ্ছের বিল রেখে গেছে। তার সই। পে-বিলের কতটা হল, কে জানে ! ব্যাংক ব্যালেন্স দেখল। মাসের পয়লা তারিখ যত এগিয়ে আসে তত যেন এক জুজু তাকে তাড়া করতে থাকে। কোন্ দিকে সামলাবে। রাতে সে দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারে না। টাকা সংগ্রহের জন্য তখন তার কুম্ভকে সঙ্গে নিয়ে ছোটা-ছুটি। বার্নিশ, রঙ, টিন, লিথো, ডাইস এ সব মজুদ না থাকলে চলে না। সানরাইজ বার বার লোক পাঠাচ্ছে। এক গাদা বিল বাকি—কোন দিন দুম করে বলে না বসে, এত বাকি রাখা যাবে না। অন্তত কিছু দিন— কিছুটা দিতে গেলেই কয়েক হাজার, মাইনের টাকায় টানাটানি, কী যে করবে !

এই অফিস ঘরটায় এসে বসলেই অতীশের মধ্যে কেমন আতঙ্ক জেগে ওঠে। কথা রাখতে পারে না। কথা না রাখতে পারলে অজস্র মিছে কথা বলতে হয়।

তাও সে পারে না। সাফ এক কথা, নেই। দেব কোত্থেকে ? কুম্ভ কাছে থাকলে রেগে যায়, নেই বললেন কেন, যদি লোকে টের পায় কারখানার অবস্থা ভাল না, তবে আর মাল দেবে ? ঘুরিয়ে বলতে হয়। বলবেন, আদায়পত্র হচ্ছে না। হলেই দেবেন। নেই বলবেন কেন !

আসলে তখন অতীশের ক্ষোভ বাড়ে। কেন যে মরতে এল এমন একটা কারখানায় ! সে আবার তার স্কুল-জীবনে ফিরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যেত। বার বারই ভাবে—কিন্তু পারে না। কলকাতা নামক এই মহানগরী তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। লেখা-লেখির সুবিধা। ফোনে সবাই তাকে হাতের কাছে পায়। কলকাতায় না থাকলে যোগাযোগ যেন সব তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেমন অসহায় চোখে চারপাশটা দেখে। জাহাজের সে ছোটবাবু, সে এক জীবন গেছে। ছোটবাবু এসে তখন মাথায় ভর করতে চায়। দিগন্ত প্রসারিত অসীম অনন্ত সমুদ্র। কাপ্তানের নির্দেশে বোটে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে আর বনি। বোটের পাল তোলা। কমপাশের কাঁটা নর্থ-ইস্ট-ইস্ট। দাঁড়ে হয় বনি, না হয় সে। ডাঙার সন্ধানে কাপ্তান স্যালি হিগিন্‌স শেষ আশ্রয় ভেবে তাদের ভাসিয়ে দিয়েছেন। ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। জাহাজ বিকল। হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত সমুদ্রে জাহাজীরা আগেই বোটে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। জাহাজে ছিল, সে, বনি, বুড়ো কাপ্তান আর সারেং। শেষ নির্দেশ এবার তোমাদের পালা। তিনি কী জানতেন, সমুদ্র তাদের আজ হোক কাল হোক গ্রাস করবে। একমাত্র শেষ অবলম্বন বনির মৃত্যুদৃশ্য চোখের ওপর দেখতে হবে ভেবেই বোটে কাপ্তান তাদের ডাঙার সন্ধানে যাবার জন্য পাঠিয়ে কি জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন ! নামার আগে, ফল্কার এক অদৃশ্য গহ্বরে নামিয়ে প্রায় কাপালিকের মতো কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন ! সব কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয়। যেন অন্য জন্মের কথা। সঙ্গে বাইবেল এবং দুটো ক্রুসও দিয়েছিলেন তিনি।

এই কারখানায় ঢুকলেও তার মনে হয় সেই এক অজানা সমুদ্রে সে ভাসমান। একই বোট, দড়িদড়া, পাল, শুধু বোটে এখন বনি নেই—আছে নির্মলা, টুটুল মিণ্টু। আগের বার সে শুধু বনিকে ডাঙায় পৌঁছে দেবার জন্য অকূল সমুদ্রে যাত্রা করেছিল, এবারে সে নির্মলা টুটুল এবং মিণ্টুকে ডাঙায় পৌঁছে দেবার জন্য যাত্রা শুরু করেছে। কে-জানে মাঝপথে তার বোট সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে কি না। সে চোখের সামনে কোন কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছে না। সেই এক অসহায় চোখ, মাথার মধ্যে অজস্র মরীচিকা ভেসে বেড়ায়। এখানেও আর্চির মতো তার শত্রুপক্ষ কুম্ভ।

এক-এক সময় মনে হয় বনি এবং সে যাত্রা করেছিল নিরুদ্দেশে, তার দিনলিপি লিখে রাখলে কেমন হয়। নতুন একটা সাপ্তাহিক বার বার তাগাদা দিচ্ছে; এবারে কিছু ধারাবাহিক শুরু করুন। আপনি যা লিখবেন তাই ছাপব। এই একটা জায়গায় তার খুঁটি এখনও শক্ত আছে। রাত জেগে লিখতে বসলে, কেমন এক অলৌকিক প্রভায় সে ভেসে যেতে পারে। জীবনের সব কিছু অতি তুচ্ছ মনে হয়। মনে হয়, মানুষের জীবনটাই এক অলৌকিক জলযান। সে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করেছে। সে জানে না, কাল কি হবে, জানে না, সে কোথায় যাচ্ছে, জানে না, এই অলৌকিক যাত্রার কী উদ্দেশ্য। কে সে ? কোন অমোঘ নিয়তি তাকে বধ্যভূমির দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?

আবার ফোন ! কার ? সে বিরক্ত হয়ে ফোনটা ধরতেই টের পেল পিয়ারিলালের গলা। সে চমকে উঠল।

—বাবুজী !

—হ্যাঁ।

—রাম রাম।

অতীশের মনে হল সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছে। কথা বলতে পারছে না।

—বাবুজী ! বাবুজী !

সে জেগে ওঠার মতো বলল, বলিয়ে।

—তবিয়ত ঠিক নেই ?

—না আছে।

—কুম্ভ বাবুকা সাথ বাতচিত থা। উনকো দিজিয়ে না।

আর তখনই মনে হল, চারু। সেই শ্যামলা মেয়ে, সে তো তার খোঁজে যাবে বলে আকুল হয়ে উঠেছিল। একই ট্রেনে, একই কামরায় !

অতীশ বলল, শেঠজী চারু তো দু স্টেশন আগে নেমে গেল। ও ভাল আছে ?

—চারু ! ও কোন্ হ্যায় ?

—আপকা ভাইজি।

—নেই। চারু হামার কেউ হয় না।

—ঠিক বলছেন ! আপনি স্টেশনে তুলে দিলেন। রাতের ট্রেন। ভুলে গেলেন ?

—সাচ বাত বাবুজী ! এ তো ভারি গড়বড়কা বাত আছে !

অতীশ আবার কেমন তলিয়ে যাচ্ছিল। সে তো ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত চারু বলে কেউ আছে। তবে কী ঘোরে পড়ে এটা হয়েছে। হরমোন ডিজব্যালেন্স। তার হাত-পা কেমন কেঁপে উঠল। চিৎকার করে বলল, না, না, আপ ঠিক বাত বলছেন না। চারু বলে কেউ আছে। সে কোথাও আছে। তাকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। ওর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

খালি কামরায় চারু আর আমি, চারু আমাকে না বলে নেমে গেছে।

এত জোরে চিৎকার করে উঠেছে যে, কুম্ভবাবু হরিচরণ পর্যন্ত ছুটে ভেতরে ঢুকেছে। ম্যানেজারবাবুর আবার কিছু হয়নি তো! ওদের দেখেই বলল, চারু বলে কেউ নেই কুম্ভবাবু। পিয়ারিলাল নিজেই বলল, কেউ নেই। চারু তার কেউ হয় না। আপনি কথা বলুন।

কুম্ভ বলল, দিন। তারপর ফোন ছেড়ে দিয়ে অতীশ বড় কাতর গলায় বলল, সুধীর এক গ্লাস জল খাওয়াবি।

কুম্ভ কেমন শাসনের গলায়, অতীশকে বলল, আপনার যে কী হয় বুঝি না দাদা! সে ফোনে বলল, পিয়ারিলাল ক্যা বাত! তারপর সে ফোনের মুখ চেপে বলল, কেউ তো আপনাকে ফোন করেনি। ও পারতো ফাঁকা কার সঙ্গে কথা বলছিলেন! দেখুন না।

অতীশ এমন চোখে তাকিয়ে আছে যে দেখলে ভয় হয়। চোখ ঘোলা, মাথায় এখন বাবুটির সব উধাও! বাবুটি ফোন ধরতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।

অতীশ আর পারল না। পিয়ারি নিজে কথা বলেছে, আর কুম্ভবাবু বলছে, কেউ কথা বলছে না। ফোনটা ধরতেও তার ভয় হচ্ছে। সত্যি যদি কেউ কথা না বলে, তবে সে কে, কে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা কয়ে ওঠে। এক সময় ছিল আর্চি, এখন কী তবে অদৃশ্যলোক থেকে পিয়ারিলালের গলায় কেউ কথা বলে। সেই প্রেতাত্মা কি পিয়ারিলালের গলায় তার সঙ্গে কথা বলেছিল। মিণ্টু টুটুল ভাল আছে তো। বিশাল এলাকা জুড়ে রাজবাড়ি, মাঠ, পুকুর, মেসবাড়ি, বাবুপাড়া, বাবুর্চিপাড়া গোল-ঘর, ভুট্টার জমি, সব মিলে এক অন্য অরণ্য, সেই অরণ্যে টুটুল মিণ্টু নির্মলা যদি হারিয়ে যায়! আর্চির প্রেতাত্মা প্রলোভনে ফেলে দিতেই পারে। ছোট্ট টুটুল, মিণ্টু পরী থাকে রাজবাড়িতে শুনেছে। দুম্বার সিং বলেছে, কুয়াশার জালে পরীরা আটকে যায়। দুম্বার সিং বলেছে, টুটুলকে ছোট্ট পরী ধরে দেবে। পরীর খোঁজে টুটুল যদি একা বের হয়ে যায় এবং পুকুরের জলে টুপ করে ডুবে যায় —যেভাবে আর্চি পিয়ারিলালের গলা নকল করে কথা বলল, তাতে করে সে দুম্বার সিং সেজে, টুটুল মিণ্টুকে পরীর লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাবে না কে বলতে পারে। তারপর পুকুরে ডুবিয়ে যদি মেরে ফেলে বলে, ছোটবাবু, প্রতিশোধ, আমি বনিকে রেপ করেছি, তুমি ট্রেনে চারুকে কী করেছ! তোমার তো নির্মলা আছে, তবু কেন চারুকে তুমি……

অতীশ কেমন সত্যি ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। তারই সামনে দাঁড়িয়ে কুম্ভ ফোনে পিয়ারিলালের সঙ্গে সংকেতে কথা বলছে।

অতীশ ভিতরে প্রায় পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, আমি যাচ্ছি কুম্ভবাবু। সুধীরকে বলল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দে।

সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে, না না, আমি চারুকে রেপ করিনি। চারু আমাকে প্রলোভনে ফেলে দিয়েছিল। চারু…চারু…

আর্চির সেই তীক্ষ্ণ হাসি, বনি আমাকেও প্রলোভনে ফেলে দিয়েছিল। কেবিনে ঢুকে গেছিলাম। তারপর সমুদ্রে থাকলে যা হয়, অমানুষ, এক নারী শুধু জাহাজে, বালিকা যুবতী হয়ে উঠছে, তুমি জানতে, সে বালিকা, আর আমি, আর সবাই জানত, কাপ্তানের ছেলে জ্যাক। পুরুষের পোশাকে বনি জ্যাক সেজে সবাইকে প্রতারণা করেছে।

—না না জ্যাক প্রতারণা করেনি!

—করেছে। মেয়ে পুরুষের বেশে থাকলে প্রতারণা হয় না!

—না আর্চি, দোহাই তোমার, কেবিনে ঢুকে তুমি কেন তাকে রেপ করতে গেলে! কেন কেন! মাথা আমার ঠিক ছিল না। আমি বালিশে তোমার মুখ চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কেউ জানত না। কেবল তার সাক্ষী আমি আর বনি। ঝড়ের সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। তারপর দেখি না আরও একজন টের পেয়ে গেছেন। তিনি কাপ্তান। শুধু বলছেন, ছোটবাবু, ইউ স্যাল হ্যাভ টু সাফার। ম্যান ক্যারিং দ্য ক্রস। কেন কথাটা বলেছিলেন বুঝতে পারছি। আর্চি তোমার যেশাসকে মনে পড়ে, তিনি ক্রস বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বধ্যভূমিতে। কেন সেটা? ওটা আর কিছু নয় আর্চি, ওটা হল সিম্বল। মানুষ জন্মেই পিঠে ক্রস বহন করে বধ্যভূমির দিকে এগোয়। ইট ইস দ্য সিম্বল, ইট ইস দ্য সাফারিং অফ হিউম্যান ম্যানকাইণ্ড। আমি চারুকে না হলে খালি কামরায় পাগলের মতো জড়িয়ে ধরবো কেন!

আর তখনই সেই অদৃশ্যলোক থেকে হাহাকার হাসি।

অতীশ ট্যাকসির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। —ওরা কেমন আছে কে জানে!

তখন ফোনে কুম্ভ বলল, তুমি বলেছ, চারু বলে কেউ নেই!

—হ্যাঁ বলেছি।

—খুব ভাল করেছ। তোমার দুনম্বরী মাল মিলে যাবে। চারুই পারবে সব। যে দেবতা যাতে তুষ্ট। টাকা দিয়ে পারলে না, তাই চারুকে দিতে বললাম। ও কী বলে!

—কিছু বলছে না!

—ট্রেনে কিছু হয়নি!

—কিছু বলছে না!

—আরে বেশ্যা মেয়েছেলের এত দেমাক কিসের। খেতে দাও পরতে দাও, পাউডার কারখানার মেয়েদের দিদিমণি করে রেখেছে, এত সুখ, তবু কিছু বলছে না!

—না।

হঠাৎ কুম্ভ কেমন মুখ গোমড়া করে ফেলল, সাবধান, চারু যেন সব ফাঁস করে না দেয়। আমরাই যে চারুকে বাবুটির সঙ্গে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিলাম, কেউ যেন জানতে না পারে। ম্যানেজার বাবু তো চারু চারু বলে পাগল। পিয়ারি একটা কথা মনে রাখবে, রাজা কিংবা বৌ-রাণীর কানে কথা উঠলে আমার চাকরি যাবে, তোমার ব্যবসা লাটে উঠবে।

—উঠবে না বাবুজী। হাম তো হ্যায়।

—এখন একটাই কাজ বুঝলে পিয়ারি। চারু চারু করে বাবুটিকে পাগল করে ফেলা। ফোনে চারু যেন কোনদিন রা না করে। তুমিই বল, সেই কবে থেকে কারখানার জন্য এত করছি, কোথাকার একটা আধ পাগলা লোক উড়ে এসে জুড়ে বসল। সয়? তুমিই বল। বেটাকে পাগল না বানাতে পারলে আমার নিস্তার নেই। ঈশ্বর মানে না, ধর্ম নেই, বামুনের ছেলে, গলায় পৈতা রাখে না, অধর্ম হয় না! বেটা নিজের ঘায়ের জ্বালাতেই দেখবে একদিন পাগল বনে যাবে। রাজবাড়িতে ঢুকলেই নাকি পচা টাকার গন্ধ পায়!

—পচা টাকা!

—হ্যাঁ। তুমি এলেও পায়। তখন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকে।

—বহুত মুসিব্বত কী বাত।

—হ্যাঁ। মুসিব্বত যারে কয়। চারপাশ থেকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছি। যাবেটা কোথায়? আমার পিতৃদেব আছেন, রাজার দু নম্বরী টাকার হিসেব রাখে। আমাকে এ জন্য ঘাঁটায় না। কিন্তু বুঝলে—

—কিন্তুটা কী বাবু?

—আরে বৌ-রাণীর পেয়ারের লোক অতীশবাবু। চেহারাখানা সাধু-সন্তের মতো। দেখছ না। কী বড় বড় চোখ আর কী উঁচু, লম্বা, কি গায়ের রঙ। বৌ-রাণী পর্যন্ত ক্ষেপে আছে। কব্জা করার তালে আছে। খুব সাবধানে এগোতে হবে বুঝলে? বলেই পেছনের দিকে তাকাল। —না কেউ নেই। কারখানা ছুটি হয়ে গেছে। সে একা।

—রাতে কি হয়েছে জান?

—না বাবুজী।

—অতীশবাবু দেশে ছুটিতে গেছিল। অতীশবাবুর কোয়াটার, বৌ-রাণীর অন্দর মহলের ঠিক পেছনে বুঝলে! আচ্ছা তবে শোন, বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে অতীশবাবু দেশে গেছিল ছুটিতে। কিছু বুঝলে? তবে শোন্, বৌ-রাণী কোয়াটার রঙ করে, ঘরে সব দামী আসবাবপত্রে সাজিয়ে রেখেছিল গোপনে, অতীশবাবু এলেই বেশ জমে যাবে। রাজা মানে কুমার বাহাদুর বাইরে। তিন চার মাস আসছেন না বুঝলে? শরীর মানবে কেন! আর

এমন দশাসই চেহারা, বৌ-রাণীও কম পাগল নয় বুঝলে। কী বুঝলে!

পিয়ারি শুধু বলল, সব বুঝি বাবু, নালে চারুকে তুলে দিতে যাব কেন ট্রেনে!

আর তখন অতীশ রাজবাড়ির সদর গেট পার হয়ে যাচ্ছে। রোজ এ সময় বাবার অপেক্ষায় মিণ্টু টুটুল সামনের বাগানটায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর চিৎকার—বাবা আসছে। অতীশ দেখল, ওরা নেই।

মনটা তার খচ করে উঠল।

এখানে নাও থাকতে পারে। হয়ত নতুন বাড়ির পেছনে বাঁক নেবার মুখে ওরা দুজনে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাবার অপেক্ষায়।

না,—তাও নেই। অতীশের বুকটা ধক করে উঠল।

জানালায় নির্মলা, মিণ্টু টুটুল বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। তার ফেরার সময় হলে, গোটা সংসারটাই তার অপেক্ষায় থাকে। নির্মলা হয়তো দুজনকেই আটকে রেখেছে। তিনজনে হয়তো জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সে কখন ফিরিবে।

জানালায়ও নেই।

ভিতরে কী এক দুর্যোগের আশঙ্কায় সে ছুটে সিঁড়িতে উঠে চিৎকার করে উঠল, নির্মলা!

সাড়া নেই।

আর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল মিণ্টু দরজার ভিতরের দিকে; দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—কী হল কাঁদছিস কেন! তোর মা কোথায়?

—মা রা করছে না।

সঙ্গে সঙ্গে কী যে হয়ে যায়—কেন যে তার পা দুটো কাঁপতে থাকে—শরীর অবশ হয়ে আসে—সে যেন তবু সব জোর সংগ্রহ করে দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখল, নির্মলা ছটফট করছে। রক্তে ভেসে গেছে বিছানা। টুটুল বোকার মতো মার বুকে মাথা খুঁটে বলছে, তুমি এমন করছো কেন মা! তুমি কথা বলছ না কেন?

মাত্র কয়েক দণ্ড। কখন এমন হল! কেউ নেই। বড় অসহায় সে। তার মাথায় বিদ্যুৎ বেগে কী যেন এক প্রলয় নেমে আসার চেষ্টা করছে। আর তখনই সে দেখে ফেলল, কুলুঙ্গির সেই দেবী মূর্তি ধীরে ধীরে বীন হয়ে যাচ্ছে। গোটা দেয়াল জুড়ে সেই কুলুঙ্গি অতিকায়, মানুষের অবয়বে সে হাজির—বলছে, আমি আছি ছোট-বাবু। কোন ভয় নেই। আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—ভিক্টরি, ডিফিট, পেইন, বার্থ, ডেথ—লাইফ ইজ অল অফ দিজ। তুমি ঘাবড়ে যেও না ছোটবাবু। তোমার মিণ্টু টুটুল আছে,

তোমার কিছু হলে ওরা যে একা হয়ে যাবে। তোমরা নির্মলা ভাল হয়ে উঠবে।

সঙ্গে সঙ্গে অতীশ কেমন স্বাভাবিক হয়ে যায়—কুলুঙ্গিতে দেবীমূর্তি, সে নির্মলার মাথায় হাত রেখে বলল, আমি যাচ্ছি, ডাক্তার ডাকতে। ভয় নেই। আমি তো আছি। এই মিণ্টু এদিকে আয়। মার কাছে থাক। কোথাও যাবে না। বলে সে প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সেই ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা দুইই তাড়া করছে এখন। কখনও ভয়ের মধ্যে কখনও অভয়ের মধ্যে। বনি—এভাবে আসে কেন! ঈশ্বর তাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। না, মাথাটা তার গোলমাল করে। সে তো জাহাজের মাস্তুল থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় একবার প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। মগজের শিরা-উপশিরায় কী কোনো পালছেঁড়া ভাঙা জাইজের মতো গণ্ডগোলে দোদুল্যমান! মানসিক আঘাতের মধ্যে তা নড়ে ওঠে। সবটাই কী তার মগজের বুজরুকি!

আর তখন দূরবর্তী মেঘ কিংবা আরো সুদূরে কে হেঁকে যায়।—অফ অল দি বিস্টস্ হি ইজ দ্য প্রাউডেস্ট—মনার্ক অফ অল দ্যাট হি সিজ। ছোট-বাবু ডোণ্ট ইগনোর হিম।

॥ পাঁচ ॥

নার্স বলল, এখন ঘুমোচ্ছে। ডাকবেন না।

অতীশ খুব সতর্ক পায়ে কেবিনের ভেতর ঢুকে গেল। হাসপাতালে ঢোকার মুখেই সে কেমন পায়ের জোর হারিয়ে ফেলে। অবশ লাগে। কী গিয়ে দেখবে জানে না। সে সবার আগে এই ফিমেল ওয়ার্ডের নিচে এসে বেঞ্চিতে বসে থাকে। চারটে না বাজলে ভিতরে ঢোকার হুকুম নেই। বার বার এখন ঘড়ি দেখা সার। সময় এত দীর্ঘ হয় সে আগে কখনও টের পায়নি।

সে সবার আগে আসে, সবার শেষে যায়।

কেবিনে মৃদু আলো জ্বালা। সাদা বিছানায় নির্মলার ফ্যাকাসে মুখ। আর রক্ত দেওয়া হচ্ছে না। স্যালাইন বন্ধ। নাকে অক্সিজেনের নলও লাগানো নেই। সাদা চাদরে শরীর ঢাকা।

করিডোরে কার পায়ের শব্দ পেল। কেউ আসছে। ও-পাশের কেবিনে যাচ্ছে তারা। সে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের চেয়ারটায় সে বসতে পারে। কিন্তু বসলে নির্মলার মুখ ভাল করে দেখা যায় না। একবার ইচ্ছে হল

কপালে হাত রাখে। একবার মনে হল ঘুমোচ্ছে, আবার কী ভেবে নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। হাসপাতালে ঢুকলেই সে কেমন একটা অচেনা গন্ধ পায়। গন্ধটা কেবিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে।

সে অপেক্ষা করে থাকে—নির্মলা চোখ মেলে তাকাবে। এ ক'দিন নির্মলার ঘোরের মধ্যে কেটেছে। সকালে নির্মলার মেজদি ফোনে জানিয়ে-ছিলেন, ঘোর কেটে গেছে। চিনতে পারছে। নির্মলা চোখ মেলে তাকালে তাকে চিনতে পারবে এই আশাতেও মাথার কাছ থেকে নড়তে পারছে না। তাকে দেখতে পেলে নির্মলা সাহস পাবে। টুটুল মিণ্টুকে দেখতে চাইতে পারে। কিন্তু মেজদি বারণ করে দিয়েছেন ওদের সঙ্গে আনবে না। আসলে অতীশ টের পায়, টুটুল মিণ্টু এলে শেষে হয়ত যেতে চাইবে না। বলবে মাকে নিয়ে চল। আমাদের মাকে এখানে এনে ফেলে রেখেছ কেন!

নির্মলার মেজদি এ-ওয়ার্ডেরই হাউজ-স্টাফ ছিলেন। নার্স আয়া সবাই তাঁকে চেনে। তিনিই শেষপর্যন্ত সব করেছেন। মেজদি না থাকলে কী যে হত! এমন নির্বান্ধব সে এর আগে কখনও টের পায়নি।

বাবা কী চিঠিটা পাননি!

বাবাকে কবে চিঠি লিখেছে সে যেন এখন তাও মনে করতে পারছে না। নির্মলা অসুস্থ হবার পর, না আগে। পরে হলে নিশ্চয়ই সে নির্মলার অসুখের খবর দিয়েছে। শহরে তাকে নিয়ে আসার পরই যেন বাবা জানতেন, এটা হবে। এটা শহরের অসুখ। অভিমানবশে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে যে ভাল করেনি, এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। শহর মানেই বাবার কাছে পাপের জায়গা—এখানকার হাওয়া বাতাস নির্মল নয়। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তা ঢুকবেই, সে তুমি যত বড় যোগী পুরুষই হও না। সে যে বিশ্বাস নিয়ে শহরে এসে রাজবাড়িতে উঠেছিল, এখন দেখছে সেখানে যেমন ফুলফলের বাগিচা রয়েছে তেমনি নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নোংরা জল। নোংরা জল না মাড়িয়ে শহরে ঢোকাকা যায় না।

অতীশ দাঁড়িয়ে আছে।

নির্মলার চোখ বোজা। রোগা, ক্ষীণকায়। অথচ কী সুন্দর অপাপবিদ্ধ যুবতীকে সে ভালবেসেছিল।

তার চোখ ফেটে জল আসছে।

বাবাকে কবে চিঠি দিয়েছি, মনে করতে পারছি না। সে কলকাতা নামক এই নগরীতে এসে সত্যি ভারি বিপাকে পড়ে গেছে। তার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল তাও আগে এমনভাবে টের পায়নি। সে ঘোরে পড়ে যায় ঠিক, পচা টাকার গন্ধ পায়, আর্চির অশুভ প্রভাব তাকে অনুসরণ করছে সব টের পেলেও স্মৃতি এত দুর্বল কখনই বোধ করেনি। মাকে আসতে লিখেছে এটা সে মনে

করতে পারছে। অফিসে চলে গেলে রাজবাড়ির বিশাল অন্দরমহলের দিকটা ভারি জনহীন থাকে। টুটুল মিণ্টুকে একা ফেলে দুদিন অফিস করা গেলেও রোজ অফিস করা যাবে না। মা কিংবা বাবাকে সে কখনও এত কাছে পাবার যেন আগ্রহ বোধ করেনি। অথচ না চিঠির জবাব না কেউ এসে হাজির হচ্ছে। সে টাকা পাঠালে বাবার সংসার সচ্ছল, এই প্রথম সে বাবার সংসার কথাটা ভাবল। এসব কেন মনে হয়! তবে কী বাবাই ঠিক, শহরে গেলে মানুষের শেকড় আলগা হয়ে যায়। সে কি বাবা মার জীবন থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে! কিংবা বাবা মা কি তার জন্য, টুটুল মিণ্টুর জন্য আগের মতো আশংকায় থাকে না। দু-আড়াই বছরের শহরবাস তাকে এমন একলা করে দেবে জীবনেও ভাবতে পারেনি।

আর তখনই মেজদি সতর্ক পায়ে ঢুকে গেলেন।

সে চোখ না তুলেও বুঝতে পারে মেজদি। তাঁর শরীরে কেমন বাসি জুঁই ফুলের ঘ্রাণ। কি একটা সাবান ব্যবহার করেন তিনি, বিদেশী আতর, যা সে নির্মলাদের বাড়ি গেলেই টের পায়। আশ্চর্য সুঘ্রাণ। মেজদি যে একা আসবেন না, সঙ্গে নির্মলার বাবা মা, আত্মীয়স্বজনরা একে একে আসবেন তাও সে জানে। তার দিকের আত্মীয়স্বজনও কিছু কিছু এই শহরে আছে—তারা ঠিকই খবর পেয়েছে, অতীশের বৌ হাসপাতালে—অথচ এই পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একবারও কেউ দেখে যায়নি।

মেজদির সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা মা ছোট ভাই, কাকা কাকীমা, নির্মলাদের বাপের বাড়ির দিকের সব আত্মীয়স্বজন এই পাঁচ সাত দিন ঘুরে গেছে। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আজ মেজদি অনেকটা যেন হাল্কা। তাকে দেখেই অতি সন্তর্পণে বললেন, কখন এলে?

সে লজ্জায় বলতে পারে না সেই কখন! হাসপাতালে দেখছি ঘড়ির কাঁটা একদম নড়ে না। শুধু বলল, এই এলাম।

মেজদি নির্মলার পালস্ দেখছিলেন। হাতটা খুব আস্তে নামিয়ে রাখার সময়ই নির্মলা চোখ মেলে তাকাল। যেন অন্য এক গ্রহ থেকে তাদের দেখছে। ঠোঁটের এক কোণে সামান্য সলজ্জ হাসি। অতীশের বুকটা গুরগুর করে উঠল। অতীশকে দেখল, আত্মীয়স্বজনদের দেখল। তারপরও যেন সে আর কাউকে দেখার জন্য চোখে আকুতি ফুটিয়ে তুলল। কথা বলার চেষ্টা করল। পারল না। নির্মলার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। সে যাদের দেখতে চায়, তার নাড়ি ছিঁড়ে যারা এই পৃথিবীতে বড় হয়ে উঠছে তারাই নেই। বিষাদে মুখ ভরে গেল। মেজদি নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে আসব। তুই ভাল হয়ে গেছিস। কাঁদছিস কেন? বলে আঁচল দিয়ে ছোট বোনের দু-চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

অতীশ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিল না। সে ধীরে ধীরে বের হয়ে দোতলার করিডরে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংযত করল। আর তখনই দেখল কিছু লোক নিচে, খাটিয়া, ফুল—কেউ আজ আবার রওনা হয়েছে।

হাসপাতালের এই দৃশ্যটা তাকে কাবু করে ফেলে। যেন এটা তার জন্যও অপেক্ষা করে আছে—হাসপাতালে ঢোকার মুখে এমন মনে হত তার। টুটুল মিণ্টুর হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে—পাথর—টুটুল মিণ্টুর কেউ থাকল না এমন এক আশংকায় সারা মুখে এক বিষাদ ছড়িয়ে পড়ত।

আজও দেখল সেই খাটিয়া, ফুল এবং শোকসন্তপ্ত কিছু মানুষ।

আর এ-সময় সহসা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল, কোনো সুদূরের এক দৃশ্য।—না না ছোটবাবু পাগলামি করবে না। তুমি সমুদ্রে সাঁতার কাটছ কেন। বোট চলছে। উঠে এস। উঠে এস।

—আসলে সেই নিরুপায় জীবনে অতীশের মনে হয়, হাহাকার সমুদ্রের মধ্যে বোট স্থির অবিচল। নড়বে না। আর্চির প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাব তাকে ঘিরে ধরেছে। সে চিৎকার করে উঠেছিল, সাঁতার কেটে আমি সমুদ্র পার হয়ে যাব। বোট টেনে নিয়ে যাব। কেউ আটকাতে পারবে না।

আর সব অতিকায় হাঙর যেন দূরে গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে আসছে। বনি দ্রুত হাত ধরে ওকে তুলে আনবার সময় বলল, এখনও আমাদের বেঁচে থাকার মতো খাবার আছে জল আছে। দেখ এলবা উড়ছে ডাঙার সন্ধানে। সে ডাঙার খোঁজ নিয়ে আসবেই।

অতীশ দেখল, দূরে সেই প্রিয়তম পাখি। সে সেই কবে থেকে সঙ্গ নিয়েছিল সমুদ্রে। সে উড়ে চলে যেতে পারে—কিন্তু যাচ্ছে না। বনি বোটের হাল কম্পাস রিডিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বসে আছে।

আর আশ্চর্য পাখিটা এক সময় দিগন্তে হারিয়ে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না। এ ক'দিন বোটে তারা তিনটি প্রাণী ছিল, এলবা উড়ে গেছে, কিন্তু কোনোদিন দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়নি! সমুদ্রের গভীর নীল জল, অনন্ত আকাশে রাতের নক্ষত্রমালা, পাখিটার প্রয়োজনে দুটো একটা উড়ুক্কু মাছ ছোঁ মেরে তুলে আনা, এ-সবই ছিল দৈনন্দিন দেখার মতো ঘটনা। রাতে বনি ছইয়ের নিচে বসে তাকে বাইবেল পড়ে শোনাতো। ভেবে দেখ তাঁর কী অনন্ত মহিমা—ক্যান ইউ সাউট টু দ্য ক্লাউডস অ্যাণ্ড মেক ইট রেইন? ক্যান ইউ মেক লাইটনিং এপিয়ার অ্যাণ্ড কজ ইট টু স্ট্রাইক অ্যাজ ইউ ডাইরেক্ট ইট? হু ডিক্রিড দ্য বাউণ্ডারিজ অফ দ্য সিজ। হ্যাভ ইউ এভার ওয়ানস কমাণ্ডেড দ্য মর্নিং টু এপিয়ার অ্যাণ্ড কজড দ্য ডন টু রাইজ ইন দ্য ইস্ট! দেন ছোটবাবু, সেই অপার মহিমার উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। তুমি শান্ত হও।

—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস! এদিকে আয়। বৌ-রাণী! অমলা! অমলা আজ তবে এসেছে। নিজেই। সে বলল, ভিতরে যাও। আমি যাচ্ছি।

আর তখনই দেখল, টুটুল মিণ্টু করিডর ধরে ছুটে আসছে।

অমলা বলল, নিয়ে এসেছি। জানালায় উঠে ভাই বোন বসেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, তোদের মা কেমন আছে। বাবা নিয়ে যায়নি?

অতীশ অমলাকে দেখছিল। দেখে মনেই হবে না, এই অমলা রাজবাড়ির অন্দরে বিশাল সব ঘরের মধ্যে একা রাতে পায়চারি করে, মনেই হবে না, মানসদাকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে শাসায়, তার উপরয়ালারা এই অমলার ভয়ে তটস্থ থাকে—দেখলেই দূর থেকে কুর্নিশ করে—এখনও যা আছে রাজার, স্থাবর অবস্থাবর, কলকারখানা, মাইনস, সব মিলে এলাহি ব্যাপার। জমিদারি গেলেও প্রভাব প্রতিপত্তির খামতি নেই।

অতীশ শুধু বলল, তুমি ওকে দেখতে আসবে ভাবতে পারিনি।

—কী করব বল! খারাপ লাগল। টুটুল কেবল বলছে, জান আমার মা না হাসপাতালে! মিণ্টু ভ্যাক করে কেঁদে বলল, বাবা, মাকে নিয়ে আসছে না। আমাদের মার কাছে নিয়ে যাচ্ছে না। দুমবারকে বললাম গাড়ি বের করতে। নিজেই নিয়ে এসেছি।

—একা!

—কী হয়েছে?

কী হয়েছে সে বলতে পারে না। রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ওরফে মহারাজ-কুমারের স্ত্রী এই বৌ-রাণী, তার পূর্বপরিচিত বালিকা অমলাকে সে যেদিন আবিষ্কার করেছিল, সেদিনই তার মনে হয়েছে জীবনে তার অনেক দুঃখ আছে। সে ভয় পায়, ভয় অমলার সাদা মার্বেল পাথরের মতো মজবুত যৌবন, দীর্ঘাঙ্গী এবং হেঁটে গেলে মনে হয় প্রাচীন মিশরের সেই ক্লিওপেট্রা। হাঁটছে —অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর বুকে হেঁটে যাচ্ছে—তার সেই কুটিল সৌন্দর্যের মোহে সব সিজার নতজানু, আজ তার কেন জানি এই রহস্যময়ী নারীর এই আবির্ভাব তেমন তাকে হতবাক করল না। সামান্য একজন আমলার স্ত্রীকে নিজেই দেখতে এসেছে, রাজবাড়ির ইতিহাসে এটা আর কখনও হয়েছে কিনা জানে না। রাজার গুরুত্বপূর্ণ কাজে যারা থাকে, রাজবাড়ির ভেতরেই তাদের বাসাবাড়ি। বাবু পাড়ায় কোনো কোয়ার্টার খালি না থাকায়, রাজার অন্দরে আলগা একটা এলাকা তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অমলা আসতেই পারে।

বৌ-রাণী বলল, আয়।

টুটুল মিণ্টু এখন মাসিদের কোলে। নির্মলার আত্মীয়রা অমলাকে চিনতে পারছে না। সে ওদের সঙ্গে অমলার পরিচয় করিয়ে দিল।

অমলা শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। নির্মলাকে দেখছে। শিয়রের দিক থেকে সরে এসে নির্মলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু হয়নি। ভাল হয়ে যাবে।

নির্মলা হাত তোলার চেষ্টা করল। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। নির্মলাও ভাবতে পারেনি বৌ-রাণী তাকে দেখতে আসতে পারে! মাথার উপরে এই মহিলা আছেন বলেই অতীশ এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। যা একখানা মানুষ—কেবল নিরন্তর আশংকায় ভোগে। নির্মলা একদিন তাকে বলেছিল, কী বল তো, তুমি কেমন, জান বৌ-রাণী আজ নিজেই এসেছিল। কী বলেছে জান! বলেছে, উনি নাকি তোমার পিসি হন। তুমি নাকি কিছুতেই পিসি ডাক না। তুমি নাকি মানুষ না, তুমি নাকি অপ-দেবতা। অতীশ সেদিন বড় বিপাকে পড়ে গিয়েছিল, বাবা জ্যাঠা যে অমলাদের বাড়িতে আমলা ছিল! বাবা জ্যাঠা যে জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন দেশ ভাগের আগে—নির্মলা তা জানত, কিন্তু জানত না, অমলা সেই জমিদার বাড়ির মেজবাবুর মেয়ে। জানত না, অমলা আর সে সমবয়সী না হলেও দু এক বছরের ছোট বড়। জমিদারের নাতনী অমলা, জমিদারের ছেলেরা বাবা জ্যাঠাকে কাকা বলে ডাকত, সুতরাং জমিদার গিন্নিই বলেছিল, সোনা, তুই অমলাকে পিসি বলে ডাকবি। অমলা তোর চেয়ে বড়। কত বড় তাও যেন বলেছিল—এখন মনে করতে পারে না। তখন সে ছিল সোনা, আর বৌ-রাণী ছিল অমলা—এবং সেই আধিভৌতিক অন্ধকারে, অমলা তাকে যেখানে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, শ্যাওলা পিচ্ছিল এক গভীরতা, কিংবা আশ্চর্য উষ্ণতার স্বাদ এই নারীই প্রথম সোনাকে দিয়েছিল—অমলার সঙ্গে দেখা হলে সেই দৃশ্যটাও মাঝে মাঝে তাকে তাড়া করে। নির্মলার কথায় সেদিন সে বলেছিল, আমার পিসি, সত্যি সাতজন্মের পিসি। তারপরই হেসে বলেছিল, শৈশব থেকে অমলা এক বিন্দু সরে আসতে পারেনি। সেই জেদ, ক্ষোভ অভিমান, হিংস্র স্বভাব কিছুই পাল্টায়নি তার। দু-বছরেই এটা আমি টের পেয়েছি নির্মলা। সে যেমন এখানে আমার আশ্রয়, সেই আবার এক দণ্ডে আমার মাথা নেবার হুকুম দেবার অধিকারী।—আর দরকার নেই। রাজবাড়ি ছেড়ে দিতে বল। এবং এমন হুকুম অনায়াসেই এই রাজবাড়ির দু একজন আমলার উপর জারি করে দিয়েছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ আসলে এই এস্টেটের ডামি। অমলাই সব। অমলার হাত মাথার উপর থাকলে সব কুকর্ম করেও পার পেয়ে যাবে। না থাকলে যত সাধুই হও, কেউ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

অতীশ তখন দেখছে, বৌ-রাণীর হাত নির্মলা চেপে ধরেছে। কিছু বলছে না। বৌ-রাণী নির্মলার হাতের উপর হাত রেখে মৃদুচাপ দিয়ে অভয় দিচ্ছে, ভাল হয়ে ওঠো। টুটুল মিণ্টুর জন্য ভাববে না। আমরা ত আছি।

টুটুল মিণ্টু কোলে থাকতে চাইছে না। মিণ্টু বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। সে বড় হয়ে গেছে নিজেই টের পায়। মাসিরা ধরে রাখতে পারছে না। সে মার কাছে আসতে চায় বোধহয়। দুজনেই ভারি ছটফট করছে।

কিন্তু অতীশ অবাক হয়ে গেল দেখে, মিণ্টু কোল থেকে নেমে মার কাছে গেল না। সে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার কাছে থাকতে বোধ-হয় তার ইচ্ছে হচ্ছে। কিংবা মার খুব অসুখ এটা সে বুঝতে পারে। মাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে, না এলে মা ভাল হবে না তাও বোধ হয় বুঝতে শিখেছে, কিংবা ভয়, এই বিশাল হাসপাতাল এলাকায়, তার বাবার কাছের কেউ নেই এটাও মনে হতে পারে তার। পেছন থেকে মিণ্টু তাকে জড়িয়ে ধরে কোমরে মুখ গুঁজে দিয়েছে।

অতীশের মনে হল, মিণ্টু যেন বলতে চায়, বাবা তুমি ঘাবড়ে যেও না। আমরা তো আছি।

না কি এই অবস্থায় বালিকা বাবার কাছে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবছে। এ-সবই জীবনে এক গভীর টানের সৃষ্টি করে। সে মিণ্টুকে জোর করে মায়ের কাছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, নির্মলা, টুটুল মিণ্টু এসেছে। এই দ্যাখ।

নির্মলা চোখ খুলে তাকাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন চোখে কেমন বেঁচে থাকার অনন্ত আগ্রহ জন্মে গেল। শিরা উপশিরায় সন্তানের জন্য যে অপার মায়া সেই প্রাণের উন্মেষ থেকে চলে আসছে, তার ঝাঁকুনি লাগল শরীরে। নির্মলা টুটুল মিণ্টুকে আদর করার জন্য হাত বাড়াল। হাত তুলতে কষ্ট। মিণ্টুকে বেডের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। টুটুলের হাত বাড়িয়ে দিল।—মা মা, দিদি আমি বাবা, দেখ আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি। টুটুল আর কারুর নাম বলল না। যেন আসলে এই তিনজনই নির্মলা ভাল হয়ে উঠবে আশায় সবচেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এতটুকুন ছেলেও টের পায় সব।

নির্মলার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। খুব আস্তে আস্তে বলল, তুমি ক'দিন ছুটি নাও। ওদের একা ফেলে অফিস যেও না।

অতীশ বলল, যাচ্ছি না। অযথা ভাববে না।

বৌ-রাণী বলল, আমি যাচ্ছি রে! নির্মলার দিকে তাকিয়ে ফের অভয় দিল, তুমি ভাল হয়ে গেছ। অযথা চিন্তা করবে না। আমরা ক'দিন বাদেই তোমাকে নিয়ে যেতে পারব। টুটুলের হাত ধরে তুমি ঘরে ঢুকে যেতে পারবে।

বৌ-রাণী চলে গেলে সে মেজদির দিকে তাকাল। যেন বৌ-রাণীকে তাদের খুব পছন্দ হয়নি। অতীশ উদ্বাস্তু যুবক, কলোনির ছেলে, সে এখন রাজবাড়ির এক কারখানার ম্যানেজার। মেজদি এবং নির্মলার মা বাবা রাজবাড়িতে এসেছে

সদরে ঢোকার মুখে দারোয়ান সাদেক আলি গেট খুলে দেবার আগে পরিচয় জেনেছে কার কাছ যাবে, সব বৃত্তান্ত জানার পর গেট খুলে দিয়েছে, এবং সে ম্যানেজারবাবুর আত্মীয় জেনে সেলাম দিয়েছে। নির্মলার বাবা ঘরে ঢুকেই বলেছিল, জমিদারি গেলেও দেখছি ঠাট বাট ঠিকই বজায় রেখেছে। অতীশ জানে নির্মলার বাবার পছন্দ নয়, ভাঙা একটা লঙ্ঝড়ে কারখানার ম্যানেজার হয়ে কলকাতায় অতীশ বসবাস করুক। হঠাৎ বিনা নোটিশেই প্রায় অতীশ এই চাকরিটা নিয়ে এখানে এসেছিল। নির্মলা লিখতে পারে, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি—কিন্তু অতীশ যতটা জানে, সে-চিঠির জবাব নির্মলা পায়নি। পেলেও গোপন করে গেছে। রাজবাড়িতে এসে সপ্তাহখানেক পার হবার পর নির্মলাই একদিন ফোন করতে বলেছিল, আমরা এসে গেছি। এই খবরটা দিতেও সংকোচ হচ্ছিল—কারণ এসে দেখতে পাবে, ঘরে কোন খাট আলমারি, বসার চেয়ার টেবিল কিচ্ছু নেই। যেন কোনো স্টেশনে এসে তারা উঠেছে। বাবা দাদারা নির্মলার এমন দুরবস্থায় প্রসন্ন হবে না। ফলে নির্মলার বাবা প্রথম যেদিন এলেন, একটাই প্রশ্ন, কত মাইনে দিচ্ছে!

সে মাইনের কথা বললে, নির্মলার বাবা গম্ভীর হয়ে গেছিলেন।

—এই মাইনেতে চলবে কী করে?

অতীশ মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল—সে বুঝতে পারে মাইনের অঙ্কটা খুবই কম, লুজিং কনসার্ন, মহারাজকুমার বলেছিলেন, কারখানার উন্নতি হলে মাইনে বাড়াবে—এত সব কিছুই না বলে শুধু বলেছে, চলে যাবে।

—আমি বুঝতে পারছি না, সে যাকগে, আমি আগামী রবিবার আসছি। তুমি বাড়ি থাকবে। তোমাকে নিয়ে বের হব।

নির্মলা এগিয়ে দিতে বাবার গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেছিল। অন্দরমহলে শুধু বৌ-রাণী কিংবা রাণীমা অথবা তাঁদের আত্মীয়স্বজনের গাড়িই ঢুকতে পারে। অন্য সব গাড়ি নতুন বাড়ির মহলে। গাড়ি রাজবাড়িতে ঢুকলেই দুম্বার সিং দৌড়ে যাবে। বাইরের গাড়ি পার্ক করার জায়গায় সে দাঁড়িয়ে যাবে। কার গাড়ি, রাজার দিকের হলে সেলাম ঠুকবে, অন্যের হলে হাতের ইশারায় গাড়ি থামিয়ে বলবে, বাবুজী, গাড়ি এখানে রাখুন। এই পর্যন্ত। নির্মলা বাবাকে এগিয়ে দিতে গেছে। মিণ্টু যায়নি। এটা সে বুঝেছে মিণ্টু যেন ছোট থেকেই টের পেয়ে গেছে বাবাকে মামার বাড়ির লোকেরা ঠিক পছন্দ করে না।

মিণ্টু মার সঙ্গে যায়নি। সে বাবার পাশে বসেছিল। নিচে মাদুর পাতা। টেবিল চেয়ারের দরকার আছে। লেখালেখিতে যে সামান্য আলগা টাকা আসে তাতে সে দু একমাস গেলে করে নিতে পারবে ভেবেছিল। নির্মলার মুখ গম্ভীর দেখলে সে কেমন অশান্ত হয়ে ওঠে। কী বলে গেল কে জানে!

মেয়েকে নিবুর্দ্ধিতার জন্য কোনো উপহাস করে গিয়ে থাকে যদি ! সে কেমন যেন সেদিন বড়ই অপরাধ করেছে এমন ভেবে বলেছিল, আমি বের হচ্ছি।

নির্মলা জানে কোথায় বের হবে। সে বলল, আজ নাই গেলে ! আসলে সময় পেলে কফি-হাউসে যাবার কেমন তাড়া বোধ করে অতীশ। সেখানে উঠতি লেখকেরা আড্ডা জমায়। তার নিজের লেখা দু-চারটে গল্প উপন্যাসের জন্য সে কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছে। সেখানে গেলেই সব অপমানের জ্বালা তার আর থাকে না। সাহস পায়। বন্ধু-বান্ধবদের অনেকের তার চেয়েও অসহায় অবস্থা। কিন্তু একটা জায়গায় তারা যেন ঈশ্বরের কাছাকাছি। সেখানে দু-দণ্ড বসলে এই অহংকার তাড়া করে।

নির্মলা বলেছিল, তুমি কিন্তু রবিবার সকালে হাতে কোনো কাজ রাখবে না। বাবা বার বার বলে গেলেন। তোমার তো কাজের শেষ নেই। আসলে এটা ঠেস দিয়ে বলা, তুমি আমার আত্মীয়স্বজনদের পছন্দ কর না। তাঁরা এলেই তোমার দেখছি এখানে সেখানে জরুরী কাজ পড়ে যায়। তুমি বের হয়ে যাও। বাবা এসে কিছু ফার্নিচার কিনে দিয়ে যাবেন। তুমি পছন্দ করে কিনবে।

অতীশ রা করেনি। এবং রবিবার সকালে অতীশ যাবার সময় বিনা নোটিশেই বের হয়ে গিয়েছিল। কেবল মিণ্টুকে বলে গিয়েছিল, তোর মাকে বলবি, রবিদার বাড়ি যাচ্ছি। ফিরতে বেলা হবে। নির্মলা বাথরুমে। এই সুযোগ।

অতীশ সিঁড়ি ধরে নামছিল। নির্মলাকে দেখার জন্য দুজন আয়া আছে, কেবিনের ভাড়া কত টাকা না জানি লাগবে ! একটা বড় রকমের অপারেশন হয়েছে নির্মলার। জরায়ু বাদ দিতে হয়েছে। অনেক টাকার দরকার। বাসায় টুটুল মিণ্টু একা—তার অফিস, বাড়ি থেকে কেউ এল না, ছুটিছাটা নেই, এত একা অসহায় যে কী করবে বুঝতে পারছে না। সে জানে এ-সময় একমাত্র টুটুলের মামার বাড়ির লোকেরাই তার অবলম্বন। হাসপাতালের খরচ তারাই চালিয়ে দেবে। আয়ার খরচ, এমন কী মেজদি বলে গেলেন কাল পথ্য দেবে—মেজদিই বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার দু-বেলা নিয়ে আসবেন। এরা এত করছে, অথচ কোথায় যে আত্মসম্মানে ঘা লাগে সে টের পায়। নিজের উপরে এক আক্রোশ—মনে হয় কেবল মাথার উপর শকুন উড়ছে।

তাকে যে করে হোক, আয়ার খরচ এবং কেবিন ভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ করতেই হবে। ইজ্জতের প্রশ্ন। ওরা যত দু-হাত তুলে খরচ করতে পারবে, তত যেন তাকে বুঝিয়ে দেবে, সে কত অবিবেচক মানুষ।

টুটুল ওর হাত ধরে হাঁটছে।

মিণ্টু ওর হাত ধরে হাঁটছে।

হাসপাতালের গেটের সামনে এসে বুঝল, হয় তাকে হেঁটে বাসায় ফিরতে হবে, নয় ট্যাকসিতে। টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে এসে বৌ-রাণী ঠিক করেনি। একা সে হেঁটেই চলে যায়। অফিস ছুটির সময়। বাদুড়ঝোলা বাস ট্রামে টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না।

মেজদি পাছে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে যান সে-ভয়ে টুটুল মিণ্টু বাবার কাছ ছাড়া হয়নি। তাছাড়া সেও চায় না বিশাল সাদা বাড়িটায় সে একা থাকে ! কেমন ভয় লাগে একা থাকতে। আর্চির প্রেতাত্মা তাকে সেই কবে থেকে তাড়া করছে। তাকে একা পেলেই যেন সে আরও বেশি মজা পেয়ে যায়। সারারাত কেমন আতঙ্কের মধ্যে থাকে। টুটুল মিণ্টু কাছে থাকলে, সে সাহস পায়। দুই শিশুকে দু পাশে নিয়ে নির্ভয়ে ঘুমোতে পারে। টুটুল মিণ্টুকে যেন তার নিজের আত্মরক্ষাতেই বেশি দরকার।

সে বলল, কিরে হাঁটতে পারবি ?

দু জনই মহাখুশি। বলল, হ্যা !

হাসপাতাল থেকে বের হতেই অতীশ কেমন যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। এই মানুষজন, ভিড় দোকানপাট, রাস্তার ভিখারি, নোংরা সব মিলে অন্য এক জীবন, যেন এখানে কেউ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে নেই। মৃত্যু বলে কিছু আছে তারা জানে না। হঠাৎ হঠাৎ সচকিত করে দেয় তাদের, বল হরি হরি বোল, ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা, এবং আবার বাস ট্রাম যায়, দোকান-পসরা চলে, বিজলি বাতির নিচে প্রেমিক-প্রেমিকা অপেক্ষা করে থাকে, গোপন কোনো জায়গায় দু-দণ্ড বসার বাসনা।

টুটুলের স্বভাব, রাস্তায় যা দেখবে তাই কিনতে চাইবে। একটা লোক ঝুমঝুমি বাঁশি বাজিয়ে ফুটপাতে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। তার গায়ে কালো-রঙের পোশাক, সেপটিপিনে হরেক রকম প্লাস্টিকের খেলনা, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, শিশুদের যা চাই যেমন হরিণ প্রজাপতি এবং বিড়াল ম্যাঁও ম্যাঁও ডেকে উঠলে অতীশ ভাবল, ও ফুটপাথ দিয়ে গেলেই বায়না ধরবে—বাবা, রেলগাড়ি।

রেলগাড়ির প্রতি টুটুলের ভারি ঝোঁক। একটা রেলগাড়ি তাকে কিনে দিতেই হবে, আজ হোক কাল হোক, রেলগাড়ি একটা দরকার। কিন্তু এখন তার পক্ষে কোনো অপচয় সম্ভব নয়। অতীশ রাস্তা পার হতে গেলে টুটুল হাত টেনে ধরল। ঠিক টের পেয়েছে বাবা ফুটপাত বদল করতে চায়। অতীশ বুঝে ফেলেছে টুটুল ও-ফুটপাথে যাবে না। এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য সামনে ফেলে বাবা যদি ফুটপাথ বদল করতে চায় সে তা দেবে কেন !

মিণ্টু বলল, কিরে হাঁদা, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন ! আয়।

টুটুল অন্যদিকে তাকিয়ে বাপের হাত টেনে রেখেছে। ছাড়ছে না। বলছে

দিদি, লোকটা নাচছে। হাতে বেলুন।

তা ঠিক, লোকটার হাতে সুতোয় বাঁধা অজস্র বেলুন। অতীশের মনে হল লোকটা ধড়িবাজ, কোনো শিশুকেই সে ছেড়ে দেবে না। দূরে থেকে বেলুন উড়িয়ে শিশুদের জাদুতে ফেলে দেওয়া। তার কাছে আছে শিশুদের মজার ভাণ্ডার। টুটুল দূরে থেকেও তা লক্ষ্য করছে। লোকটা স্টেশনের কাছাকাছি কোন জায়গায় থাকে, কখনও নিউ ছায়া স্টোর্সের সামনে, কখনও ব্যারন হোটেলের গায়ে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, লাফায়—একেবারে সার্কাসের কোনো ক্লাউনের মতো। টুটুলকে কিছুতেই ফুটপাথ বদল করানো গেল না। বাধ্য হয়ে অতীশ বলল, টুটুল, এখন না। পরে কিনে দেব।

টুটুল গোঁ ধরে আছে।—বাবা, আমার রেলগাড়ি।

—এখন রেলগাড়ি না। পরে। এসো।

—আমার রেলগাড়ি।

—বলছি না পরে। তোমার মার শরীর ভাল না। বাড়ি আসুক তখন কিনে দেব।

কিন্তু টুটুল নড়ছে না।

অতীশের মাথায় কেমন জেদ চেপে গেল।—যা চাইবে কিনে দিতে হবে। এসো বলছি। না হলে মার খাবে।

টুটুল দাঁড়িয়েই আছে। মার খাবে এটা সে বাবার মুখ থেকে শুনতে ভালবাসে না। অভিমানে টুটুলের চোখে জল এসে গেল।

সামান্য একটা রেলগাড়ির জন্য টুটুলের চোখে জল, মাকে দেখে চোখের জল ফেলেনি, মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ও টুটুল বাবার সঙ্গে হাসপাতালে গেছে, তখন তার মার জন্য কোনো যেন দুঃখ হয়নি, আসলে সে বুঝতেই পারে না সংসারে এটা কত বড় অঘটন, এমনকি হাসপাতালের বাইরে এসে মার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও করেনি, সেই ছেলে সামান্য একটা রেলগাড়ির জন্য কাঁদছে। অতীশ কেন জানি আর রূঢ় হতে পারল না। টুটুলকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে কিনে দেব। কথা দিচ্ছি। এস লক্ষ্মী আমার। বলে বুকে তুলে রাস্তা পার হয়ে গেল। আর দেখল যতক্ষণ লোকটাকে দেখা যায় টুটুল সেদিকে চেয়ে আছে। মিণ্টু বাবার দুঃখ বুঝতে শিখে গেছে। সে বাবার পিছু পিছু হাঁটছে।

সে বলল, ভাই তোর রেলগাড়িতে আমাকে নিবি না?

—না।

অতীশ বলল, আমাকে নিবি না?

—না।

—তোর মাকে?

টুটুল বলল, মাকেও না।

—ঠিক আছে, কাউকে নেবে না। রেলগাড়িতে চড়ে তুমি একলা কোথায় চলে যাবে, তখন আমরা তোমায় খুঁজে পাব না!

টুটুলের কেমন ভয় ধরে গেল।

—কোথায় যাব বাবা?

—কোনো স্টেশনে একা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। হুইসিল বাজাবে। দেখবে তোমার গাড়িতে কেউ উঠছে না। সবাই বলবে, ও বাবা, এ-কেমন গাড়ি, মা নেই বাবা নেই দিদি নেই। ছেলেটা একলা। ছেলেটা বড় স্বার্থপর ভাববে।

স্বার্থপর কি টুটুল বোঝে না। সে দু-হাত ছুঁড়ে বলল, না আমি যাব না।

—কোথায় যাবে না?

কোথায় যাবে না তাও বলতে পারল না। শুধু বলল, ইস্টিশন কী বাবা?

—যেখানটায় রেলগাড়ি থামে।

এখন টুটুল হাজার রকমের কথা বলবে। অতীশ সব কথার জবাব দিয়ে যাবে। টুটুল রেলগাড়ির কথা ভুলে গেছে। এটা রক্ষা। এখন তার মাথায় হাসপাতালের বিল, এতগুলি টাকা, কী করে পেতে পারে, কার কাছে পেতে পারে!

আসলে অতীশ জানে, কোম্পানি থেকে লোন নিলে কোনো ঝামেলা থাকবে না। কিন্তু কোম্পানির যা অবস্থা, লোন নেওয়া ঠিক না। লোনের চার পাঁচটা দরখাস্ত পড়ে আছে। সবাইকে নানা বাহানা দেখিয়ে রেখেছে। সেখানে সে নিজে নেয় কী করে! সে নিলে ওদের দেওয়া দরকার। আর একবার যদি কারখানার কর্মীরা এটা টের পায় তবে সবাই ঝেঁটিয়ে আসবে। কারণ এটা তো আর গোপন থাকবে না। কারখানায় তার বড় প্রতিপক্ষ কুম্ভবাবু, সেই চাউর করে দেবে, ম্যানেজার কারখানা থেকে ধার নিয়েছে। সে নিতে চাইলে শুধু অমলাকে বললেই হবে। কিন্তু অন্যদের বেলায় লোন স্যাংশানের মালিক সে। কারখানার কর্মীরা এমনিতেই কম মাইনে পায়—চলে না। সবাই খালাসি বাগানের বস্তির বাসিন্দা। কেবল প্রিণ্টার মণিলালের বাড়ি আছে। সোদপুরের দিকে। স্টেশনে নেমে মাইলখানেক রাস্তা গেলে তবে বাড়ি। তার কারখানায় মণিলালই সচ্ছল মানুষ। একমাত্র সেই ধার দিতে পারে।

রাস্তা পার হয়ে সে এখন আবার হাঁটছে। মিণ্টু আগে। অতীশ টুটুলের হাত ধরে হাঁটিয়ে আনছে। এদিকের ফুটপাথগুলো সব রিফ্যুজিরা দখল করে রেখেছে। কিছু ফার্নিচারের দোকান পার হয়ে এলেই রাজবাড়ির গেট।

রাস্তায় আলো জ্বলছে, দোকানে বাসে ট্রামে সর্বত্র।

সে কতটা নিরুপায় ভেবে নিজের মনেই হাসল। প্রিণ্টারের কাছ থেকে ধার! মরে গেলেও এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতীশ দেখছে সহসা মিণ্টু অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এতটা অন্যমনস্ক যে সে খেয়ালই করেনি, কখন মিণ্টু তার হাত ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সেই নিরন্তর ভয়, কিংবা এক ধরনের টেনসান, যেমন এদের বেলায়, রাস্তায় না হারিয়ে যায়। যদি হারিয়ে যায় কী বলবে, প্রায় দিনই পাখি পড়াবার মতো মুখস্থ করিয়ে দেয়।

—কী বলবে!

—বাবার নাম অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—কী বলবে!

—কুমারদহ রাজবাড়িতে থাকি।

—কত নম্বর?

মিণ্টু নম্বর বললে, অতীশের আবার প্রশ্ন রাস্তার নাম বল।

সে দৌড়ে গিয়ে মিণ্টুকে ধরে আনল, কী দেখছ? এস।

মিণ্টু কী দেখছে বলতে পারল না।

সে আবার সেই প্রশ্ন করল, হারিয়ে গেলে কী করবে? ধর এই শহরে তুমি মার সঙ্গে বের হয়েছ। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে তখন তোমার কাজ হবে পুলিশের কাছে বলা। তুমি হারিয়ে গেছ বলবে, কেমন! বলবে আমাকে দিয়ে আসুন। রাস্তার কোন লোককে বলবে না হারিয়ে গেছ, কেমন! কেউ কিছু দিলে হাত পেতে নেবে না। খাবে না।

মিণ্টু বলল, আচ্ছা বাবা, রাস্তার লোককে বলব না কেন?

—কার মনে কী আছে!

এই শহরে আসার পর তার এটাই মনে হয় শুধু, কে না কবে তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। অফিসে বসে কাজ করতে পারে না। বাবা কি চিঠি পাননি? গেট দিয়ে ঢোকার মুখে দারোয়ান সাদেক আলি উঠে দাঁড়াল। সেলাম দিল। শেষে হাত নামিয়ে বলল, এক আওরত আপকে সাথ মিলনে চাহতি হ্যায়।

আওরত? চারু নয়তো। সে চারুকে কবে থেকে খুঁজছে। চারু ধোঁকা দিয়ে চলে গেল! নাকি চারু বলে কোনো মেয়েকে সত্যি ঘোরে পড়ে গেলে দেখে! নির্মলা অসুস্থ হবার পর—সেই কবে থেকে নির্মলা ক্রমে খিটখিটে মেজাজের হয়ে যেতে থাকল, মাঝে মাঝে এমন হয় যে বিছানার পাশ দিয়ে হাঁটলেও নির্মলা ভয় পায়। অবদমিত কামের প্রতিক্রিয়া কি না কে জানে। অথচ একই ট্রেনে পিয়ারিলাল চারুকে তুলে দিয়ে গেল। সেই পিয়ারি-

লালও বলেছে, নেহি, বাবুজী, চারু কোন হ্যায় হ্যাম জানতা নেহি। কুম্ভবাবু সেদিন ফোন ধরে বলল, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন! কৈ কেউ তো কথা বলছে না।

সে কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, না না, পিয়ারি কথা বলছে। দেখুন। বলছে চারু বলে ওর কোনো ভাইজি নেই। চারু বলে সে কাউকে চেনে না।

কুম্ভর তখন কী হাসি!—দাদা, চারু দেখছি আপনার মাথাটি খাবে। পিয়ারিলাল কবে থেকে কারখানার মাল নিচ্ছে। কবে থেকে আমি তাকে চিনি, চারু বলে ভাইজি আছে তার কোনোদিন বলেনি।

অতীশ গুম মেরে গিয়েছিল।

—সাহাব! সাদেক ফের ডাকল।

টুটুল মিণ্টু রাজবাড়ির ভেতরে দৌড়ে ছুটে গেছে। তাদের এখন আর বাবার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। নিজের বাড়িঘরে হাজির। সামনের ব্যাডমিণ্টন খেলার লনের পাশ দিয়ে ওরা ছুটছে। তাদের বাবা যে ভীষণ বিপাকে পড়ে গেছে বুঝবে কী করে!

—সাহাব, বাহার মে বৈঠা হ্যায়।

—কোথায়?

সাদেক আলি গেটের বাইরে বসিয়ে রেখেছে। অতীশ চটে গেল।—তুমি বাইরে বসিয়ে রেখেছ। কোথায়?

আর দেখল গেটের ওদিকে বিশাল দেবদারু গাছটার নিচে কেউ বসে! শীর্ণকায় এক মহিলা। পরনে জীর্ণ বাস। সে প্রথমে চিনতে পারল না। অতীশকে অপলক দেখতে দেখতে বললেন, আমাকে চিনতে পারলি না বাবা!

—ও বড়জেঠিমা! আপনি! এখানে বসে!

—আমাকে ঢুকতে দিল না।

না দেবারই কথা। জেঠিমার শাড়ি সায়া ব্লাউজ সোডায় কাচা। ট্রেন-জার্নিতে চুল উসখো খুসকো। চোখ কোটরাগত। কেমন ছিন্নভিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত চোখমুখ। শীর্ণকায় এই আওরতকে সাদেক আলি রাস্তার আর দশজন গরীব উচ্ছিষ্ট মানুষ ভেবে ঢুকতে দেয়নি। সাহেবের কেউ হয় বিশ্বাসই করতে পারেনি। মতিচ্ছন্ন লোক শহরটায় বেড়ে গেছে। রাজবাড়ির সদর গেটে উপদ্রব লেগেই থাকে। পাঁচিলের বাইরের দিকে ঝুপড়ি বসে গেছে কটা। লাঠালাঠি হয়েছে, তবু তুলতে পারেনি। পুলিশ এসে ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে যায়, আবার দু-দিন যেতে না যেতেই গ্রাস করে ফেলে। গোটা রাজবাড়িটাই না বেদখল হয়ে যায়—বড় সতর্ক থাকতে হয় সাদেক আলিকে।

সে দেখল পাশে ফুল তোলা টিনের সুটকেস। সুটকেসটা হাতে নিয়ে অতীশ বলল, আসুন।

—তোকে চিঠি দিলাম, কোনো জবাব দিলি না বাবা!

অতীশ দিশেহারা—কী বলবে বুঝতে পারছে না। চিঠির জবাব দেয়নি। কী লিখবে? তিন চার বছর হবে জেঠিমার সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বড়দা, মেজ জ্যাঠামশায় আলাদা বাড়ি করে একসঙ্গে থাকে। দেশভাগের পর এখানে এসে একান্নবর্তী সংসার ভেঙে সব আলাদা ঠাঁই হয়ে গেছে। বড়দার বিয়েতে যেতে পারেনি। তখন সে জাহাজে। জাহাজেই চিঠি পেয়েছিল বাবার, পল্টুর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রীপক্ষ এ-দেশী। তারপর এক দু-বার গেছে। কলোনিতে মাটির দেয়াল তুলে তিনটে ঘর। একটা বাহারি। কলাগাছ, পেঁপে-গাছ ছাড়া বাড়িটায় অন্য গাছপালা নেই।

জেঠিমা হাঁটছেন। বেশ কাবু হয়ে গেছেন। জেঠিমার হাঁটা দেখেই সে এটা টের পেল।

—তোরা সব এত পর হয়ে গেলি! চিঠির জবাব দিলি না! চলে এলাম।

চিঠির জবাব কী দেবে বুঝতে পারেনি। কী লিখবে তাও ভেবে পায়নি। পাগল জ্যাঠামশাইর কুশপুত্তলিকা দাহ, শ্রাদ্ধ এ-সব করা হবে চিঠিতে জেঠিমা লিখেছিলেন। একটা মানুষ বিশ বাইশ বছরের উপর নিরুদ্দেশ, সংসারের শুভ অশুভ বলে কথা! জ্যাঠামশাইর পারলৌকিক কাজ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। বড়দার ছেলে-মেয়েদের অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। বড় বৌদিও মাঝে কী একটা অসুখে দীর্ঘদিন হাসপাতালে, বড়দার নিজের শরীরও ভাল যাচ্ছে না, এ-সব কারণে, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার মতো পাগল জ্যাঠামশাইর পারলৌকিক কাজ সেরে ফেললে বড়দার সংসার থেকে অশুভ প্রভাব কেটে যাবে—চিঠিতে জেঠিমা এমন লিখেছিলেন। বাড়ি গিয়েও অতীশ শুনেছে—বাবা, কাকা, মেজ জ্যাঠামশাই সবাই চান, কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু জেঠিমাকে রাজী করানো যাচ্ছে না। জেঠিমার এক কথা, আমার মন বলছে তিনি বেঁচে আছেন। মানুষটা বেঁচে থাকতে আমি বিধবা হতে পারব না।

অতীশ দেখল, জেঠিমার কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর—একজন সধবা রমণী যেমন হয়ে থাকে। এই প্রৌঢ়া কি তবে তার কাছে ছুটে এসেছেন পরিত্রাণের জন্য। চিঠিতে লিখেছিলেন, তুই যা বলবি, তাই হবে। যদি বলিস, তোর জ্যাঠামশাই বেঁচে নেই, তবে আমিও ভাবব তিনি বেঁচে নেই। তুই ছিলি তাঁর সবচেয়ে কাছের। তুই ঠিক টের পাবি, আরও এমন সব কথা লিখেছিলেন, যা তাকে ভারি গোলমালে ফেলে দিয়েছিল। সে তো ঠিক জানে না, তিনি বেঁচে আছেন কিনা, সে তো

ঠিক জানে না, তিনি মরে গেছেন কি না। কী লিখবে। সংসারে এই নিয়ে যে জেঠিমার উপর খুব নির্যাতন চলেছে, চিঠি পড়ে তাও সে টের পেয়েছে। আসলে তার পাগল জ্যাঠামশাই বেঁচে আছেন কি নেই—এই নিয়ে তার মধ্যেও কম জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। সেই সুপুরুষ দীর্ঘকায় মানুষটির চেহারা চোখ বুজলে এখনও সে দেখতে পায়—সারা দিনমান, তিনি হেঁটে চলেছেন যেন, কোন এক অপার্থিব জগতের সন্ধানে। কিংবা মনে হয় এক বড় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেছেন; যদি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন —কে জানে! কোনও পর্বতের গুহায় সেই মানুষ ঈশ্বরলাভের প্রতীক্ষায় যে বসে নেই কে বলবে! চিঠির জবাব সে সে-জন্য দিতে পারেনি।

অতীশ বলল, কখন রওনা হয়েছেন? একা এলেন?

—আমি পালিয়ে চলে এসেছি বাবা। তুই কিন্তু তোর বড়দাকে কিছু লিখে জানাস না।

প্রাসাদের গাড়িবারান্দায় আলো জ্বলছে। ডানদিকে বাবুপাড়ার জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে। রাস্তায় মেস বাড়ির নিচে খোপ খোপ পায়রার ঘর। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। উকিলবাবু বারান্দায় বসে হাওয়া খাচ্ছেন। টুটুল মিণ্টুর সঙ্গে খুব ভাব। বুড়ো মানুষ হলে যা হয়—খালি গা। ধুতি পরনে মানুষটা কোর্ট-ফেরত এ সময়টায় বারান্দায় বসে হাওয়া খান। দূরে থেকে অতীশ দেখতে পাচ্ছে তাদের। সে জানে টুটুল মিণ্টু ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে বাবার অপেক্ষায়।

জেঠিমা পালিয়ে এসেছেন। এটা তার কাছে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। সে বড়দাকে চিঠি লেখে না। এমনিতে এলে, কোনো কথা ছিল না। কিন্তু কাউকে না বলে চলে এসেছেন ভাবতে গিয়ে কেমন বিভ্রমে পড়ে গেল।

জেঠিমা চুপচাপ তার পেছনে হেঁটে আসছেন।

সে বলল, মেজ জ্যাঠামশাইর শরীর কেমন!

আসলে সে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

জেঠিমা বললেন, কত বড় বাড়িরে বাবা!

অতীশ দেখছে টুটুল মিণ্টু বাবার হাতে টিনের সুটকেস দেখে অবাক। ওরা নতুন বাড়ির কাছে এসে গেছে। মানসদা দোতলার রেলিংয়ে ঝুঁকে আছে। যেন অতীশের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলল, হে নবীন যুবক, বৌমা কেমন আছে?

—একটু ভাল দাদা। কাল ভাত পথ্য দেবে।

মানসদা বলল, ভাল হবে না মানে! ভাল হতেই হবে। তোমার তো আর রাজবাড়ি নেই। পাপ নেই। একবার এস। নতুন ছবি এঁকেছি। দেখবে।

অতীশের এখন বেশি কথা বলার সময় নেই—তবু এই রাজবাড়ির ভিতরে

হাজার কিসিমের মানুষের বাস। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তার একটাই প্রশ্ন; নির্মলা কেমন আছে। নির্মলাকে নিয়ে সে ভারি বিপাকে পড়েছে, রাজবাড়ির সবাই এটা জানে। সকাল হলে অনেকে খবর নিতেও আসে। এ ক'দিন সে মেস থেকে খাবার আনিয়ে নিজে খেয়েছে, টুটুল মিণ্টুকে খাইয়েছে। রোজ আশা করছে, মা কিংবা অলকা খবর পেয়েই চলে আসবে। কিন্তু কেউ না। এ-সময় জেঠিমা এসে পড়বেন সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার শৈশব কেটেছে জেঠিমা কাকিমার কোলে। একান্নবর্তী সংসারে মা-জেঠিমার তফাত কোনোদিন বুঝতে পারেনি।

টুটুল মিণ্টুকে বলল, প্রণাম কর। তোমাদের বড় ঠাকুমা।

জেঠিমা টুটুলকে দেখে বললেন, ছোটবেলায় তুই ঠিক তোর ছেলের মতো দেখতে ছিলি। হুবহু এক।

অতীশ দেখল ওরা প্রণাম করছে না। ওরা তার জেঠিমাকে দেখেনি। বাবার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক হয়ে শুধু দেখছে। জেঠিমাকে পছন্দ হচ্ছে না।

অতীশ রাস্তায় আর ওদের পীড়াপীড়ি করল না। রক্তকরবী গাছের নিচে আসতেই জেঠিমা বললেন, বৌমার কী হয়েছে! ও কোথায়? কী অসুখ?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে কেন! খুব কঠিন অসুখ?

—না খুব কঠিন না। ভাল হয়ে উঠছে। কাল পথ্য দেবে।

—তোর বাবা ক'মাস আগে গিয়েছিল। বলল, বৌমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কলকাতার জল হাওয়া সহ্য হচ্ছে না। কেন যে চাকরিটা ছেড়ে ও কলকাতায় চলে গেল! কলকাতায় মানুষ থাকে!

বাবার অভিযোগ এ-রকমেরই হবে সে জানে। কিছু বলল না। দরজা খোলায় সময় হাত থেকে সুটকেসটা নামাল। সিঁড়ির নিচে টুটুল মিণ্টু দাঁড়িয়ে আছে। জেঠিমা টুটুলকে কোলে নিতে চাইছে। কিন্তু টুটুল কী ভাবছে কে জানে—সে ঠেলে দিয়ে বলছে, কেন তুমি আমাদের বাড়ি এলে? চলে যাও।

—টুটুল! অতীশ জোর ধমক লাগাল। কী বাঁদরামি হচ্ছে! হ্যাঁ। আমার জেঠিমা। বড় জেঠিমা। ওঁরা না থাকলে তোমরা আমাকে পেতে কোথায়?

জেঠিমা বলল, বকিস না। ও বোঝে? একটা শিশুকে এ-ভাবে কেউ বকে!

অতীশ তালা খুলে দরজা ঠেলে দিল। বারান্দায় উঠে লাইট জ্বালল। এবারে সে জেঠিমার মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। বিপর্যস্ত না হলে এ-ভাবে কেউ

পালিয়ে আসে না। সহসা সেই দূরের মাঠ, আদিগন্ত ফসলের খেত, পুকুর-পাড়ের অর্জুন গাছটা চোখের উপর ভেসে উঠল; দূরে সোনালী বালির নদী, তরমুজের খেত, এক বালক দৌড়ায়। মানুষ তো একা বড় হয় না; সবাইকে নিয়ে বড় হয়। টুটুল মিণ্টু কী করে বুঝবে, এই প্রৌঢ়া বয়সকালে পাগল জ্যাঠামশাইর অজস্র অবিবেচক চিন্তা ভাবনার শরিক হতে গিয়ে কত না যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কোনো নালিশ ছিল না। জ্যাঠামশাই না ফিরলে কামরাঙা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দূরের মাঠের দিকে অপলক দৃষ্টি। কখনও তাকে কাছে ডেকে বলতেন, যা না বাবা, টোডারবাগের বটগাছটার নিচে বসে আছে কি না দেখে আয়। আসলে পাগল মানুষ হলে যা হয়—বাড়ি থেকে হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে যান, ফেরার কথা মনে থাকে না। কেউ মনে করিয়ে দিলে ফিরে আসেন, ফিরে আসার সময় পথ চিনে আসতে পারেন না। মাথায় গণ্ডগোল থাকলে যা হয়। তখন সে ঈশম দাদাকে নিয়ে খুঁজতে বের হত। কোনোদিন পেয়ে গেছে, কোনোদিন পায়নি। কোনোদিন দেখেছে, কোনো গাছের নিচে তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর, কোনোদিন দেখেছে, নদীর গভীর খাতের দিকে বালিয়াড়িতে চুপচাপ বসে আছেন। সে পেছন থেকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত—আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মানুষটার মনে হত বাড়ি ফেরার কথা। হাত ধরলে, শিশুর মতো তার সঙ্গে উঠে আসতেন। সে হাঁটলে তিনি হাঁটতেন, দৌড়ালে, তিনি দৌড়াতেন। সে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। আকাশের অথবা গাছের ছায়ায় নিরন্তর পাখিরা ওড়ে, সে-পাখি দেখলে তিনিও দাঁড়িয়ে পাখি দেখতেন। এমন দশাসই গৌর-বর্ণ সুপুরুষ মানুষটিকে সে খুঁজে পেলে সহজেই নিয়ে আসতে পারত। না পেলে জনে জনে জিজ্ঞেস করত, দেখেছেন, জ্যাঠামশায় কোনদিকে গেছেন—এদিক ওদিক, জমি মাঠ পার হয়ে অন্য গাঁয়ে পর্যন্ত একা একা কিংবা ঈশম দাদাকে নিয়ে জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে চলে গেছে। না পেলে সেও অনেক দিন চুপচাপ বসে থেকেছে কোনো গাছের নিচে। ঈশম দাদা নড়তেন না। তাকে না নিয়ে ফিরতেন না। কতদিন তরমুজের জমিতে গিয়ে সে বসে থেকেছে। বলেছে, চলুন, জ্যাঠামশাই কাল থেকে বাড়ি নেই। জেঠিমার মুখের দিকে তাকানো যেত না। বাড়ির আর সবাই এমন কি ঠাকুমা পর্যন্ত তাঁর পাগল ছেলে সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ বোধ করতেন না। এত বড় তল্লাটে বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে মানুষটাকে যে যার মতো ভেবে নিয়েছে। কারো কাছে তিনি ছিলেন পীরের শামিল, কারো কাছে সংসারবিরাগী মানুষ, ঠিক কেউ না কেউ তাঁকে পথ চিনিয়ে দেবে। চলে আসবেন একদিন। কেবল তার রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত। যেন বাড়ি এসে ডাকছেন, সোনা, দরজা খুলে দে। আমি ফিরে এসেছি। ফিরেও আসতেন। দু-পাঁচ সাতদিন এমন কি মাসও

পার হয়ে যেত, তাঁর খোঁজ থাকত না।

অতীশ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ভাবতে ভাবতে। সে মুহূর্তের জন্য তার স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা ভুলে গিয়েছিল। জেঠিমা ভিতরে ঢুকে বিশাল সব থাকার ঘর দেখে অবাক! পুরানো আমলের প্রাসাদসংলগ্ন এই বাড়ির কড়ি বরগা অনেক উঁচুতে। দরজা জানালা বিশাল। তিনি বললেন, টুটুল মিণ্টু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ে আয়। কিছুতেই আসছে না।

অভিমান! তার কেমন টান ধরে গেল। সে যেন এখন এক নতুন পৃথিবী তৈরী করে নিয়েছে। এখানে একটা আলাদা গ্রহ। এই গ্রহে নতুন আগন্তুক আসায় টুটুল মিণ্টু অখুশি। তারা বাবা ছাড়া কিছু বোঝে না। সেই বাবা, কোথাকার এক নতুন আগন্তুকের খোঁজ পেয়ে তাদের অবহেলা করছে। সহ্য হবে কেন! সে ছুটে গেল। টুটুলটা না আসায় সে ভাবল বাবাকে ভয় দেখাবার জন্য দিদির হাত ধরে কোথাও না গিয়ে আবার লুকিয়ে থাকে! সে বাইরে বের হয়ে দেখল, না, ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দিদি ভাইকে জড়িয়ে ধরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবার ধমক দুজনের একজনও সহ্য করতে পারে না।

অতীশ কাছে গিয়ে বলল, আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! কান্নার কী হল! আমার জেঠিমা এসেছেন। তোদের বড় ঠাকুমা। আমার যেমন তোরা, আমিও তোর ঠাকুমার তেমনি ছিলাম। আমি কি একদিনে বড় হয়ে গেছি! তোর বড় ঠাকুমা, আমি যখন ছোট ছিলাম না, চান করিয়ে দিত, কোলে নিয়ে ভাত খাওয়াতো, কাঁদলে আদর করত। ঠিক তোরা যেমন দুষ্টুমি করিস, ছেলেবেলায় আমিও কত দুষ্টুমি করেছি। মা মারধোর করলে জেঠিমা ছুটে এসে ছিনিয়ে নিতেন।

বাবাকেও মারত! এমন কথায় দুজনেরই কান্না থেমে গেল।

—তুমি দুষ্টুমি করতে বাবা!

—করতাম না!

—তোমাকে ঠাকুমা মারত!

—মারবে না দুষ্টুমি করলে!

নিমেষে অভিমান তাদের জল হয়ে গেল। তারা শুধু দুষ্টু নয়, বাবাও দুষ্টু ছিল। ভারি মজা। ওরা এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে এসে তাদের বড় ঠাকুমাকে টুপ করে প্রণাম করে ফেলল।

জেঠিমা বললেন, বেঁচে থাক ভাই। বেঁচে থাক দিদি। বংশের মুখ উজ্জ্বল কর।

টুটুল এ-সব বোঝে না। সে জেঠিমাকে তার যাবতীয় সব আশ্চর্য খবর দেবে বলে তক্তপোশের নিচে ঢুকে গেল। তার নিজের খেলনার বাড়িঘর টেনে

বের করতে থাকলে, অতীশ বুঝল, এখন ভাইবোন মিলে সব দেখাতে বসবে। জ্বালাবে।

অতীশ জেঠিমাকে বলল, এদিকে দুটো ঘর। ওদিকে রান্নাঘর। পাশের দরজা খুলে বলল, এটা বাথরুম। রাতে কি খান?

—একটা হলেই হবে। তুই কি বৌমাকে দেখতে গেছিলি?

অতীশ বলল, আজ সকালে ওর ঘোর কেটেছে। খুব বড় অপারেশন হয়েছে। ক'দিন হাসপাতালে আরও থাকতে হবে। মার আসার কথা, কিন্তু এল না কেন বুঝতে পারছি না।

আসলে সে কিছুটা নিরুদ্বেগ, কারণ জেঠিমা থাকলে টুটুল মিণ্টুকে দেখার নিজের একজন কেউ থাকল। শহরে এসে সে দেখেছে, নিজের লোকের বড় অভাব। মেস থেকে খাবার দিয়ে যাবে, কিন্তু জেঠিমা সে-সব ছোঁবেন না। তিনি কী খাবেন, ঘরে কিছু আনাজপাতি আছে।

সে বলল, স্টোভ ধরিয়ে দিচ্ছি। আপনি চান-টান করে একটু জিরিয়ে নিন। আমি দৌড়ে বাজারটা সেরে আসছি। সে জানে, জেঠিমার একটু মাছ ভাত হলে আর কিছু লাগে না। কতকাল পর সে যেন সেই সোনা, আর জেঠিমা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে। তেঁতুল গাছের ছায়ায় জেঠিমার মুখে কোন এক অতীত থেকে এক মায়াবী আলো ফুটে উঠেছে।

জেঠিমা স্নানে যাবার আগে বললেন, তোরা কী খাবি! আমার খাওয়া নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন!

—আমাদের খাবার মেস থেকে দিয়ে যাবে।

মেস কথাটা জেঠিমা ঠিক বুঝতে পারেন নি। সুটকেস খুলে শাড়ি বের করেছেন। এবং অতীশ দেখল, সবই সোডায় কাচা। সে বলল, এগুলো বের করে দিন, ধোপা নিয়ে যাবে। নির্মলার সায়া শাড়ি দিচ্ছি। কারণ অতীশ জানে, আজ হোক কাল হোক নির্মলাদের বাড়ি থেকে কেউ চলে আসবে। ওরা জেঠিমার এই বিবর্ণ শাড়ি ব্লাউজ দেখলে খুশি হবে না। অতীশ এ-জন্য নির্মলার পাটভাঙা শাড়ি ব্লাউজ সায়া বের করে দিয়ে বলল, আপনি চানে যান। শাড়িগুলি বের করে দিন। সকালে মনোহরকে বলে যাব, সে নিয়ে যাবে। তারপরই কী মনে পড়ে যাওয়ায় অতীশ বলল, মেস আছে, যারা পাশের মেসবাড়িতে থাকে তাদের রান্না হয়। কেউ আলাদা মিল চাইলে দিয়ে যায়। একা পেরে উঠছিলাম না। কাল সকালে আপনাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাব। বাড়িটায় কত লোক থাকে বুঝতে পারবেন। বাবুপাড়া, বাবুর্চি-পাড়া, ধোপাঘর, দুটো বিশাল পুকুর, মাঠ কী না আছে। বলেই সে ব্যাগ হাতে বের হবার সময় বলল, মিণ্টু, তোমার ঠাকুরমার যা লাগে দেবে। আমি আসছি।

জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বলল, গামছাটা রেখে দিন, বাথরুমে ধোওয়া তোয়ালে আছে, সাবান সব।

সে জানে জেঠিমা ফিটফাট থাকতে ভালবাসতেন। বড়দা খুবই কষ্টে আছে, না, বড় বৌদি জেঠিমার এমন অবস্থার জন্য দায়ী সে কিছুই বুঝতে পারছে না। জেঠিমা কখনও এত বিবর্ণ শাড়ি সায়া ব্লাউজ পরেছে সে দেখেনি। সে খুব দ্রুত কথা বলে যাবার সময় শুনতে পেল, জেঠিমা ডাকছেন, সোনা বাজারে যাচ্ছিস, আমার জন্য পান সুপারি আনিস। আর শোন, মেসে বলে যা, মিল লাগবে না। একার জন্য আমি রাঁধতে পারব না বাবা।

এতটা রাস্তা এলেন কিছু মুখে দেননি, চোখ মুখ দেখেছেন আয়নায়!

জেঠিমা হেসে ফেললেন, আয়নায়! তুই দেখছি কেমন হয়ে গেছিস। আমি রাঁধব, তোরা খাবি না। তোরা মেসের খাবার খাবি, আমার খেতে ভাল লাগবে! বলে অতীশের দিকে এমন কাতর চোখে তাকিয়ে থাকলেন যে সে আর একটা কথা বলতে পারল না।

কিন্তু গোল বাধল খেতে বসে। সে বাজার থেকে পাবদা মাছ এনেছে। জেঠিমা পাবদা মাছ খেতে ভালবাসেন। তাজা নয়, বরফ দেওয়া। তাজা পাবদা কলকাতায় এসে অতীশ কোনোদিন খায়নি। সকালের বাজারে তবু পছন্দমতো মাছ পাওয়া যায়, বিকালের বাজারে তাও পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে—খেতে বসে অতীশ অবাক, জেঠিমা মাছের বাটিটা সবটাই তাকে এগিয়ে দিলেন। মুগের ডাল বেগুন ভাজা মাছের ঝোল। বেশ রাত হয়ে গেছে। টুটুল মিণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওদের তুলে চোখে মুখে জল দিয়ে অতীশ নিজের পাশে বসিয়ে নিয়েছে। নিজেও খাবে, ওদেরও খাইয়ে দেবে। ঘুমের চোখে এমনিতেই খেতে চায় না দুজনে, সে তবু পারে খাওয়াতে। জেঠিমার আচরণে সে কেমন অবাক হয়ে গেল। বলল, সবটা দিলেন কেন? আপনারটা কোথায়? আপনি পাবদা মাছ খেতে ভালবাসেন বলে এনেছি।

জেঠিমা শুধু বলল, তুই খা। আমি মাছ খাই না।

অতীশ কেমন আহম্মকের মতো বলল, কবে থেকে খান না? এখানে পালিয়ে চলে এলেন—কারণ অতীশের ধারণা জেঠিমা বৈধব্য মেনে নিলে মাছটাও খেতে পারবেন না বলেই, নিখোঁজ পাগল জ্যাঠামশাইর পারলৌকিক কাজে মত দিচ্ছেন না। মা এবং অন্য আত্মীয়স্বজনরা অতীশকে এমনই বুঝিয়েছে। হতে পারে। একজন মানুষ বিশ বাইশ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গেছেন, তাঁর স্মৃতি আর সে-ভাবে প্রখর থাকার কথা না। সবই মন থেকে ক্রমে মুছে যায়। জ্যাঠামশাইকে সেও কম ভালবাসত না। এখন তাঁর মুখটাই সে মাঝে মাঝে মনে করতে পারে না। ধূসর স্মৃতি। জেঠিমার বয়েস হয়ে গেছে, তিনি কি বিশ বাইশ বছর পরও সেই তাজা মানুষটার স্পর্শ

অনুভব করেন! না, নিছক অভ্যাস ছাড়তে পারবেন না বলে আত্মীয়-স্বজনের সবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

অতীশের খুব খারাপ লাগত এসব ভাবতে। এটাও মনে হত, যদি আজীবন জেঠিমা সধবাই থাকেন কার কী ক্ষতি! এখন জেঠিমার কথায় বুঝেছে, তাড়নায় পাগল হয়ে যাবার যো।

জেঠিমা বললেন, কীরে বসে আছিস কেন? এই মিণ্টু, এই টুটুল আবার ঢুলছে!

—আপনি একটা বাটি দিন তো।

—পাগলামি করিস না। মুগের ডাল বেগুন ভাজা দিয়ে হয়ে যাবে। তুই ভাবিস না বাবা।

—না দিন।

—বলছি মাছ খাই না।

অতীশ জেঠিমার কপাল দেখল। বড় করে সিঁদুরের টিপ, মাথায় লম্বা সিঁথিতে সিঁদুর—একটাও চুল পাকেনি। চুল কোঁকড়ানো, স্নান করায় জেঠিমাকে বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। এত বয়সেও কোথায় যেন এক গোপন সৌন্দর্য শরীরে লুকিয়ে রেখেছেন। জেঠিমা কি বোঝেন, তিনি সাদা থান পরলে ইহকালে বেঁচে থাকা তাঁর অর্থহীন। একই ছেলে, তাঁর বৌমা নাতি নাতনী সব থাকতেও জেঠিমা নিজেকে কেন যে এত নিঃস্ব—তার কেমন টান ধরে গেল। বলল, খাবেন না কেন, আপনি না খেলে এত কষ্ট করে আনতে গেলাম কেন? আপনি না খেলে আমরাও খাচ্ছি না।

জেঠিমা নিজেকে সংবরণ করার জন্য মুখ আড়াল করছেন।

অতীশ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মাথা নিচু করে বসে আছে। টুটুল মিণ্টু ঢুলছে।

জেঠিমা আর পারলেন না। মুখ অন্যদিকে লুকিয়েই বললেন, বৌমা দিব্যি দিয়েছে বাবা, মাছ খেলে আমি ছেলের মাথা খাই। অতীশ বুঝতে পারছে, নির্যাতনের শেষ পর্যায়ে আজ জেঠিমা ভেঙে পড়েছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুখে আঁচল চেপে কান্না সামলাবার চেষ্টা করছেন।

অতীশ বুঝতে পারে, মগজের মধ্যে হাজার কোটি কোষ আছে, এইসব কোষে স্মৃতিরা জেগে থাকে, কিংবা দেখতে পায় বিশাল খাঁ-খাঁ প্রান্তরে শকুন উড়ছে, কখনও মনে হয় এক বুড়ো বসে আছে গাছের নিচে, হাতে লাঠি। শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। সামনে নদী, তার তরঙ্গ নেই অথবা বালিয়াড়ি পার হয়ে কেউ হেঁটে যায়। কোনো পাহাড়ী উপত্যকায় মনে হয় কখনও কে যেন দাঁড়িয়ে থাকে—আবার এই সব কোষেই শুয়ে থাকে নির্মলা নামে এক যুবতী। এ ক'দিন মনে হয়েছে যুবতী তার মগজের কোষের সবটা অধিকার করে

শুয়েছিল। সাদা বিছানা, ওষুধের গন্ধ, স্যালাইন, ব্লাড ছাড়া কোষের অভ্যন্তরে অন্য কোনো ছবি ফুটে উঠত না। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা প্রবল হলে যা হয়, এবং মাথাটা মনে হত ভারি, কেউ পাথর চাপিয়ে রেখেছে। আজ বিকালে সেই যুবতী আরোগ্যলাভের দিকে, তার দিকে তাকিয়েছে। নির্ভর বলতে সেই তার—আর এখন সামনে বসে আছে সেই নিখোঁজ মানুষটির স্ত্রী। এবং ভেতরে কেমন সে ছটফট করতে থাকল। শেষে সে কি ভেবে। টুটুল মিণ্টুকে খাইয়ে তুলে নিয়ে গেল।

জেঠিমা কখন এক ফাঁকে উঠে গেছেন। বিছানা করেছেন। বলেছেন, তোর ছেলেমেয়েরা আজ আমার সঙ্গে শোবে। দেখে মনে হয় কতদিন তুই ঘুমোস না!

অতীশ কিছু বলল না।

জেঠিমা ওদের কাছে টেনে নিলেন। সে কিছু বলল না। জেঠিমার ধারণা, ওরা তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়—আসলে জেঠিমা জানেই না, ওরা আছে বলে সে বেঁচে থাকতে চায়—নাকি, এটা তার একটা মানসিক বিকার—কেউ না থাকলেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। সে যতই একা হয়ে যাক, পৃথিবীর টান বড় টান।

অতীশ টেবিল-লাইট জ্বালিয়ে চেয়ারে বসল। খাবার পর কিছুক্ষণ লেখার টেবিলে চুপচাপ বসে থাকল। হাসপাতালের বিল, কত টাকার দরকার! তার কাছে দু পাঁচশ বাড়তি টাকা সংগ্রহ করা কত কঠিন, মুহূর্তে টের পেল। সে অনেক দিন ভেবেছে. সেই সমুদ্র এবং বনি, একটা বোট এবং অনন্ত জলরাশির খবর মানুষের কাছে পেঁাছে দিতে পারলে তার কিছু টাকা হয়ে যেতে পারে।

সে ভেবেছিল লেখাটা হবে দিনলিপি পর্যায়ের।

সেটা কোন সাল তার মনে আছে। কী মাস তাও কি মনে আছে! ডিসেম্বর মাস। না জানুয়ারি! জানুয়ারি না ডিসেম্বের! কেমন গোলমাল শুরু হয়ে গেল মাথায়। তের চোদ্দ বছরের আগের ঘটনা—ঠিক মাসটাও মনে করতে পারছে না। তারিখ অনুযায়ী লিখলে মাস তারিখ বছর দিতে হয়। তারপরই মনে হল, মাস তারিখ বছর গুরুত্ব পাচ্ছে কেন। সেটা যে কোনো মাস হতে পারে, তারিখ হতে পারে সাল হতে পারে।

আসলে সেই দীর্ঘ অজানা সমুদ্রে বনি এবং তার বিচিত্র মানসিকতার কথা কথা লিখতে পারলেই যথেষ্ট। বিষয় হিসেবে একেবারে নতুন। এমন দুঃসাহসিক অভিযানের খবর পৃথিবীর কেউ রাখে না।

তখনই মনে হয় সুদূরে স্যালি হিগিনস দাঁড়িয়ে। তাকে প্রশ্ন করছে, হোয়াট ইজ লাভ!

সে এই বুড়ো লোকটাকে কেন যে এত ভয় পায়!

এই বুড়ো লোকটাই যত নষ্টের মূলে।

জাহাজে বনিকে নিয়ে ওঠার কি দরকার ছিল!

উঠেছিলেন তো বনিকে ছেলে সাজিয়ে রাখার কী দরকার ছিল! জ্যাক বলে চালিয়ে দেবার কী দরকার ছিল! জ্যাক আসলে বনি, বালিকা, এই চাতুরী ভেবেছিলেন বেশ মেনে নেবে সবাই। ছোট করে চুল ছেঁটে এনেছিলেন। সারা ডেকে দাপাদাপি করে বেড়াত। জাহাজিরা তো ভয়ে কাছেই যেত না। কাপ্তানের দুরন্ত ছেলে, কখন কী করে বসবে। কাপ্তানের একমাত্র বংশধরকে সফরে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এত দুরন্ত যে আত্মীয়স্বজন রাখতে চায় না। মা-মরা মেয়েকে কোথাও রেখে আসতে পারতেন না! কেন পারলেন না! আসলে আপনি জানতেন, বনিকে একা ফেলে বেশিদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে আপনার ভাল লাগে না। শেষ সফর, বয়স হয়ে গেছে, কখন কফিনের ভিতর ঢুকে যেতে হবে, যে কটা দিন কাছে কাছে রাখা যায়!

জাহাজে উঠেই সারেঙকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন এখন বুঝি!

সারেঙসাব সেদিন, জাহাজের সবাইকে ডেকেছিলেন।

ডেক-সারেঙ হাজির। জাহাজ গঙ্গার মোহনা ছাড়িয়ে সমুদ্রে তখন ঢুকছে।

কসপ টিণ্ডাল, ডংকিম্যান, ফায়ারম্যান, গ্রীজার, কোলবয় এবং সব খালাসিরা হাজির।

যেন সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন—সাবধান এবারের সফরে জাহাজে শুধু তোমরা আছ ভেব না। সঙ্গে একজন ইবলিশও বিসমিল্লা বলে উঠে এসেছে।

—কে সেই ইবলিশ?

—জ্যাক। কাপ্তানের বয়ে যাওয়া পোলা।

—তা পোলা যে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল!

অতীশের হাসি পেল এ-সময়।

দরজা ভেজিয়ে অনেক দূরের স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছে সে।

কী মাস?

ধরা যাক জানুয়ারি। দক্ষিণ সমুদ্র। শেষ বন্দর সামোয়া। ওখানেই বড় টিণ্ডাল মৈত্রদাকে ছোট্ট একটা পাহাড়ী দ্বীপে দাহ করা হয়েছিল।

আবার চীৎকার—হোয়াট ইজ লাভ ছোটবাবু?

—লাভ!

—ইয়েস লাভ!

—জানি না! জানি না!

মৈত্রদা কেন যে সমুদ্রের জলে ডুবে আত্মহত্যা করল। এটা আত্মহত্যা! আপনি, স্যালি হিগিনস জানেন, সে কেন আত্মহত্যা করল! সে কেন জাহাজে পাগল হয়ে গেল! সে কী কোনো ভালবাসার জন্য?

সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে বোটের অদূরে স্যালি হিগিনস বলেছিলেন, লাভ ডাজ ব্রিং এবাউট জাস্টিস অ্যাট ল্যাস্ট, ইফ ইউ ওনলি ওয়েট।

আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, প্রেম হল ঈশ্বরলাভের মতো। প্রেম এবং ঈশ্বরে কোন তফাত নেই।

বনির সেদিন কি কারণে যে মেজাজ গরম হয়ে গেছিল, মনে করতে পারছে না অতীশ।

সেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি।

অ্যালবাট্রস পাখিটা বোটের গলুইয়ে বসে চুপচাপ দুজনকেই দেখছে। নীল চোখ। ঘাড় কাত করে আছে।

তারা তিনটে মাত্র প্রাণী।

আর অসীম জলরাশি।

শেষ পর্যন্ত বাতিল জাহাজ থেকে কাপ্তান স্যালি হিগিনস বনি এবং তাকে বোটে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

দৃশ্যটা অতীশ মনে করতে পারছে।

সে এগিয়ে যাচ্ছে ডেক ধরে। রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। কী কঠিন আর বিভীষিকাময় সমুদ্র ক্রমে পাক খাচ্ছে। সব কিছু দুলছে। সে তবু শক্ত। জাহাজ থেকে সবাই নেমে গেছে। চারটে লাইফবোটের তিনটেই দিয়ে দিয়েছেন তিনি। একটা মাত্র আছে। আর আছে সে, বনি, সারেঙসাব, কাপ্তান, স্যালি হিগিনস্! সামোয়া থেকে রওনা হবার আট দশদিন পর এই দুর্ঘটনা। বয়লার চক বসে গিয়ে ইনজিনরুমে বিস্ফোরণ। প্রপেলার স্যাফট দু টুকরো। ঝড়ে ট্রানসমিসান রুম উড়ে গেছে।

ওফ কী শব্দ!

চীৎকার চেঁচামেচি। ছোটাছুটি। এবং ধস্তাধস্তি। ঝড়ের রাতটাই ছিল সেই শয়তানের—দুরাত্মা আর্চি, বনির কেবিনে ঢুকে ধর্ষণের নিমিত্ত পাগল হয়ে গেছে।

শক্ত মজবুত ছোটবাবু সিঁড়ি ভেঙে উঠছে উপরে—দরজা ঠেলে দিতেই সেই অসহায় নারী!

অতীশ হাসল। কী সব স্মৃতি এলোমেলো বান ডেকে যাচ্ছে মগজের কোষে।

অতীশ চুপি চুপি বলল, স্যার জ্যাক যে নারী হয়ে গেল দীর্ঘ সফরে। স্যার জ্যাক যে নারী, এটা জাহাজে সবার আগে টের পেয়েছিল আর্চি। দুরাত্মা আর্চির মুখটা আমার কাছে সব সময় বাঘের মুখ মনে হত! ধর্ষণের সময় সেই দুরাত্মাকে খুন না করলে আপনার একমাত্র বংশধরকে ইজ্জতের হাত থেকে যে বাঁচাতে পারতাম না! আমার কী পাপ বলুন! সে বলল,

মাই হার্ট টেমবেলস অ্যাট দিস! আমি তাকে খুন না করে পারিনি! আমার কী পাপ বলুন! কেন আমার জীবনে এত সাফারিঙস!

অতীশ শুনতে পাচ্ছে তিনি সেই সুদূরে অতীত থেকে যেন বলছেন, গড সেণ্ডস দ্য স্টর্ম অ্যাজ পানিশমেণ্ট। আমার পাপ ছিল হে। তারপরই সেই হাহাকার শুনতে পেল অতীশ, হ্যালেলুজা। আই অ্যাম অন মাই ওয়ে। তিনি কাঠে পেরেক পুঁতে দিচ্ছেন। দুটো ক্রস তৈরি করেছেন, দুটোই তুলে দেওয়া হবে তাদের বোটে। কাঠে পেরেক পুঁতে দেবার সময় বলছেন, বুঝলে ছোটবাবু, সাফারিঙস—সাফারিঙস অফ ম্যানকাইণ্ড। মানুষই নিজের সব কিছুর জন্য দায়ী। তার উত্থান-পতন, পাপ-পুণ্য সব। সে নিজেই তার ক্রস বধ্যভূমিতে বহন করে নিয়ে যায়। তোমার স্ত্রী নির্মলা অসুস্থ। ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু সাফারিঙস মানুষের জন্মের সঙ্গী। তাকে তুমি এড়াতে পার না।

তিনি বললেন, লেট মি গো অন অ্যাণ্ড আই উইল শো ইউ দ্য ট্রুথ অফ হোয়াট আই অ্যাম সেইঙ। আই অ্যাম টেলিং ইউ দ্য অনেস্ট ট্রুথ, ফর আই অ্যাম এ ম্যান অফ ওয়েল-রাউণ্ডেড নলেজ।

অতীশ চেয়ে আছে। জানালা অতিক্রম করে দূরের আকাশে দু একটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। স্যালি হিগিনস সেখান থেকে যেন তারবার্তা পাঠাচ্ছেন—গড ইজ অলমাইটি, অ্যাণ্ড ইয়েট ডাজ নট ডেসপাইজেস এনিওয়ান অ্যাণ্ড হি ইজ পারফেকট ইন দিজ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং।

অতীশ চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল—আমি কিছু মানি না। অল বোগাস।

তখনও প্রশ্ন, তুমি বাতিদানটা কুলুঙ্গিতে রেখেছ কেন? জবাব দাও। তোমার সন্তানদের ওটা ধরতে দাও না কেন? তোমার জন্য অদৃশ্যলোকে কেউ থাকুক এটা তুমি চাও। নাহলে সাহস পাবে কী করে। সামান্য হাসপাতালের বিল মাথা গরম করে দিয়েছে। হা হা হা—কী হাসি!

—আপনি হাসছেন?

—তোমার পাগল জ্যাঠামশাই কোথায়?

—জানি না।

—সেই অন্ধকার অদৃশ্য জগতে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে তোমরা আর ফিরে পাবে না। তোমার জেঠিমা কাঁদল কেন? মানুষের স্মৃতিই সব। তাকে সে কিছুতেই বিনষ্ট হতে দিতে চায় না। তোমার চারুকে খুঁজে পেলে?

অতীশ কেমন বিভ্রমে পড়ে গেছে। যেমন সে মাঝে মাঝে পড়ে যায়—একটা ঘোরের মতো। এই ঘোরের মধ্যেই সে যদি তার সেই আশ্চর্য সফরের

কথা লিখতে পারত। বলল. আমাকে সাহস দিন। বোটে ওঠার দিনক্ষণ সব ভুলে গেছি। মনে করিয়ে দিন। নির্মলার অসুখের পর আমি একটা লাইন লিখতে পারছি না। বনি মাঝে মাঝে এসে উদয় হয়। বাতিদানটার মধ্যে বনিকে আমি স্পষ্ট দেখেছি। বাতিদানটায় বনি আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি বললেন, দেয়ার ইজ নো ট্রুয়ার স্টেটমেণ্ট দ্যান দিজ। দেখতেই পার। তিনি নানাভাবে মানুষকে দেখা দেন। গড ইজ নেভার উইকেড অ্যাণ্ড আনজাস্ট। তিনি ভালবাসার সামগ্রী। ইফ গড ওয়েয়ার টু উইদড্র হিজ স্পিরিট অল লাইফ উড ডিজএপিয়ার অ্যাণ্ড ম্যানকাইণ্ড উড টার্ন এগেইন টু ডাস্ট।

তিনি ফের বললেন, বনি ওয়াণ্টেড টু লিউর ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম ডেনজার ইনটু এ ওয়াইড প্লেজাণ্ট ভেলি অ্যাণ্ড টু প্রসপার ইউ দেয়ার। বনি ইজ লাভ, লাভ ইজ গড। নাউ গড উইথ ইউ। প্রেইজ হার।

অতীশ আর স্থির থাকতে পারল না। কুলুঙ্গি থেকে বাতিদানটা তুলে আনল। কষ্টি পাথরের ছোট্ট দেবীমূর্তি। মাথায় মুকুট—কয়েকটা ফোকর। সে যখন এখানে ছিল না. নির্মলা বাপের বাড়ি—তখন বৌ-রাণী সবার অলক্ষ্যে তার এই বাসাবাড়িটায় খাট চেয়ার টেবিল, যেখানে যা দরকার সাজিয়ে রেখেছিল। বাতিদানটাও। সে একা বাসাবাড়িতে ফিরে কেন যে ভাবল, এটা তার বাসা-বাড়ি নয়, যেন নতুন এক গ্রহে এসে সে উঠেছে। কে জানে কীভাবে লোভে ফেলে দিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নামাবে। সে সব অন্দরের দিকের দরজায় নিয়ে ফেলে রেখেছিল—ঐ দরজা দিয়েই তার বাসা বাড়িতে পাপ ঢুকবে এমন একটা আশংকা তাকে সে-রাতে কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু এই বাতিদানটায় হাত দিতেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। যেন বনি সামনে দাঁড়িয়ে—ছোটবাবু আমাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে! আমি যে তোমার মধ্যে বেঁচে আছি।

অতীশ ফের বলল, মাই হার্ট ট্রেমবেলস অ্যাট্ দিস। আমি ফেলে দিতে পারিনি। তুলে রেখেছিলাম। আমার যেন এটা শেষ আশ্রয়।

অতীশ টেবিলে বাতিদানটা রেখে দেখছিল। কালো কষ্টিপাথরের নগ্ন দেবীমূর্তি ক্রমে সেই সুচারু রমণী হয়ে যেতে থাকল—নীলাভ চুল, শঙ্খের মতো সাদা গায়ের রঙ—নীল চোখ এবং এক ঔদার্যময় গভীর আকাঙ্ক্ষা বুকের ভেতর—নরম এবং উষ্ণ হালকা লেসের গাউন শরীরে। ভেতরের সব দেখা যায়—সমুদ্রে সূর্য নেমে যাচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে না তেমন—চারপাশে অসংখ্য ডলফিনের ঝাঁক, কোন অতিকায় মনস্টার নিচে দাপাচ্ছে কে জানে—একরাশ কাশফুলের রেণুর মতো উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক বাতাসে উড়ে যাচ্ছে—অথবা মনে হয় হাজার হাজার বর্শাফলক সমুদ্রের অতল থেকে উঠে এসে

নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বাতাসে।

পালে বাতাস। অজানা সমুদ্রে দুই তরুণ-তরুণী। সকাল হলেই কাপ্তানের নির্দেশমতো বোটের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়া। ৯০ ডিগ্রি বরাবর কম্পাসের কাঁটা রাখতে বলেছে। হালের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে জানে। পালে বাতাস লাগলে বোট চলছে, না লাগলে বোট থেমে থাকছে—অথবা যেন হিগিনস জানতেন সমুদ্রে চোরা স্রোত থাকে, কোথায় শেষ পর্যন্ত ভেসে যাবে কেউ বলতে পারে না। শুধু দৈবনির্ভর। আসলে ৯০ ডিগ্রি ফিগ্রি সব বোগাস ব্যাপার। আসলে সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ের মৃত্যু চোখের উপর দেখতে সাহস পাননি। বোট দিয়ে বলেছেন, এবারে সামনে এগিয়ে যাও। ক্রস দুটো বোটে রাখার সময়ই সে টের পেয়েছিল, এই বোটই হবে তাদের সমাধিক্ষেত্র। নিরন্তর ভেসে চলবে, সে আর বনি মরে পড়ে থাকবে বোটে। শিয়রে বাইবেল, দু-পাশে দুজনের দুটো ক্রস, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পাগল হয়ে যেতে হবে। কে কার গলা কামড়ে ধরবে ঠিক নেই। তবু শেষ অবলম্বনের কিছু নির্দেশ তিনি দিয়ে বলেছিলেন, যখন জল এবং খাবার ফুরিয়ে যাবে—তখন প্ল্যাংকাটন খাবে। সমুদ্রের সেই শ্যাওলা জীবনধারণের পক্ষে খুবই উপযোগী। আসলে ওগুলো শ্যাওলা না। একধরনের জীবাণু বিশেষ। বলেছিলেন ছাঁকনি ফেলে রাখবে—ছাঁকনিটা যত্ন করে রাখবে। ওটা র‍্যাফটে রাখবে না। ঝড়ে র‍্যাফটের দড়িদড়া আলগা হয়ে গেলে—বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ছাঁকনিটা বোটে রেখে দাও। পাটাতনের নিচে তিনি নিজেই শেষে ছাঁকনিটা রাখার সময় বলেছিলেন, দেখে নাও কোথায় রাখলাম। অয়েল-ব্যাগের পাশে থাকল।

বনির গভীর আস্থা ছোটবাবুর উপর। সে তো বোটে ওঠার সময় বুঝতেই পারেনি, অজানা সমুদ্রে বাবা তাদের ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

অতীশ অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বলল, ছোটবাবু তুমি জানতে—অথচ বনিকে বোটে ওঠার সময় কিছু বলনি। বনির শরীরের প্রতি তোমার তীব্র আগ্রহ—তুমি ভেবেছিলে—সেই অসীম জলরাশির মধ্যে যে ক'দিন বেঁচে থাকা, সবটাই এক সৌন্দর্যময় জগৎ, নারীর রমণীয় শরীর এবং কোনো ঝড় উল্কাপাতের চেয়েও তার আকর্ষণ কত বেশি, তোমার চোখ মুখ দেখে আমি টের পেয়েছিলাম।

—অতীশ বোঝে না, কেন যে মাঝে মাঝে ছোটবাবুর সঙ্গে এই রহস্যময় লড়ালড়ি শুরু হয়।

ছোটবাবু বলল, দেখ অতীশ, বনির আগ্রহই আমাকে অধীর করে রেখে-ছিল। ওর আগ্রহ না থাকলে, জাহাজে জোর করে থেকে যেতে পারতাম। কাপ্তানের নির্দেশ অমান্য করতে পারতাম—বনি ডাঙায় উঠে যাবার জন্য সব

সময় দূরবীন চোখে নিয়ে বসে থাকত। জাহাজ আমাদের ভাসছে। জাহাজ ক্রমে অজানা সমুদ্রে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি নিরুপায় ছিলেন। আর জাহাজে থাকলেই কী হত। চাল, ময়দা যা ছিল, তিনি বোটে তুলে দিয়েছেন। মিষ্টি জল সবটাই ড্রামে ভর্তি করে র‍্যাফটে দিয়ে দিয়েছিলেন—বনি টের পেলে কান্নাকাটি করবে। রাতের অন্ধকারে আমরা কাজ করেছিলাম। বনি কেবিনে ঘুমোচ্ছে—বনিকে বুঝতেই দেওয়া হয়নি তাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। তুমি তো জানো অতীশবাবু, কাপ্তানের কী মেজাজ।

মাঝে মাঝে এটা হয়। যেন অতীশ আর ছোটবাবু আলাদা অস্তিত্ব। অতীশ নিজেই জাহাজের ছোটবাবু বিশ্বাস করতে পারে না। এ-যেন অন্য জন্মের ইতিহাস।

আর তখনই অতীশ ক্ষেপে ওঠে।—ছোটবাবু, তুমি স্বার্থপর।

—কেন এ কথা বলছ!

—নিরীহ মেয়েটা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী না করেছে! সে খেল কী খেল না দেখনি?

—দেখেছি। ও তো বলতো ওতেই ওর হয়ে যাবে। বেশি খেতে পারে না।

—যখন খাবার ফুরিয়ে গেল, তুমি প্ল্যাংকটন খেতে। ওকে খাওয়াতে পারলে না কেন? খেতে পারলে ও ঠিক তোমার মতো ডাঙা পেয়ে যেত।

—কম চেষ্টা করেছি! ও বমি করে সব ফেলে দিত। প্ল্যাংকটন দেখলেই ওর ওয়াক উঠে আসত। না পেরে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করেছি। বনির তখন এক কথা, আমাকে মেরে ফেলতে চাও! তখন কার না রাগ হয়!

—তুমি বললে না কেন ছোটবাবু, বনি, তুমি না খেলে আমিও না খেয়ে থাকব। তুমি না খেয়ে বোটে মরে পড়ে থাকবে, আমি তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে ভেসে বেড়াব সেটা ভাবছ কী করে!

আর অতীশ তখনই দেখল ছোটবাবু কখন আবার তার শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। সে-ই ছোটবাবু—মরীচিকা তখন, সারারাত দু'জনই জেগে দেখল একটা জাহাজ তাদের উদ্ধার করতে আসছে।

বনি চিৎকার করছে—আসছে আসছে ছোটবাবু। ঐ দেখ, আলো জ্বলছে। ঐ দেখ, অন্ধকার সরে গেছে। সিগনেলিং টর্চটা কোথায়? ইস্ তুমি যে কী না ছোটবাবু, কোথায় সব রাখো দরকারমতো আর পাওয়া যায় না।

—আমি রেখেছি, না তুমি রেখেছ!

বনি জিভ কামড়ে বলল, ইস্ ভুলেই গেছি। আর সিগনেলিং টর্চ জ্বাললেই অন্ধকারে জাহাজের আলো বাতাসে মিশে যেত। সারা রাত এবং দিনের বেলাতেও মাঝে মাঝে বনি কি দেখে যে চিৎকার করে উঠত—ছোটবাবু—রকেট

প্যারাসুট ছাড়। ওরা দেখতে পাচ্ছে না। বনি হাত তুলে গাউন উঁড়িয়ে দিত। তারপরই ছোটবাবু দেখতে পেত, একটা জাহাজ সত্যি এগিয়ে আসছে।

জাহাজটা চলে যাচ্ছে ছোটবাবু কী হবে!

জাহাজটা সহসা সমুদ্রে ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোটবাবু দমে গেল। সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে পাটাতনে। বনি পাশে বসে, ডাকছে, ছোটবাবু ওঠো। আবার জাহাজ আসবে। উই আর ইনোসেন্ট। গড সেভস দ্য ফাদারলেস অ্যান্ড দ্য পুওর ফ্রম দ্য গ্র্যাসপ অফ দিজ অপ্রেসার।

পালে বাতাস আছে তখনও। বোট চলছে। পাঁচ সাতশ মাইলের মধ্যে দুটো দ্বীপ পেয়ে যাবার কথা। পালে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু এসে জোর ধাক্কা মারছে। কথামতো ৯০ ডিগ্রি বরাবর কম্পাসের কাঁটা বাঁধা। জোর হাওয়া দিচ্ছে ক'দিন থেকে। নীল জলে অজস্র তরঙ্গমালা উঠছে, নাচছে, অজস্র কুরচি ফুলের মতো সাদা ফেনায় ঢেউয়ের মাথা ঢেকে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে মিশে গিয়ে নীল জলরাশি হয়ে যাচ্ছে। বোট উঠছে নামছে। পুরো দশ দিন বোট চালাবার পর প্রথম মরীচিকা। এলিস দ্বীপের পাত্তা নেই।

বনি হাঁটু গেড়ে বসে ভাবছে, এই ছোটবাবু, কী হল!

—জাহাজটা চলে গেল! আর দেখা যাচ্ছে না।

—বনি!

—বল।

—জাহাজটা সারারাত ভেসে থাকল। দিনের বেলাতেও দেখেছ জাহাজটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—ছিল তো।

—আমাদের তুলে নিল না কেন!

—মনে হয় দেখতে পায়নি।

—কী বলছ, এত কাছে দেখতে পায়নি!

—দেখতে পেলে তুলে নিত না!

ছোটবাবু মনের জোর হারিয়ে ফেলছে। বনি এবারে চুমু খেল। বলল, খাবে না!

—কী খাব? —আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

—ডাকব এলবাকে!

তখন যত নালিশ বনির এলবার কাছে। আলবাট্রস পাখিটা বোট ছাড়ছে না। জাহাজের মাস্তুল থেকে উড়ে এসে এতদিন যেন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই পাখিটাও কাল থেকে বোটের গলুইতে বসে থাকছে। ঠোঁট পাখার মধ্যে গুঁজে দিয়ে কেবল ঘুমাচ্ছে। খিদে পেলে উড়ে যাচ্ছে

সমুদ্রে। দুটো একটা মাছ খেয়ে সমুদ্রে, ঢেউয়ের উপর ভেসে থেকেছে, ডুবে ডুবে স্নান করছে আবার উড়ে এসে বোটের গলুইতে বসে পাখা ঝাড়ছে। ঠুকরে ঠুকরে পাখা থেকে শরীর থেকে নোনা জল ঝেড়ে ফেলে কক কক করে ডেকে উঠছে।

—এই ওঠো। আজ দেখবে কী সুন্দর পোশাক পরে আমি সাজব। জ্যোৎস্না রাত। কী ভাল লাগে! তোমার ভাল লাগে না!

আকাঙ্ক্ষা শরীরে, কত রকমের উষ্ণতার খেলা শরীরে—কত ভাবে বনি যে ছোটবাবুর কাছে ধরা দিচ্ছে! যেন এই নিরুপায় সমুদ্রে বনি তার শরীরের উষ্ণতা দিয়ে ছোটবাবুর মধ্যে বেঁচে থাকার উত্তাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। মসৃণ নরম হাত, উরুর কোমল স্পর্শ, নাভিমূলে বর্ণময় দ্বীপ, যার মধ্যে ছোটবাবুর অমৃত অবগাহন। সব যখন মেলে দেয়, ছোটবাবু তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। তছনছ করে ফেলে বনিকে। ছোটবাবু যা যা চায়, সে সব দিয়ে বলে, এবারে এস খাবে।

বনি আজও সে-ভাবে পাশে শুয়ে পড়ল। হাঁটু তুলে বলল, আমার আর কী থাকল ছোটবাবু। তুমি ভেঙে পড়লে আমি যাব কোথায়! তুমি কেন বললে না আগে, তুমি কেন গোপন করে গেলে? তুমি জানতে সব। আমি একা কী করব? তোমরা সবাই আমার সঙ্গে ছলনা করেছ। বাবা আমাদের বোটে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ডাঙা যদি পাই, ভাসতে ভাসতে যদি ডাঙায় আমাদের বোট কোনোদিন পেঁছে যায়—বাবা কাছে থাকলে এত ভয় থাকত না!

ছোটবাবু লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। বনি ভেঙে পড়লে সব গেল। সে বলল, আমারও মনে হয় জাহাজটা আমাদের দেখতে পায়নি।

কিন্তু সংশয় মনে, জাহাজটার কাছাকাছি যাবার যত চেষ্টা করেছে, দেখেছে দূরে আরও দূরে জাহাজ সরে যাচ্ছে। আবার মনে হয়েছে, এই তো সামনে, মাইলখানেকও হবে না—তবে সমুদ্রের দূরত্ব মাপা বড় কঠিন। মনে হয় খুব কাছে, কিন্তু গেলে বোঝা যায়, অনেক দূর, জাহাজটা মরীচিকা ভাবতে ছোট-বাবুরও কষ্ট হয়। শয়তানের পাল্লায় পড়ে গিয়ে থাকে যদি। আর্চির প্রেতাত্মা জাহাজ হয়ে গিয়ে ছলনা করতে পারে। আর্চির প্রেতাত্মা তাদের অজানা সমুদ্রে একা পেয়ে কখন গলা টিপে ধরবে কে জানে! সে তবু বনির কাতর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, দাও।

বনি হুডের নিচে চলে গেল। দুটো প্লেট বের করে খোসাসুদ্ধু দুটো বড় আলু প্লেটে রাখল। একটু নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও। বোট প্রচণ্ড দুলছে।

বোট দুলছে বলে ছোটবাবু প্লেটটা দু-হাঁটুর ফাঁকে রেখে, একটা আস্ত আলু বনিকে দিল। খাও।

—আমি খেয়েছি।

—কখন?

—কেন এই মাত্র।

—মিছে কথা বনি! তুমি খাওনি।

বনির ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। —তোমাকে মিছে কথা বলব কেন! আচ্ছা ডাঙা পেলে আমরা উঠে কী করব প্রথম বলতো! আসলে বনি তার খাওয়ার বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চায়।

—কী করব?

—বোটটা বালিয়াড়িতে রেখে উঠে যাব। মিষ্টি জলের হ্রদ পেলে আমরা স্নান করব। গাছটাছ থাকবে কী বল! নারকেল গাছ!

—থাকার কথা।

—আর কিছু না থাক, নারকেল গাছ হলেই হবে। ডাঙায় কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে রেখে যাবে। ডিম ভাজা—ওতেই যথেষ্ট। কী বল!

—তুমি খাবে কি না বল?

—কী যে কর না? দাও। তাই বলে একটা আস্ত আলু! তুমি খাবে কী? সারাটা দিন কী খাটুনি যায়! আমি অত খেতে পারব না। তুমি আমার পেছনে এত লেগে থাক কেন বল তো! বলছি, আমি খেয়েছি!

অতীশ মাথা নিচু করে বসে আছে। সত্যি তারা তিনজন মিলেই বনিকে ছলনা করেছে। বনিকে বোঝানো হয়েছিল, ছোটবাবু বোট নিয়ে ডাঙার খোঁজে যাচ্ছে। বেশিদূর না। সে একা গেলে ভাল দেখায় না। তিন চারশ মাইলের মধ্যেই এলিস দ্বীপ। সেখানে মানুষজনদের খবর দিতে হবে—একটা জাহাজ অচল হয়ে পড়ে আছে সমুদ্রে। জাহাজ ভেসে আছে। বুড়ো কাপ্তান, সারেঙসাব আটকা পড়েছেন। তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে।

বনিকে এমন না বোঝালে বাবাকে ছেড়ে আসত কি না সংশয় ছিল। ছোট-বাবু বলল, ছলনা না করে উপায় ছিল না বনি।

বনি কেমন মুখ ভার করে ফেলল। বলল, তুমি ছলনা করেছ বলেছি! তুমি ছাড়া আমার কে আছে! তুমি অজানা সমুদ্রে ভেসে যেতে পারবে, আমি পারব না ভাবলে কী করে! রাগের মাথায় কখন কী বলি, সেটা ধরে বসে আছ! বনির চোখ অভিমানে ছলছল করছে।

বনির চোখ অভিমানে ছলছল করতে থাকলে ছোটবাবু কেমন আরও ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। চারপাশে তাকায়। খড়কুটো অবলম্বনের মতো সমুদ্রের কোথাও এক টুকরো ডাঙার জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সামান্য ডাঙা, কোনো দ্বীপ-টীপ, হোক বালিয়াড়ি কিংবা শুধু কাঁটা ফণিমনসার গাছ নিয়ে একটা অতি ক্ষুদ্র কচ্ছপের পিঠের মতো দ্বীপ—যতই আবাসের অযোগ্য হোক—পাশে

বনি থাকলে সে দ্বীপটাকে মানুষের আবাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে—বনি তার সাহস, প্রেরণা, বনি ছাড়া পৃথিবীতে তার জন্য আর কেউ অপেক্ষা করে আছে মনে করতে পারে না। সুদূরে কেউ লম্ফ জেলে রাত জাগতে পারে নিখোঁজ পুত্রের আশায়, এটাও সে মনে করতে পারত না। জীবন বিপন্ন, এবং শুধু সমুদ্রের বিভীষিকা ছাড়া চারপাশে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। সবচেয়ে ভয় শান্ত নিরীহ সমুদ্রের নিঃসঙ্গতা—কী সব আধিভৌতিক আবছা অন্ধকারে সমুদ্রের গভীর তলদেশ ডাইনির কালরহস্য নিয়ে জেগে থাকে। পালে হাওয়া থাকে না। নিথর সমুদ্রে বোট স্থির। মাঝে মাঝে দূরে অদূরে কোনো মনস্টার দাপিয়ে বেড়ালে ওরা দুজনে কেমন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। শুধু সেই দাপাদাপি দেখতে দেখতে মনে হয় সহস্র অজগর একসঙ্গে জলের নিচে ফুঁসছে। ঝড়ের সমুদ্রে এ-সব টের পাওয়া যায় না। পালে জোর বাতাস এসে ধাক্কা মারে, বোট তখন দুরন্ত অশ্বের মতো বেগবান হয়ে যায়। দুজনের মধ্যে হৈ-হল্লা, জলের ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বোটের হুড তুলে দেওয়া হয়। ছইয়ের মতো কাজ করে। ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে বোটের গায়, বড় সতর্কতায় ঢেউয়ের উপর দিয়ে বোট ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হয়—আসলে বিপাকে পড়ে লড়ে যাওয়ার মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা থাকে। সমুদ্র নিথর হয়ে গেলে তাও থাকে না। তখন যত রাজ্যের আতঙ্ক তাদের কাবু করে ফেলে। সে দেখতে পায় এক পুরুষ, দীর্ঘকায় হয়ে সমুদ্রের দূরে দাঁড়িয়ে বোট মাথায় করে এগুচ্ছে। সমুদ্রের জল ডিঙিয়ে মানুষটা কোথাও যেতে চায়—পাশে এক নারী হাতে পোঁটলা পুঁটলি পুরুষকে অনুসরণ করছে।

আর তখনই কে ডাকছে।—বাবা ওঠো। ও বাবা!

জেঠিমার গলা পেল, সোনা ওঠ। কত বেলা হল!

অতীশ ধড়ফড় করে উঠে বসল। বিশ্বাসই করতে পারছ না, মিণ্টু ডাকছে! যেন সে সমুদ্রেই ভেসে যাচ্ছে। টেবিল ছেড়ে কখন শুয়েছে, আর ভোর রাতে বনিকে স্বপ্ন দেখছে, সেই বোট, সেই দড়িদড়া, সেই অ্যালবাট্রস পাখিটা—তার যেন আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বনির কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি চটি গলিয়ে মশারির ভেতর থেকে বাইরে বের হয়ে বলল, কত বেলা হয়ে গেছে! বাথরুমে যাবার আগে এক কাপ চা খাবার অভ্যাস, এক গ্লাস জল। সে দেখছে জেঠিমা হাতে জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে।
—মিণ্টুর নাকি স্কুল আছে!

অতীশ বুঝতে পারল, এ ক'দিন সে চোখের পাতা এক করতে পারেনি। আজ সে ঘুমিয়েছে। ঘুমের গভীরে বনিকে সে কতদিন পর যেন খুব কাছাকাছি পেয়ে গেছিল। এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না, এটা এক

রাজবাড়ি, সে রাজবাড়ির এক লোকসানের কারখানার ম্যানেজার। টুটুল মিণ্টু তার সন্তান। নির্মলা তার স্ত্রী। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না জেঠিমা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার চিঠি আসার কথা।

বনির চুলের গন্ধ পর্যন্ত সে যেন এখনও টের পাচ্ছে।

অতীশ বলল, মিণ্টু সেদ্ধ ভাত খেয়ে যাবে।

—তোর অফিস ক'টায়?

—নটায়।

অতীশ কথা বলছে আর দাঁত মাজছে। মিণ্টুকে বলল, তোর টাস্ক দেখি। মিণ্টু বাবার কাছে বইয়ের বাক্স এনে হাঁটু গেড়ে বসল। খাতা বের করছে—সেই বনির মত মেয়ে ববকাট চুল—পেছন থেকে মিণ্টুকে বালিকা বনি ভাবতে এতটুকু কষ্ট হয় না। মেয়েরা পৃথিবীতে সব বুঝি একরকমের। সবুজ দ্বীপে সোনার হরিণ—গোটা জীবনটাই মরীচিকা এমন মনে হল মিণ্টুর খাতা দেখতে দেখতে। বলল, চারটে বানান দেখছি ভুল করেছ। দশবার করে লিখতে বলেছে। লিখে ফেল। আমি বাথরুম থেকে আসছি। জেঠিমাকে বলল, বাজার থেকে কী আনব?

অর্জুন গাছটা এখন কত বড় হয়েছে কে জানে!

জেঠিমা মশারির দড়ি খুলছিলেন। বললেন, বাজারে গন্ধপাঁদাল পাতা পাওয়া যায়?

—কলকাতায় সব পাওয়া যায়।

—শুনেছি, বাঘের দুধও নাকি পাওয়া যায়।

—যায় শুনেছি, তবে সেটা কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

অতীশের মনে হল জেঠিমা বোধহয় বাঘের দুধও দেখতে চাইতে পারেন! জেঠিমার যে এ-শহর সম্পর্কে ভারি কৌতূহল আছে সেটা সে জানে। জেঠিমার শৈশব এ-শহরে কেটেছে। তিন চার যুগের আগের কথা। সেই শহরটা পাল্টে গেছে। তখন বাঘের দুধ পাওয়া যেত না। এখন তিনি শুনে এসেছেন তাও পাওয়া যায়। এই শহরে এসে বড় জ্যাঠামশাই যৌবনে পাগল হয়ে যান। অতীশ নিজেও ফোর্ট-উইলিয়মের পাশ দিয়ে একদিন বাবুঘাটের দিকে যাবার সময় ভেবেছিল, এই মাঠেই হয়ত জ্যাঠামশাই সেই এক ইংরেজ যুবতীকে নিয়ে কতদিন হেঁটে গেছেন। বসে গল্প করেছেন। কত বছর আগে কে জানে, তখন একই ভাবে এই শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে, শরতের হাওয়া বয়ে গেছে, শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে শহরটা রাতে ঘুমিয়ে থাকত। এখনও তাই। কিংবা উড়ত হাজার কিসিমের পাখি—চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু এবং জাদুঘর, সব এক রকমের ছিল—শুধু জ্যাঠামশাই নিখোঁজ। এই শহর সম্পর্কে বাবারও কম আশংকা নয়। কারণ বাবা কী টের পান তাঁর বড়দা এই শহরে এসেই সংসার

থেকে আলাদা মানুষ হয়ে গেলেন! বাড়ির কথা ভুলে গেছিলেন, সেই ইংরেজ যুবতীর খপ্পরে পড়ে তার দাদার মস্তিষ্ক বিকৃতি, এই শহরের নামে বদনাম দিতে কেউ এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না। জেঠিমা কি একদিন বলে বসবেন, আমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবি বাবা! আমি দেখতে চাই। গড়ের মাঠে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি! গঙ্গার ধারে মাঠ। তিনি তো মাঝে মাঝে একেবারে সরল সোজা মানুষ হয়ে যেতেন। তোর বড়দা না হলে আমার পেটে আসে কী করে!

অতীশ দাঁত মাজছিল—কত রকমের ভাবনা সহসা এই মস্তিষ্কের কোষে কোষে খেলে যায়।

চারু তাকে আর এক বিড়ম্বনায় ফেলে গেছে।

সে জানতে চায় সত্যি চারু বলে, চারুহাসিনী সেই যুবতী এই কলকাতার কোথাও আছে কি না। না ঘোরের মধ্যে পড়ে সে এমন দেখেছে। চারুর সঙ্গে তার যে আসলে দেখাই হয়নি, চারু বলে সেই সুন্দর শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী যুবতী আর এক মরীচিকা নয় কে বলবে! কিন্তু বিভ্রম থেকে এমন হয় সে বিশ্বাস করবে কি করে! চারুর সঙ্গে সহবাসের স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

এই একটা পাপবোধ তাকে নিরন্তর দগ্ধাচ্ছে। যেন সে এক ট্রেনে চড়ে স্টেশনের পর স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এক একটা স্টেশন স্মৃতি হয়ে আছে তার। সেই গোপাট, অশ্বথ গাছ, ফতিমা, ঈশম দাদা, ফকির সাব, জোটন, জালালি সব এক স্টেশনের বাসিন্দা। কে কোথায় আছে এখন সে জানে না। ফতিমা এখন যুবতী, একবার ইচ্ছে হয় সে ছুটি নিয়ে তার ফেলে আসা দেশ ঘুরে দেখে আসবে। তারপর মনে হয়, আসলে গাছপালা আর আগের মতো নেই—অর্জুন গাছটা এখন কত বড় হয়েছে কে জানে! সেই লেখাটা, পাগল জ্যাঠামশাইর নামে সে একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল, "জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি। ইতি—সোনা।" বড় অক্ষরে গাছে খোদাই করে লিখে রেখে এসেছিল। জ্যাঠামশাইর যদি কোনোদিন বাড়ির কথা মনে হয়, যদি ফিরে আসেন, দেখবেন, ঘরবাড়ি কিছু নেই। বাড়ির মানুষ-জন হাওয়া। তিনি ঠিক তখন একা গাছের নিচে চুপচাপ বসে থাকবেন। ভাববেন, আসলে এটাই তাঁর সঠিক ঠিকানা ছিল কি না—না অন্য কোনো গ্রহে এসে উঠেছেন। যাতে জ্যাঠামশাই বুঝতে পারেন, সবাই হিন্দুস্থানে চলে গেছে, সেজন্য সে গাছের কাণ্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখে এসেছিল। এখন নিজের ছেলেমানুষির কথা ভেবে ভারি হাসি পায়। অথচ সে-জীবনে, এর চেয়ে বড় সত্য তার কাছে আর কিছু ছিল না।

সে তাড়াতাড়ি জামা পাল্টে পাজামা পরে বলল, টুটুল, যাও খেলগে।

দিদির সুটকেস হাঁটকাবে না। কী লিখেছিস!

মিণ্টু তক্তপোশের উপর বসে হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে লিখছে।—এই যে লিখছি! দেখতে পাচ্ছ না!

টুটুল উবু হয়ে দেখছে।

অতীশ ব্যাগ হাতে নিয়ে বের হবার সময় বলল, আমি আসছি। ভাতটা বসিয়ে দিন জেঠিমা।

জেঠিমা কত সকালে উঠেছেন, এখন সে টের পেল। এক হাতে ঘর-দোর ঝাঁট দিয়েছেন, মুছেছেন রান্নাঘরটার লণ্ডভণ্ড অবস্থা আর নেই। সব কিছু কী ছিমছাম! শুধু একবার অতীশ ঘরে উঁকি দিলে বলেছিলেন, এখানে বাবা একটা তাক করিয়ে নিস। জিনিসপত্র রাখতে সুবিধা হবে। বিকেলে আমি কিন্তু বৌমাকে দেখতে যাব। নিয়ে যাস বাবা।

অতীশ বের হয়ে গেল জেঠিমার কথা শুনতে শুনতে।

সিঁড়ি থেকে নামতেই দেখল, দুমবার হন্তদন্ত হয়ে আসছে। তাকে দেখে আরও জোরে জোরে ছুটছে। কাছে এসে বলল, বৌ-রাণীমা অফিস যাবার আগে দেখা করে যেতে বললেন।

অতীশের দাঁড়াবার সময় নেই। এদিকটায় সকাল বেলা লোকজন থাকে না। কিছু ফুলের গাছ। রক্তকরবীর গাছটার পাশ দিয়ে সে হেঁটে গেল। মেস-বাড়ির সিঁড়িতে কুম্ভবাবু বসে দাঁতন করছে। তাকে দেখেই বলল, বৌদি কেমন আছে?

অতীশ আজ অনেকটা হাল্কা। জেঠিমা আসায় আরও হাল্কা। সে বলল, অফিস যেতে দেরি হবে। বৌ-রাণী দেখা করে যেতে বললেন।

কুম্ভবাবুর সে উপরওয়ালা, কথাবার্তায় মনেই হবে না। বৌ-রাণী দেখা করে যেতে বলেছেন কি বলেন নি সে জানতে চায়নি। সে অতীশবাবুর স্ত্রীর খবর জানতে চেয়েছে। এই একটা মজা আছে কুম্ভবাবুর অতীশকে নিয়ে। অতীশ যত বিপাকে পড়বে তত তার মজা। বৌ-রাণী কাল হাসপাতালে গেছিলেন খবরটাও রাজবাড়িতে চাউর হয়ে গেছে। কুম্ভর বাবা কুমার বাহাদুরের বাবার আমলের আমলা। তার একটা এমনিতেই জোর আছে, কুম্ভ ভাবে। এই লোকটা এসে বাড়ির আদব কায়দা ভেঙে সব তছনছ করে দিচ্ছে। বৌ-রাণীর আসকারাতে সব হচ্ছে। কুম্ভ দেখল, অতীশবাবু চলে যাচ্ছেন। বৌদি কেমন আছে প্রশ্নের কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করছেন না।

কুম্ভ এবার দৌড়ে গেল। এই লোকটাকে পাঁকে ফেলে দেবার সে যত চেষ্টা করছে তত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। চারুকে সেই পাঠিয়েছিল। সে আর পিয়ারিলাল দু-নম্বরী মালের সাপ্লাই আবার চালু করার জন্য পিয়ারিলালের

ভাইঝি সাজিয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তুলে দিয়েছিল। কোথায় ভেবেছিল, চারুকে আর বাবুকে নিয়ে গোপন একটা কেচ্ছা গড়ে তুলবে, এখন সেই বাবুই তাকে বলছে, চারু বলে কাউকে চেনেন! রাতের ট্রেনে তুলে দেবার সময় কুম্ভ সঙ্গে ছিল না। সে পিয়ারিলালকে বলেছিল, যে দেবতা যাতে তুষ্ট। বৌটা অসুস্থ, তাগড়া জোয়ান, বৌ অসুস্থ থাকলে মেজাজ ঠিক থাকবে কেন! তোমার পাউডার কারখানার চারুকে দেখ ধরিয়ে দিতে পার কি না। তুমি তো বলে থাক চারু অসাধ্যসাধন করতে পারে।

কুম্ভও বিশ্বাস করে, চারু অসাধ্যসাধন করতে পারে। বেশ্যা মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই। কিন্তু সেই চারু এখন কিছু বলছে না। রাতের ট্রেনে কামরা খালি—বাবুটি কিছু করেনি বিশ্বাস করতে পারে না। এদিকে দেশ থেকে ফিরেই চারু চারু করে মাথা খারাপ। এ-ক'দিন হাসপাতাল আর বাড়ি করতে হয়েছে বলে, চারুর কথা মনে ওঠেনি। কিন্তু কাবুলকে বলেছে, চারু বলে কাউকে চেনেন? কাবুল কুমার বাহাদুরের মামাতো ভাই, বৌ-রাণীর দোসর, দোসর রাজার কাছের লোক, সেই তবে বৌ-রাণীর কানে তুলে দেবে। সে-জন্য কুম্ভ আর দেরি করেনি।

কাবুল এই রাজবাড়িতে তার সঙ্গে বড় হয়েছে, একসঙ্গে মাঠে খেলেছে, গোবর্ধনের মেয়েটাকে বাগানে ফেলে রাতে দু'জনে ভাগাভাগি করে দেখেছে, দু'জনের এত ভাব, এবং এই ভাবটার উপর ভরসা করেই কুম্ভ কাবুলকে, বলেছে, কী বিড়ম্বনা মাইরি, ছুটি কাটিয়ে বাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন আর এক বাই—চারুকে চিনি কি না! আমি চারুকে চিনব কেন! কোন চারু, কে চারু—কিন্তু এক কথা, সারিগাছিতে চারু ভোর রাতে হারিয়ে গেল। বাথরুমে যাবে বলে গেল, সারিগাছি স্টেশনে দেখে চারু নেই। পিয়ারিলালকে ফোন করেছিল, ভাগ্যিস পায়নি। বার বার এক কথা, চারু ঠিকমতো পেঁছেছে? ওর তো বহরমপুরে বাবার কাছে যাবার কথা!

কুম্ভ বলল, দাদা আমরা না হয় আপনার কেউ না। তবে মানুষ তো। বৌদি কেমন আছে বললেন না?

—ভাল আছে। আজ ভাত পথ্য দেবে।

কুম্ভর মুখ থেকে শালা কথাটা বের হয়ে যাচ্ছিল। বেজম্মার বাচ্চা, তাই এত অবহেলা। বিপদ কেটে গেছে। সে বলল, কাল একবার দেখতে যাব ভাবলাম, হয়ে উঠল না। বৌদি কী না ভাবছে!

অতীশ মনে মনে হাসল। বৌদির জন্য প্রাণ কাঁদছে! তবে অতীশ দেখেছে, নির্মলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কুম্ভবাবুই সবচাইতে বেশি ছোটাছুটি করেছে। কাবুলকে দিয়ে গাড়ি বের করিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাস-পাতাল পেঁছে দিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি বাজার সেরে ফিরে এল। মিণ্টুকে স্কুলে দিয়ে এল। অফিস যাবার মুখে জেঠিমাকে বলল, দরজায় তালা দিয়ে দিন। টুটুলের পুকুরে যাবার বড় বাই। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ির জলে উবু হয়ে বেলে মাছ খোঁজে। দু দিন ধরে দিয়ে গেছে সুখী।

টুটুলের সঙ্গে জেঠিমার ভাব হয়ে গেছে। সে বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেছিল, জেঠিমা টুটুলকে কোলে নিয়ে সব হাতের কাজকর্ম সারছেন।

অতীশ বলেছিল, ধেড়ে খোকা, কোলে, কী লজ্জা কী লজ্জা!

টুটুল জেঠিমার আরও সংলগ্ন হয়ে তখন মিশে যেতে চেয়েছিল।

অতীশ বুঝতে পারে, টুটুলের মা তার কাছে আসার পরই বুঝেছে সত্যি জলে পড়ে গেছে। একটা ভাঙা ঝরঝরে কারখানার ম্যানেজার, মাইনেও তেমনি, কুমার বাহাদুরের মর্জির উপর চাকরি থাকা না থাকা, এ-সব ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। বাপের বাড়ি গেলে নির্মলা এটা আরও বেশি টের পায়! বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে, অতীশ দেখেছে, নির্মলার মুখ ব্যাজার। ভিতরে তার অতীব এক নিরাপত্তার অভাব—এই অভাববোধ থেকেই ক্রমে সে কেমন যেন ক্ষীণকায় হয়ে গেল। কাজে কর্মে উৎসাহ পায় না। সংসারটা তার কাছে ভারবাহী জন্তুর মতো। টুটুল মিণ্টুর আদর যত্নের বড় অভাব। জেঠিমার কোলে টুটুলকে দেখে অতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাইরে বের হয়ে সোজা সে চলে গেল রাজবাড়ির অফিসে। আটটায় বৌ-রাণী নামেন। অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক তার রোজ সকালেই কী কাজ থাকে জানে না! তারপর একে একে অন্য আমলাদের ডাক পড়বে। বৌ-রাণীর খাস বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে আসছে যাচ্ছে। শঙ্খকে সে বলে রেখেছে, খবর দিও আমি আছি।

শঙ্খের এক কথা, একটু বসতে বলেছেন বৌ-রাণীমা।

অতীশকে পার হয়েই আমলাদের বৌ-রাণীর ঘরে যেতে হচ্ছে। ওকে দেখে সবারই এক প্রশ্ন, বৌমা এখন কেমন! এই একটা প্রশ্নের জবাব ক'দিন থেকে হাজার বার দিতে হচ্ছে। আজ যেন একটু বেশি। বিশেষ করে বৌ-রাণী গতকাল স্বয়ং নিজে দেখতে যাওয়ায় এ-বাড়িতে খবরটা আরও যেন বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেছে।

এখানে আসার পরই সে লক্ষ্য করেছে, সবাই তার খোঁজখবর নেবার জন্য ব্যস্ত। সে বুঝতে পারে বৌ-রাণীর সে পেয়ারের লোক বলেই এটা হয়—এখন এই ঘরটায়, ঘর বলা ঠিক কিনা বুঝতে পারে না—কারণ প্রাসাদের বিশাল বারান্দা থেকে এ-ঘরের দূরত্ব যেন যোজন প্রমাণ। বিশাল হলঘরের মতো বসার ঘর, বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, একদিকে পার্টিসান করা অফিস, রাজার স্থাবর সম্পত্তি কত কুমারবাহাদুর নিজেও হয়তো ভাল জানেন না। দেশের রাজ-

নৈতিক পরিস্থিতি দিনকে দিন যা দাঁড়াচ্ছে তাতে এত সম্পত্তি রাখা দুষ্কর। এমনিতেই কুমারদহের বড় বড় আমবাগান সব জবর দখল হয়ে যাচ্ছে। কোর্ট কাছারি করার আলাদা দপ্তর। সদরে, এবং এমন কি এই শহরে আদালতে অসংখ্য মামলা। লিজ নিয়ে মামলা, বাড়ি ভাড়া নিয়ে মামলা, একটা দপ্তর আছে যাদের কাজই হল ভাড়া তোলা—আর মামলার তদারকি করা। পুরো খালাসি বাগান বস্তিটা রাজার—টেনেন্সি রাইট—আইন-কানুন বছর বছর পাল্টে যাচ্ছে—বৌ-রাণীকে একা সব সামলাতে হয়। কুমারবাহাদুর বছরের কিছুটা সময় বিদেশে কাটান। একটু হাত খালি না হলে তাকে ডাকতে পারছে না। কেন এই তলব সে বুঝতে পারছে না। নতুন শেয়ার ফ্লোট করা হবে, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে যদি তাকে ডাকত, সঙ্গে কুন্তবাবুকেও আসতে বলত। কুন্তবাবু কারখানার পুরানো লোক—এ-সব বিষয়ে তার মাথা বেশি পরিষ্কার। কেন যে তলব সে বুঝতে পারছে না।

বিলিয়ার্ড স্টিকগুলো এক কোণায় জমা। ছোট বড়, অনেক কিসিমের স্টিক। সবই আছে। অথচ এই ঘরে কখনও কাউকে খেলায় অংশ নিতে দেখেনি। শুধু স্টিকগুলি গোল রিঙের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কোনো চিত্রকরের মতো।

আসলে স্মৃতি ধরে রাখা। রাজকীয় বনেদিয়ানা যতটা পারা যায় একটা শক্ত পাথরের মতো পাহাড়ের উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া। ওটা যে গড়াতে পারে এরা বিশ্বাস করতে চায় না। কিংবা বিশ্বাস করলেও থাবড়া মেরে আটকে রাখার মতো। ঝাড়লণ্ঠন, আর সেই সুঘ্রাণ আগেকার মতোই আছে। বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে উঁচু মতো আসনটায় অতীশ যেন এখন আর এক কাঙাল রাজা। সে বসে আছে, তার ডাক কখন পড়বে বুঝতে পারছে না!

পর পর হলঘরের মতো সব ঘরে, কোনোটায় গোল শ্বেতপাথরের টেবিল, হাল আমলের কুশন আঁটা শোফাসেট, এবং সেই সব ঘড়ি পুরানো আমলের-জলতরঙ্গ বাজনা শোনা যায়, সোনার জলে কাজ করা, দেয়ালে বিশাল সব তৈলচিত্র। রাজার এবং তার পূর্বপুরুষদের। মাথায় উষ্ণীষ—নবাব সিরাজের ছবি সে ইতিহাসের বইয়ে দেখেছে। হুবহু সেই রকম পোশাকে নাগরাই জুতো পরে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে আছেন রাজপুরুষেরা। রাজেনদার বাবার ছবিটাই সে কেন জানি এ-ঘরটায় এলে বেশি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—কী উঁচু লম্বা মানুষটা—আর শুনেছে গায়ের রঙ ছিল পাকা বেলের মতো—রাজার ঐশ্বর্য যেমন তার প্রাসাদ, তেমনি ঐশ্বর্য তার এই সুপুরুষ চেহারা। দুইয়ে না মিশে গেলে রাজত্ব থাকে কী করে! কুমারবাহাদুর অর্থাৎ রাজেনদাকে দেখলে এত বড় রাজার জাতক ভাবতে কষ্ট হয়। রাণীমাকে সে এতদিন অন্দরমহলে থেকেও দেখতে পায়নি। তিনি কাশীবাসী।

রাণীমার রূপের ঐশ্বর্য নিয়েও কিঞ্চিৎ খবর রাখে। ডানাকাটা পরী বয়সকালে, এমন শুনেছে। কুমারবাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ সে যাকে রাজেনদা বলে ডাকে, এই সম্বোধনটাই যে এ-বাড়িতে ঝড় তুলে দিতে পারে এ-পরিবারে কেউ ভাবতে পারেনি। তার লেখালেখির সূত্রে পূর্ব পরিচয়। সেই থেকেই এখানে এসে ওঠা—আগেকার হিসেবটাই আছে—আর তার বেয়াড়া ধরনের গোঁয়ার্তুমির ফলে বিপদ হতে পারে, সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। সে কিছুতেই কুমারবাহাদুর বলতে পারে না, তারপর এই যে বৌ-রাণী—তাকে আবিষ্কার করার পর আর এক সংকট। শৈশবে সংগোপনে এই নারীই তাকে হাত টেনে দেখতে বলেছিল। সে নারী কিনা দেখতে বলেছিল। অন্ধকার পিচ্ছিল এক গহ্বরের মধ্যে অতীশ প্রথম হাত রেখে নারীর উষ্ণতা টের পেয়েছিল।

—বাবু, যান।

শঙ্খ এই একটা কথা বলেই ভিতরের বিশাল পর্দা ঠেলে কোথায় হারিয়ে গেল।

শঙ্খ কি উপরে চলে গেল!

সে বিলিয়ার্ড টেবিলটা পার হয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতর ঢুকল। অন্দরের দিকের বসার ঘর পার হয়ে বৌ-রাণীর দপ্তরে ঢুকে গেল। এবং দেখল বৌ-রাণী সোজা উপরের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে!

সে গলা খাকারি দিল।

চোখ নামালো না।

লাল পেড়ে দামি সিল্ক সাড়ী পরনে। লেভেণ্ডার জাতীয় কোনো সুঘ্রাণ সারা ঘরে। ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বিশাল টেবিলের ভিতর রিভলবিং চেয়ার। পাশে সব বিশাল দেয়াল আলমারি এবং ভেতরে সোনার জলে বাঁধানো ইংরাজি সব ক্লাসিকস। দেখলে মনে হবে সেই ক্লাসিকসের কোনো নায়িকা ঠেলে বের হয়ে এসেছে এবং এই সামনের চেয়ারটাতে বসে আছে। বব করা চুল, নাকে হীরের নাকছাবি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। কানে দুটো দামী পাথর সেট টপ। হাতে সোনার কাজ করা হাতির দাঁতের বালা। হাতের রঙের সঙ্গে এমন মিশে গেছে যে নগ্ন হাত মনে হয় টেবিলটায় ছড়ানো।

অতীশ জানে অমলার মেজাজ সব সময় এক রকমের থাকে না। কখনও এমন ব্যবহার যে অমলা মনে করিয়ে দেয়, এ-বাড়ির বৌ রাণীমা। তখন একটা এমন দূরত্ব সৃষ্টি হয় যে সহজে আর সে তার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ রক্ষা করতে পারে না। কুণ্ঠিত চিত্তে কথাবার্তা, যেন তখন অতীশ পালাতে পারলে বাঁচে।

—তুমি ডেকেছ!

—অঃ তুই, বোস।

—না আর পারা যাবে না! শঙ্খ, শঙ্খ! অতীশ ঠিক বুঝতে পারছে না কাকে লক্ষ্য করে বলা।

শঙ্খ সিঁড়ি ধরে দৌড়ে নেমে আসছে।

এত উত্তেজিত যে কলিং বেল টিপতেও ভুল গেছে অমলা।

শঙ্খ এলে বলল, দেখছিস উপরে! পোকা।

অতীশ লক্ষ্য করল সত্যি বড় একটা পোকা কোথা থেকে উড়ে এসে বসেছে!

উঁচু সিলিং। শঙ্খ পড়ি মরি করে কী আনতে ছুটে গেল। পোকাটা বৌ-রাণীর খাস দপ্তরে কী করে ঢুকে গেল এই নিয়ে এখন মাথা গরম। কাচের জানালা দিয়ে অন্দরমহলের শৌখিন বাগান দেখা যায়। সেখানে দেশী বিদেশী সব ফুলের গাছ। দুটো ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছও আছে। লতানে গোলাপ, এবং উঁচু পাঁচিল দিয়ে এই মহলটাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। বিশাল সব শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্তি বাগানে এবং তার নিচে বেদির মতো বসার জায়গা। পোকাটা তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অমলা তার দিকে তাকাল না। বড় পোকার ভয়। পোকায় কাটছে, পোকার কামড়ে অস্থির যেন। সে যে সামনে বসে আছে অমলার ব্যবহারে তার বিন্দু মাত্র প্রকাশ নেই।

—অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—যাক। বসতে বলছি, বসবি।

আর কিছু বলার থাকে না। শঙ্খ বের হয়ে গেলে আচমকা বৌ-রাণী তাকে দেখল। দেখেই যাচ্ছে। চোখ হিংস্র দেখাচ্ছে।

অতীশ ভয় পেয়ে গেল। এ অমলাকে যেন চেনে না! তার ভিতরে যেন চোখের দৃষ্টি এখন ফণা তুলে আছে।

—চারু কে! বল চারু কে?

সে আমতা আমতা করে বলল, চারু বুঝলে, এই মানে···

—মানে বুঝি না! চারু চারু করে লোকের মাথা খাচ্ছিস! মাথায় তোর কত রকমের পোকা আছে বল! তুই ভাবিস কী! তোর কী মনে হয়! এখানে কাজ করতে আসিসনি! মাথায় এত পোকা ছিল তো এখানে মরতে এলি কেন? কে বলেছিল? কথা নেই বার্তা নেই সারা ঘরে ধূপবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকিস, পচা টাকার গন্ধ পাস—এ-সব কী? আমি এত কথা শুনব! আমার দায় পড়েছে! তুই আমার কে? মানস আর তুই দেখছি এক গোত্রের! তোর দুটো বাচ্চা, বউ হাসপাতালে, তোর বাবা মার সংসার আছে—সবাইকে টেনে তুলতে গেলে ধূপবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকলে হয়! এখন আবার এক চারু!

অতীশ কথা বলছে না, সে গম্ভীর হয়ে গেছে। সে ধূপবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকে, পচা টাকার গন্ধ পায়, আর্চির প্রেতাত্মা তাড়া করে সব ঠিক, এখন নতুন উপদ্রব চারু। সে নিজেও ভেবে পায় না এ-সবের হাত থেকে কী করে রক্ষা পাওয়া যায়। টুটুল মিণ্টুর দিকে তাকালে, মা-বাবা ভাইবোনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে গেলে, মগজ সাফ না রাখলে চলে না।

অমলা ক্ষোভে যেন জ্বলছে। অতীশ সম্পর্কে কোন অভিযোগ এলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। কাল রাতে খাবার টেবিলেই কাবুল বলেছে, কিছু হবার নয় বৌদি। কারখানাটা একটা খ্যাপার হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দিলে! তোমার দ্যাশের পোলা এখন চারুর নামে পাগল।

—বল চারু কে! এই মেনিমুখো বসে আছিস কেন? বাইরে জানাজানি হলে এতে তোর সুনাম বাড়ে! কীরে চুপ করে আছিস কেন? কুম্ভকে বলেছিস, চারুকে চেনেন? কুম্ভর বৌকে বলেছিস, চারুকে তুমি চেন? শুনলে ভাববে কী!

অতীশ বলল, চারু যে আমার সঙ্গে গেল।

—কোথায়?

—ট্রেনে একসঙ্গে।

—চারু তোর কে হয়?

—কেউ না, পিয়ারিলালের ভাইঝি।

—পিয়ারিলালটা কে!

—আমাদের দুনম্বরী মালের কাস্টমার।

—মানে যার মাল নিয়ে লড়ে যাচ্ছিস, দু নম্বরী মাল দিবি না বলে, যার মাল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিস?

—হ্যাঁ সেই লোকটা!

অমলা সহসা আলতো করে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। সে কোনো থৈ না পেলে এটা করে। এতে তার মুখে চাপা আগুনের ফুলকি থাকে অমলা টের পায় না। অতীশ ঠিক টের পায়। সে অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কা বোধ করে। নিজের উপর সে ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছে। তার পাপ বোধ প্রখর। জাহাজের বুড়ো কাপ্তান স্যালি হিগিনস, শৈশবের ঈশম দাদা তাকে যে কখন কীভাবে সংসারের শুভ অশুভ বুঝতে শিখিয়ে গেছে। এখন বাবা, বাবা কেন যে বললেন, শেকড় আলগা হতে দিও না। জীবনে সার জল দরকার। জীবন বৃক্ষের মতো। সে ছায়া দেয়, তাতে পাখিরা বাসা বানায়, গাছ নিজের জন্য কিছু করে না। শুধু বেঁচে থাকার জন্য মাটি থেকে রস শোষণ করে। তোমার কোনো মতিভ্রম হয়েছে টের পাচ্ছি। এতে শেকড় আলগা হতে পারে। সামান্য ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। টুটুল মিণ্টু,

নির্মলা, আমাদের সবাইকে ধারণ করাই তোমার কাজ।

সে জানে বাবা মাঝে মাঝে অনেক দূরের ছবি দেখাতে পান। বাবার কাছে প্রতিবেশীরাই শুধু খবর নিতে আসে না, দূর থেকেও মানুষজন আসে —যাও ঠাকুরকর্তার কাছে যাও, উনি কী বলেন, দ্যাখ। তাদের সরল বিশ্বাস—এসে বাবার পায়ের কাছে বসে থাকে—জামাই তো কর্তা চাকরিস্থলে গেল। চিঠি নাই। কি করি কন তো! দ্যাখেন চোখ বুজে কী ব্যাপার!

বাবা কী ব্যাপার বোঝে, কে জানে, মাঝে মাঝে অতীশ শুনেছে, বাবা বলেছেন, মন বসাতে পারছি না। কাল খুব সকালে আয়। মনে তখন আধিব্যাধি থাকে না, দেখি মন বসে কি না। বাবা চোখ বুজলে তখন এক অদৃশ্য জগৎ নাকি দেখতে পান। সেখানে মানুষজনের আলাদা পরিচয়। ভিতরে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, মনের সঙ্গে দৈবের—এবং বাবা দেখেও ফেলেন যেন সব! বাবা এত টের পান, সে যে নির্মলাকে নিয়ে বিপাকে আছে টের পাচ্ছেন না! চিঠির জবাবও নেই। কেউ এল না পর্যন্ত! ভাগ্যিস জেঠিমা এসে গেলেন। বড়দাকে একটা চিঠি দিতে হবে, জেঠিমা আমার বাসায় এসে উঠেছেন। চিন্তা করবেন না।

এমন এক আশ্চর্য নারীর কাছে বসে থাকতেও ভয় অতীশের—মুহূর্তের মধ্যে সে যদি কিছু একটা করে ফেলে। ফেলতেই পারে—এই অমলা পাশের দরজা খুলে যদি বলে আয়—এই আশঙ্কার চেয়ে প্রবল, সে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কিছু না করে ফেলে! চারুর বেলায় যা ঘটেছে এটা জীবনে ফের ঘটুক চায় না। যেন এটা ফের ঘটলে সে তার সাহস হারিয়ে ফেলবে। টুটুল মিণ্টু নির্মলা সবাইকে প্রতারণা করবে।

খানিকক্ষণ কেটে গেছে। অমলা কথা বলছে না! কাকে ফোন করল। ফোনে ধরতে পারছে না। দু-তিনবার ডায়াল করে ছেড়ে দিল। বিরক্ত মুখে বলল, সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা?

—স্টেশনে। যেদিন রাতের ট্রেনে বাড়ি গেলাম···!

—ক'টার ট্রেনে গেছিলি?

—দশটার ট্রেনে। সকালে পেঁছায় ট্রেনটা।

—পিয়ারি নিজে গেল, না আগে থেকে কথা ছিল তোর সঙ্গে যাবে?

—কোনো কথা ছিল না।

—তবে?

—স্টেশনে এনকোয়ারির সামনে গিয়ে দেখি পিয়ারি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, আপ! কাঁহা যায়গা! বললাম, বাড়ি যাচ্ছি। সে তখন হাইমাই করে বলল, বহুত মুসিব্বত বাবুজী, এ মেরা ভাতিজী, আপ কো সাধ চল যায়েগা। দুটো টিকিটও দিল ফার্স্ট ক্লাসের। বলল, স্টেশনে, কে-

খবর দিয়ে গেল, ওর শ্বশুর হাসপাতালে, আরও কী সব বলল, আমার ঠিক মনে নেই।

অমলা সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ও বলল, আর তুই ধিং ধিং করে নাচতে থাকলি। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লি! তুই কীরে!

—উঠে পড়েছি তো কী হয়েছে!

—কিচ্ছু হয়নি। যা। ওঠ। ভাগ বলছি। পাজি নচ্ছার। তুই মরবি। বললাম মরবি।

অতীশ অবাক হয়ে গেল, সবটা না শুনেই অমলা এত ক্ষেপে গেল কেন! সে বলল, পরে কী হল জান?

—গেট আউট।

অতীশ উঠল না।

—আই সে গেট আউট।

অতীশ তবু উঠল না। তার কারণ অতীশের মাথায় বীজবীজ করছে অন্য পোকা। তার মাথা ভারি হয়ে আছে কাল থেকে। হাসপাতালের কেবিন ভাড়া, আয়ার খরচ—ক'দিন থাকতে হবে কে জানে! দু'জন আয়া, রাতে একজন, দিনে একজন, মোট ষোল টাকা রোজ। ষোল টাকা রোজ সে নিজেও রোজগার করতে পারে না। কোম্পানির ক্যাশ তার কাছে থাকে। অলিখিতভাবে সে কারখানার ক্যাশিয়ারও। লোহার সিন্দুকের চাবিটা যে কী অস্বাভাবিক ত্রাসের মধ্যে তাকে রাখে! রাস্তায়, কফি-হাউসে, বাড়িতে সহসা ধক করে ওঠে বুকটা—এই রে আসার সময়, লক করা ছিল তো, কতবার যে সংশয় বশে অসময়ে ছুটে গেছে কারখানায়! দারোয়ানকে দিয়ে অফিসের দরজা খুলিয়ে টেনেটুনে দেখেছে—প্রথম প্রথম আচমকা গেলে ওরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যেত, এখন তারা সব বুঝে ফেলেছে বোধ হয়। গেলেই বোঝে, ম্যানেজারবাবু কিছু ভুলে ফেলে গেছেন।

অতীশ উঠছে না দেখে হতাশ হয়ে অমলা বসে পড়েছে। কেউ আর কথা বলছে না। এত জোরে চেঁচামেচি, কেউ ছুটে আসতে পারে—কিন্তু অতীশ দেখল, কেউ দরজা টেনে উঁকি দেয়নি। শঙ্খ অন্তত আসতে পারত। কিন্তু সেও কেমন বে-পাত্তা। গোপন সলা-পরামর্শ চলার সময় সে দেখেছে, বাইরে লাল আলো জ্বলে। এখনকি অমলা বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে রেখেছে! অমলা কি জানে, তার চেঁচামেচি কেউ শুনতে পাবে না! অথবা শুনলেও ছুটে আসার সাহস হবে না। লাল আলোটা খুবই মারাত্মক। অমলা লাল আলোটা নিজের শরীরেও জালিয়ে রেখেছে। সেই কবে থেকে যেন এক লাল আলোর সংকেত শরীরে—কখন যেন নীল অথবা সবুজ হয়ে যাবে, লাইন ক্লিয়ার করে দেবে, আর বলবে, এই দ্যাখ, আমি এখন এই। আমি হাত পা

নাভীমূলে সর্বত্র ফুটে উঠেছি—ফুল ফোটার মতো। আমি কবে থেকে নারী হয়ে গেছি—লাইন ক্লিয়ার। আমি সুস্তনী, সুনিতম্বিনী, সুকেশী, একবার হাত দিয়ে দেখবি না!

অমলা তার দিকে তাকিয়েই আছে। চোখ জ্বলছে। অথচ অতীশ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সে মাথা নীচু করে বসে আছে।

অতীশ বলল, অমলা! আমার কিছু টাকার দরকার।

—আমি তার কী করব?

—কিছু ধার নেব ভাবছি। তোমাকে বলে রাখছি। আসলে অতীশ যদি কোথাও ব্যবস্থা না করতে পারে তার জন্য বলে রাখা। তার মাথার উপর আরও একজনকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অনুমতি তার কাছেও নিতে হবে। তবে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকলে, তিনি হয়তো দায়িত্বটা নিজের কাঁধে রাখবেন না—বৌ-রাণীকে বলে অনুমতি নেবেন কিংবা না বলেই হয়তো বলবেন, তুমি ধার নিলে সবাই নিতে চাইবে। বরং তুমি বৌ-রাণীর পার্সোনাল একাউণ্ট থেকে নাও। তিনি দিতে পারেন। তোমার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আছে!

কটাক্ষ কিংবা খোঁচা তার নবীন বয়সকে। যুবকদের প্রতি প্রৌঢ়দের যেমন চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস। অতীশের লাগে—এতে কোথায় যেন বৌ-রাণীকে খাটো করা হয়। সে নিজে খাটো হলে লাগে না, কিন্তু বৌ-রাণীকে কেউ আড়ালে খাটো করলে তার বড় লাগে। কুম্ভবাবুর তো মুখ আলগা। আড়ালে সে এই বৌ-রাণীকে নিয়ে কত কথা বলে, তার সামনে বলতেও দ্বিধা করে না। রাজার এস্টেট ছারখার করে দিল, সব যাচ্ছে, যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজার ঘরে কালসাপ ঢুকে গেছে।

সে উঠতে যাচ্ছিল।

বৌ-রাণী কী খচখচ করে লিখছে প্যাডে। প্যাড থেকে মুখ তুলে বলল, চারু পিয়ারিলালের ভাইঝি, না?

—হ্যাঁ।

—চারু এখন কোথায় জানিস না?

—না।

—না জানলে ক্ষতি কি তোর?

অতীশ কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। সে বলল, আরে বুঝছ না তুমি, একটা মেয়ে জলজ্যান্ত উধাও হয়ে গেল, তার খোঁজ নিতে হয় না!

—কার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল?

—আমার কাছ থেকে।

—পুলিশে খবর দিলে না কেন?

—খেয়াল হয়নি। ভাবলাম, ওর চাকরের খোঁজে গেছে।

—সঙ্গে তবে নোকরাভি ছিল? অমলার গলায় বিদ্রূপ।

অমলার ঠোঁটে বিদ্রূপের ছটা। ঠোঁট উল্টে বলল, নোকর থাকতে তোর মতো বেল্লিকের হাতে তুলে দিল! চিন্তার কথা!

—খুব!

—আর কিছু হয়নি?

সঙ্গে সঙ্গে অতীশের মুখটা কালো হয়ে গেল। যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে অতীশ।

অমলা দেখল অতীশ আর চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কী যেন ভাবছে!

—কী হল তোর? এই নে। বলে একটা চিরকুট ওর হাতে দিল। শেষে বলল, আমাকে তোর ভয় বুঝি। জোরজার করব না। চাকর বাকরের মতো থাকতে চাস তাই থাকবি। তোকে দিয়ে কিছু হবে না, বুঝে ফেলেছি। ভয় পাস না। তোর আমি অনিষ্ট করব না। নে ধর।

—নধরবাবুকে দিবি।

—অতীশ চিরকুটটা হাতে নিল। দেখল।

—দেখলে তো মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানিস না, ভেতরে তুই কত শয়তান আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

অতীশ তবু কোনো কথা বলল না।

অমলা অতীশের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল. এই! এই অতীশ।

—হুঁ।

—শুনতে পাচ্ছিস? আমি অমলা বলছি।

সুদূর থেকে কেউ ডাকছে, বনি অথবা অমলা কিংবা জীবনের চারপাশে যে সব বালিকারা তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে, সবাই যেন, এই মুহূর্তে অমলার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছিল। আমি অমলা বলে তার সাড়া পাবার চেষ্টা করছে।

অতীশ কেমন বালকের মতো হয়ে গেল। বলল, জান অমলা, পিয়ারিলাল বলছে, তার কোনো ভাইঝি নেই। বলছে, সে সে-দিন স্টেশনে যায়নি। তবে বল কে গেল! কে পিয়ারিলাল হয়ে আমার কাছে এসেছিল, কে চারু হয়ে আমার কাছে এসেছিল! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না অমলা। আমি কি তবে ঘোরে পড়ে যাই! আমি কি সত্যি কোনো অশুভ প্রভাবে পড়ে যাই! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে আর যাই ভাব, আমি শয়তান নই!

অতীশ মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল আর কী—শয়তান হল আর্চি। সে আমাকে এখনও তাড়া করছে। শয়তান আমার হাতে খুন হয়েছে। এই

একটা আমার কঠিন অসুখ। শয়তানকে কোন অসতর্ক মুহূর্তে খুন করে ফেলি আমি, নিজেও টের পাই না। আমি জানি না কখন তাকে কোন ঘোরে পড়ে খুন করেছি।

অতীশের এমন অকপট স্বীকারোক্তিতে অমলা ভারি বিভ্রমে পড়ে গেল। বলল, তুই দেখেছিস, পিয়ারিলাল!

—বারে দেখব না!

—অন্য কেউ নয় তো?

—হতে পারে!

—হতে পারে মানে?

অমলা এবার নিজেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এ কীরে বাবা, বলছে পিয়ারিলাল, আবার বলছে, হতে পারে! সে বুঝতে না পেরে বলল, পিয়ারিলাল কি ভূত!

—হতে পারে।

আরে এও দেখছি জ্বালা, বলছে কি না ভূত! অমলা কী বলবে আর ভেবে পাচ্ছে না। বলল, তোর মাথায় ভূত আছে। ভূতটাকে তাড়া। না তাড়ালে তুই বিপদে পড়বি। তুই মরবি। তোকে চারু সারাজীবন তাড়া করবে। মাথা থেকে ভূতটাকে নামিয়ে ফেল।

অতীশ বলল চেষ্টা তো করছি। পারছি না।

সত্যি আর পারা যায় না! অমলা হাতের ঘড়ি দেখে বুঝল, প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে কখন! কত কাজ বাকি! অফিসে অনেকে বসে আছে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সবাই তার এস্টেটের আমলা। কুমারদহ থেকে দু'জন বাড়ির দালাল আসার কথা। শহরের সর্বত্র বিশাল বিশাল বাড়ি সব পরিত্যক্ত এখন। বাদুড় চামচিকের বাসা। মেরামত করার সামর্থ্য থাকলেও সে-সব বাড়িতে হাত লাগানো হচ্ছে না! কে খাবে! নিজের বলতে কেউ নেই। এর পর বংশটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাজেনের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু রক্তে বিষ মিশে গেছে। কার রক্ত, রাজার না অন্য কারুর। অমলা আজ কেন জানি ভাবল, কোন এক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সব মানুষকে ভূতে তাড়া করছে। না হলে সে ছিল, মানসের প্রেমিকা, চেহারার সঙ্গে কিঙ্করনারায়ণের আশ্চর্য মিল। রাজেনের সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পায় না। সেই সন্দেহ বাতিকটা তাকে রাত হলে মহলের পর মহল ভূতের মতো ঘুরিয়ে মারে। রাজেনের কব্জায় সে চলে এসেছে আসলে সেই ভূতটার দাপটে। ভূতটার নাম বৈভব।

মানসের মাথাতেও ভূত চাপে। মাঝে মাঝে সে পাগল হয়ে যায়। প্রায় গৃহবন্দী সে। কে আসল কে নকল এটাই বুঝতে পারছে না অমলা।

বৈভবের মোহে সে নিজেও রাজেনের কাছে বন্দী। কেমন নিজের মধ্যেই একটা পাগলা ঘোড়া এখন ছোটাছুটি করছে। অমলার বেশবাস সামান্য আলগা হয়ে গেছে, শাড়ি খসে পড়েছিল। আঁচল দিয়ে শরীর ভাল করে ঢেকে বলল, তুই যা এবার!

অতীশ উঠে পড়ার সময় বলল, কিছু টাকা পাবার কথা আছে। একজন নতুন প্রকাশকের আমার বই করার কথা। টাকাটা পেলেই তোমাকে দিয়ে যাব।

—কিসের টাকা।

—এই যে ধার দিলে।

—ধার আমি কাউকে দিই না।

—কী দাও?

—এমনি দিই। ভালবাসলে দিতে হয়। এ তো সামান্য কটা টাকা।

—আমি নিতে পারছি না।

—কেন?

—ভিক্ষে দিতে চাও?

—ভিক্ষে ভাবছিস কেন?

—তবে কী?

—আমি তোকে দিতে পারি না।

—না! না! না! অতীশ চিৎকার করে উঠল।

অমলাও কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই যুবক বড় বেশি আত্মসচেতন। অতীশ আর আগের অতীশ নেই। বড় হতে হতে মানুষ বার বার খোলস পাল্টায়। অতীশও আর শৈশবের সোনা নয়। যে হাত টেনে বলবে, দেখ তো আমি নারী কি না। হাত দে। আমি তোর থেকে আলাদা বুঝতে পারছিস! কিন্তু এখন ইচ্ছে করলেই হাত টেনে নিয়ে বলতে পারে না, আর কিছু না পারিস আমাকে তুই মা হবার একটা সুযোগ দে অতীশ! আমি বড় একলা! বড় একা। কেমন প্রবল কান্না উঠে আসছিল অমলার ভিতর থেকে। অভিমান, এবং উত্তাপে সে গলে গলে পড়ছিল। তারপরই সহসা কী হয়ে যায়, উঠে দাঁড়ায় এবং চিরকুটটা অতীশের হাত থেকে টেনে নিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে হাঁপাতে থাকে।

অতীশ বের হয়ে গেল।

অমলা দেখল অতীশ মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অতীশ এত বড় অপমান করতে সাহস পায়—রাজপ্রাসাদের কুকুর বেড়ালেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে, তোর তাও নেই অতীশ! অমলা গুম মেরে বসে থাকল। শংখকে ডেকে বলল, অফিসে খবর দিতে! কেউ যেন আর তার

সঙ্গে দেখা করতে না আসে। প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, আমি উঠে যাচ্ছি। কুমারদহ থেকে কারা যেন আসবে। নধরবাবুকে বলবেন, যা হয় কথা বলে যেন নেয়। আপনাদের কুমার বাহাদুর এলে ফাইনাল কথা হবে।

আসলে সব কিছু বিস্বাদ লাগছে। অমলা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবার সময় কিছুই দেখছে না। কেমন এক প্রাণহীন জীবন—এবং বৈভব যেন তার কাছে অতিকায় ভার ঠেকছে। মনে হচ্ছে তার, একজন ফুটপাথের বাসিন্দাও তার চেয়ে সুখী। সে সূর্যের আলোর নিচে বসে থাকে। সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে—তার স্বাধীনতার শেষ নেই। রাজেন বিদেশে কিসের টানে চলে যায় বুঝতে কষ্ট হয় না—কিন্তু সে তো পারছে না। সে তো বার বার হেরে যাচ্ছে। আগে ছিল মানস, এখন অতীশ। এরা পাপবোধের তাড়নায় ভুগছে। কোথাকার এক চারু ভর করেছে এখন অতীশের মাথায়। চারুটা কে?

সে একদিন কুম্ভকেও বলল, তুই জানিস চারু কে?

কুম্ভকে অফিসে ডেকে এনে বলেছিল, তাহলে তুই জানিস না!

—আজ্ঞে না বৌ-রাণীমা!

—পিয়ারিলালও জানে না?

—আজ্ঞে জানবে কি করে! পিয়ারিলালের কোনো ভাইঝি নেই।

কাবুলকে খাবার টেবিলে বলেছে, তোকে কে বলেছে অতীশ ঘোরে পড়ে যায়। তুই দেখেছিস?

—না।

—তবে কার কাছে শুনলি?

—রাজবাড়ির সবাই জানে।

—আমি বলছি তুই নিজে দেখেছিস?

—না।

—তবে লোকের কথায় নাচছিস কেন? ওকে পাগল সাজাতে পারলে তোরা মজা পাস।

কাবুল ট্যারা। সে নরম মুরগির ঠ্যাং চিবুচ্ছিল। সে এই বিশাল প্রাসাদে একমাত্র কুমার বাহাদুরের নিজের আত্মীয়। আগে আরও সব আত্মীয়স্বজন গিজগিজ করত। রাজেনের তারা মামা-মামী, তাদের সব লতায় পাতায় কুটুম্ব—রান্নাবাড়ি বাবুর্চিখানায় এক এক কিসিমের রান্না। কে কি খায়, খেতে পছন্দ করে, রাণীমার আলাদা হেঁশেল, সেখানে বিধবা আত্মীয়ারা খায়, আলাদা মহল, সেখানে রাণীমার ঠাকুরদালান—দাস-দাসী এক এলাহি কারখানা। অমলা এসে বুঝেছিল, ফাঁকা জায়গা টের পেয়ে রাজ্যের সব কাক উড়ে এসেছে। নড়ছে না। কেবল পাখা ঝাপটাচ্ছে। অমলার প্রথম কাজই হয়েছিল, সাফ করা। সে সাফ করার কাজে হাত দিতেই ফোঁস! এতদিনের মৌরসিপাট্টা ছাড়তে কে রাজী! কিন্তু অমলার প্রবল ব্যক্তিত্ব সব কিছু অবহেলায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। আছে মাত্র কাবুল, তারও বসে খেলে চলবে না। আদরে এই বাড়ির কোনো আত্মীয়ই মানুষ হয়নি, ঘোড়দৌড় থেকে আরম্ভ করে, বাইজি বাড়ি যাওয়া আসা সব এস্টেটের আয় থেকে। গিলে করা পাঞ্জাবি ধুতি পরে কানে আতর গুঁজে যে যার জায়গায় চলে যেত। অথবা খেলার মাঠে খেলা দেখত কেউ। দীয়তাং ভোজ্যতাং ছিল বাড়ির ঐতিহ্য। অমলা এসে সব বন্ধ করে দিয়েছে। অমলার এ জন্য রাজার আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিন্দার শেষ নেই। তাকে যে কেউ রেণ্ডি পর্যন্ত বলেছে, সে কথাও তার কানে উঠেছে।

কাবুল বলল, অফিসে মাঝে মাঝে ধূপবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকে জান!

—ধূপবাতি কে না জ্বালায়।

—তাই বলে প্যাকেট প্যাকেট ধূপ!

—ইচ্ছে হলে জ্বালাতেই পারে!

সহসা কাবুল যেন বেশ হাতের কাছে মোক্ষম একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে। সে বলল, তুমি জান, তোমার সাধের পাতাবাহারের গাছগুলি ভেঙে ফেলেছিল।

—কে?

—তোমার দ্যাশের পোলা।

—মিছে কথা!

—না মিছে কথা না। কুম্ভর বাবা বলেছেন, কত কষ্ট করে এ-সব লাগানো হয়েছে, কত দূর দেশ থেকে এই সব অমূল্য গাছ নিয়ে আসা হয়েছে, সব গাছগুলোর ডালপালা অতীশ ভেঙে দিল!

—অতীশের নাম বলেছে!

—অতীশের নাম বলেছে।

—সে তো কবে! কতদিন আগেকার কথা! আজ তুই বলছিস এটা অতীশের কাজ!

—ভয়ে বলিনি। তুমি তো বিশ্বাস করবে না।

—কুম্ভর বাবা কবে বলল?

—এই ক'দিন আগে। তবে তিনি বলেছেন, এটা তাঁর অনুমান। রাজ-বাড়ির কার সাহস আছে তোমার বাগানের ডালপালা নষ্ট করে, অতীশ ছাড়া কেউ না! কারো সাহস নেই তোমার বাগানের ডালপালায় হাত দেয়।

পরদিন সকালেই তলব, অফিস-সুপারের। কুম্ভর বাবা রাজার অফিস-সুপার। সেই সুপার বৌ-রাণীর ঘরে ঢুকলে বলল, বসুন।

অফিস-সুপার ক্যাশ-বাক্স দেখল টেবিলে নেই। ক্যাশ-বাক্সটা রোজ মেলাবার দায়িত্ব তার। অফিসের শেষে ক্যাশ-বাক্সটা অন্দরমহলে চলে যায়। তাতে

সারাদিনের জমা-খরচের একটা সাদা পাতা থাকে। সকালে সাদা পাতার হিসাব বৌ-রাণীকে বুঝিয়ে ছিঁড়ে ফেলার নিয়ম। কোনো কিছুর রেকর্ড থাকে না। রেকর্ড রাখতে গেলে সরকার সব টাকায় ভাগ বসাবে—এ-জন্য কোনো লকার নয়, সিন্দুক নয়, কাঠের একটা হাত বাক্স—লাখ লাখ টাকা এর মধ্যেই পাচার হয়ে যায় বিনা রেকর্ডে। কিন্তু আজ কুম্ভর বাবা দেখল, ক্যাশ-বাক্সটা নেই। তবে কেন ডাকলেন!

বৌ-রাণীর মুখ কঠিন।—এত সাহস তোর। অন্দরমহলে থাকতে দিয়েছি বলে তুই আমার মাথা কিনে নিয়েছিস! কুকুর বেড়ালের মতো রাস্তায় ফ্যাঁ ফ্যাঁ করতিস, তোর রাজেনদা না নিয়ে এলে খেতিস কী! দেমাক দেখিয়ে মাস্টারির চাকরি ছাড়লি, একবার ভাবলি না, বৌ-ছেলেপুলের কথা! তোর মা-বাবার কথা ভাবলি না! তোর উপর তাদের কত ভরসা।

নিয়ম নয় বৌ-রাণী কিছু না বললে কথা বলা। অফিস-সুপার রাধিকাবাবু টাকে হাত বুলাচ্ছিলেন। প্রৌঢ় মানুষ। শক্তসমর্থ। লম্বা, আদ্দির পাঞ্জাবি, পাট করা ধুতি পরে আছেন। পায়ের চটি-জুতো দরজার বাইরে। এ-ঘরে জুতো পরে ঢোকার অনুমতি কারো নেই। অতীশ তাও মানে না। অমলারা সবাই জুতো খুলে ঢোকে আর সেদিনের ছোঁড়া অতীশ, সে কিনা জুতো পরেই গট গট করে ঢুকে যায়। আমলারা, বেয়ারারা চোখ ট্যারচা করে দেখে—বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

বৌ-রাণী বলল, আপনি নাকি বলেছেন, অতীশ পাতাবাহারের সব ডালপালা ভেঙেছে।

—না না। আমি বলব কেন?

—আপনার নাকি অনুমান?

—অনুমান, হ্যাঁ তা বলতে পারেন। অতীশ তো নিজের খুশিমতো চলে!

—ও ভাঙবে কেন?

—আজ্ঞে শুনেছি, কিসের ঘোরে নাকি পড়ে যায়। ঘোর থেকে যদি হয়!

—হতেই পারে। রাতে রাধিকাবাবুর কাজ ওই বিশাল বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা। সকালে উঠেও এই কাজ। প্রাসাদের চারপাশে যে-সব অতিথি ভবন ছিল, ম্যানেজার, নায়েব গোমস্তার বাড়িঘর ছিল, সব এখন ভাড়া। অতিথিশালা পর্যন্ত! কারও কোনো ঘরে নতুন কেউ এসে উঠেছে, তার কৈফিয়ত তলব করা অফিস-সুপারের কাজ। বাড়ির উঁচু পাঁচিলের ও-পাশটার রাস্তায় সব ঝুপড়ি রিফুজিদের। কে কখন ঢুকে পড়বে কে জানে! রাতে রাউন্ড দেবার সময় দেখেছেন, অন্দরমহলের সব কটা পাতাবাহারের গাছ অক্ষত। সকালে গিয়ে দেখেন, ভাঙা ডালপালা সব। পাতা বাহারের গাছগুলো অতীশের জানালা বরাবর। অতীশের সিঁড়ি ধরে নামলেই হাতে

নাগাল পাওয়া যায়। এ-সব কারণে তাঁর এই অনুমান। এদিকটায় রাতে কেউ ঢুকে এত বড় অপকর্ম করার সাহস পাবে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। তখন অতীশ নতুন। রাধিকাবাবু মনে মনে সংশয় পোষণ করলেও প্রকাশ করতে সাহস পাননি। কিন্তু কুম্ভর পিছনে যে-ভাবে লেগেছে তাতে করে শেষ পর্যন্ত কে থাকবে বলা কঠিন। কুম্ভর ছ্যাঁচড়া স্বভাব আছে, দু নম্বরী মাল দিয়ে আলগা পয়সা কামাত, সব অতীশ এসে বন্ধ করে দিয়েছে। দু নম্বরী মাল সিট মেটালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া কুম্ভকে কখন বিপাকে ফেলে দেবে কে জানে! শত হলেও কুম্ভ তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান, তিন পুরুষে রাজবাড়ির নুন পেটে, তুই সেদিনের ছোঁড়া কী বুঝবি!

—আপনার অনুমান! না কেউ দেখেছে অতীশ রাতে গোপনে সব ডালপালা ভেঙে দিয়েছে!

গরমের সময় গাছগুলোর জন্য হাওয়া ঢুকতে পারে না অতীশের বাসায়। এ কারণেও অতীশ কাজটা করতে পারে। সব সত্ত্বেও বৌ-রাণীর সংশয় থেকেই গেল। অতীশকে এক সকালে কারখানায় যাওয়ার আগে আবার দেখা করতে বলল।

অতীশ ঢুকলে বলল, তোর বৌকে বাড়ি নিয়ে এলি?

—হ্যাঁ।

—এখন কেমন আছে?

—এই একরকম।

অমলা সব খবরই রাখে। খবর রাখে না, হতে পারে না! সে বুঝতে পারে, আসল কথায় আসবার আগে এদিক ওদিক দু-একটা কথা—এবং ও-সব কথা যখন বেশি হয় তখনই সে টের পায়, একটা বড় ঝড়ের মুখে তাকে পড়তে হবে।

অতীশ সব কথায় হাঁ হুঁ বলে যাচ্ছে। সব দায়সারা গোছের। কেন ডেকেছে, কেন সহসা আবার তলব, কে আবার কানে কি কথা তুলেছে—এ-সব ভাববার সময়ই অমলা বলল, পাতাবাহারের ডালগুলো কে ভেঙেছিল?

—পাতাবাহারের ডাল!

—ভুলে গেলি?

—সে তো কবে! কবেকার কথা! বছর ঘুরে গেছে। তা পাতাবাহারের ডাল ভাঙলে কী হয়! এখন এ-সব কথা উঠছে কেন?

—তুই ভেঙেছিস কিনা বল!

—হ্যাঁ আমিই ভেঙেছি।

—তুই!

—হ্যাঁ আমি।

—তোর এত সাহস!

—সাহসের কী আছে!

—কেন ভাঙলি! আমার এত শখের গাছগুলো তোর কী ক্ষতি করেছে? তাজ্জব বৌ-রাণী। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই! অতীশের চোখ তখন কেমন লাল হয়ে উঠছে।

—তুই এ-কাজ করতে গেলি কেন? বল! তোকে বলতে হবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অতীশ কেমন মিইয়ে গেল, সে তো তার অন্য জন্মের কথা বলতে পারে না। সেই জন্ম কবে তার শেষ হয়ে গেছে। বনি, আর্চি, কাপ্তান, স্যালি হিগিনস, মেজমালোম ডেভিড, ভাঙা লঝঝরে জাহাজ—সেই কবে যেন সুদূর অতীতে সে একটা বড় পাপ কাজ করে এসেছে। আর্চিকে খুন করেছে। কেউ জানে না। কেউ জানে না, কেবল স্যালি হিগিনস বলেছিলেন, রাতের অন্ধকারে গোপনে তুমি আর্চিকে খুন করেছ। বনি ছাড়া পেয়ে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল—জাহাজ তখন টালমাটাল। স্যালি হিগিনস বলেছিলেন, আজীবন আর্চি তোমাকে তাড়া করবে। তার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই।

যত দিন যাচ্ছে তত সে এটা টের পাচ্ছে। যেন আর্চি তার সব সুখ কেড়ে নিতে চায়। আর্চি বদলা নিচ্ছে। নির্মলার অসুখ সেই আর্চির প্রভাবে। রাজার দু নম্বরী কারবারে এসে হাজির—সেও যেন আর্চিরই কাজ। মাঝে মাঝে কুম্ভবাবুর মুখটা আর্চির মতো হয়ে যায় কেন? সে আবার তার কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কুম্ভকে খুন করে বসবে না তো। মাথায় তার পোকা ঢুকে গেছে—পচা টাকার গন্ধ পায়। অফিসে গেলে সব সময় মনে হয় টুটুলটা না আবার পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে বসে থাকে! বাবার চিঠিতেও যেন আর্চির প্রেতাত্মা ভর করেছে। কেবল অনুযোগ, এই টাকায় কী হয়! তোমার বোনের বিয়ের কি করলে! পাত্রের সন্ধান করতে বলেছিলাম তার কী করলে! আমার বয়স হয়েছে, এখন তুমিই আমাদের নির্ভর। জমি তো না যম। খরচের টাকা উঠে আসে না। যজন যাজনে পয়সা নেই। তোমার পাঠানো টাকায় পাঁচজনের সংসার কীভাবে চলে! গরুটা দুধ দিত, তাও বন্ধ করে দিয়েছে। বাঁটে ঘা হয়েছে। সুরেশ চিকিৎসা করছে। বুড়ো বয়সে সামান্য দুধ না খেতে পারলে বাঁচি কী করে!

শেষে এসে হাজির চারু। শেষ বেলায় চারু।

আসলে মনে হয় সবই সে ঘোরে পড়ে করে যাচ্ছে। সবই মরীচিকা। না হলে সে কেন বৌ-রাণীর এত শখের পাতাবাহারের ডালপালা ভেঙে ফেলবে! কী করে বলবে, তুমি বিশ্বাস কর আমি একা থাকলে, আর্চির দৌরাত্ম্য বাড়ে। বিশ্বাস কর এক রাতে আমার বাসাবাড়িতে অন্ধকার ঘরে আর্চি হাজির। দেখি ছায়ার মতো সে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন কুয়াশার মতো তার অবয়ব। ধীরে ধীরে সে জানালা গলিয়ে পাতাবাহারের গাছটায় মিশে গেল। দৌড়ে বের হয়ে গিয়েছিলাম। দরজা খুলে পাতাবাহারের গাছটায় হাত দিতেই দেখি পাতায় ডালে জল লেগে আছে। আর্চি এখন ঐ গাছটায় এসে উঠেছে। গাছটা কত দ্রুত বাড়ে তুমি অমলা টের পাও না! আমি পাই। আমার জানালার হাওয়া বাতাস বন্ধ করে দিতে চায়। আমি কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আর্চি দিন দিন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠছে। তাকে আমায় শেষ করতেই হবে। ডালপালায় সে লেগে থাকবে, আমি সহ্য করি কী করে! সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিলাম।

বৌ-রাণী অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অতীশ কিছু বলছে না। মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে।

—কী রে কি বলছি শুনতে পাস না! চুপ করে আছিস কেন! বল কেন ভাঙলি? তোর কোন পাকা ধানে গাছটা মই দিয়েছিল?

অতীশ কী বলবে! বললে বিশ্বাস করবে কেন! সেই বা বলে কী করে, এই অতীশ একজন খুনী। তোমরা কেউ জান না, সেই অসতর্ক মুহূর্তে এই অতীশ কী হিংস্র হয়ে উঠেছিল। অতীশ তখন যে তার মধ্যে ছিল না।

সে উঠে চলে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বৌ-রাণী আঁচল সামলে ছুটে যাচ্ছে—তুই কিছু না বলে চলে যাচ্ছিস! বলে দরজায় দু-হাত ছড়িয়ে দিল।

—আমার কিছু বলার নেই। সরে দাঁড়াও।

—না দাঁড়াব না।

—অমলা! সে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। অমলার সারা শরীরে এক পরম উষ্ণতা সে টের পাচ্ছে। অমলা সিফনের শাড়ি পরে আছে। শরীরের সর্বত্র তার যেন এক অপার অলৌকিক নারী মহিমা। টোকা দিলেই ফুলঝুরির মতো জ্বলে উঠবে। অমলার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। সে যদি অসতর্ক মুহূর্তে চারুর মতো অমলাকে ব্যবহার করে ফেলে—কারণ নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। নির্মলা আলাদা বিছানায় শোয়, সে একা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। চোখ জ্বালা করে। ভিতরে সে বড় বেশি উত্তপ্ত। কোনো কোনো রাতে বারান্দায় বের হয়ে পায়চারি করে। টুটুল মিণ্টু তার পায়ের বেড়ি। নির্মলা এক বড় গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। তার বাইরে বের হবার শক্তি আর নেই। আর্চি এখন মজা পাচ্ছে। বোঝ এখন, দীর্ঘ সমুদ্র সফরে একজন জাহাজী কত নিঃসঙ্গ থাকে। যুবতীরা আছে বলেই পৃথিবী এত মধুর। তারা না থাকলে কী করতে! বোঝ কেমন লাগে! আসলে চারুকে সেও যেন ধর্ষণ করেছে। বনিকে ধর্ষণ করার চেষ্টার চেয়ে

এটা আরও বড় দুষ্কর্ম। বড় পাপ।

অতীশ এবার খুব ক্ষীণ গলায় বলল, অমলা, তোমরা আমাকে সবাই মিলে নষ্ট করে দিও না। দোহাই তোমাদের।

অতীশ দরজা খুলে দ্রুত বের হয়ে গেল।

অমলা দেখল দীর্ঘকায় এক যুবক চলে যাচ্ছে। তারপরই মনে হল এ যেন অতীশ নয়, ক্রুশবিদ্ধ যিশু। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিসের যন্ত্রণা এত সে বুঝতে পারে না। একবার ভাবল, ভুইঞা কাকাকে একটা চিঠি লিখবে। আপনাদের সোনা কেমন হয়ে যাচ্ছে! ওকে সাইকিয়াট্রিক দেখানো দরকার। কিন্তু অতীশ কি তার বাবাকে বলেছে, মেজবাবুর বড় মেয়ে অমলা কুমার বাহাদুরের স্ত্রী। সে কি বলেছে, অমলা রাজবাড়িতে এখন বৌ-রাণীমা!

তখন অতীশ একটা ট্রামে লাফিয়ে উঠে গেল। চারপাশের কোলাহল তার কানে আসছে না। সেই পাগলটাও নেই। হরিশকে দেখলে তার কেন জানি মনে হয় দিনটা ভাল যাবে। গাছতলায় বসে থাকে। একটা পুঁটলি পাশে। হাজার কিসিমের তালি মারা জামা গায়, কখনও উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শহরটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পাগলা হরিশ বেঁচে আছে।

দেয়ালে সেই সব লেখা ফুটে উঠেছে। শহরের ফুটপাথে মানুষ উপচে পড়েছে। খবরের কাগজ খুললে, ধর্ষণ, রাহাজানি, ছেলেধরার উৎপাতের খবর। যুক্তফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করেছে। নকসালবাড়িতে জোতদার খুন। দিকে দিকে চরম অরাজকতা। পত্রিকা ওল্টালে মাথা ঠিক থাকার কথা না। দেয়ালে কে বা কারা লিখে যাচ্ছে—চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান। কারা বিদ্যাসাগরের মুণ্ডু কেটে সেখানে আগুন জেলে দিয়েছে। মানুষ ক্রমে ত্রস্ত হয়ে উঠছে। বাড়ি থেকে বের হলে, সে আর ফিরবে কিনা ঠিক থাকছে না। নির্মলার এক কথা, অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে এস। কোথাও যেও না।

মিছিল যাচ্ছে। আমাদের দাবি মানতে হবে—মানুষের দাবিদাওয়ার কথা ফেস্টুনে লেখা। ব্রিগেড ময়দানে জনসভা। পার্টির ডাকে লরি বোঝাই সব মানুষজন যাচ্ছে। ট্রাম থেমে আছে। সে দেখল রাজাবাজারের কাছে কেউ বসে আছে চাদর বিছিয়ে। লোকে দু-পাঁচ পয়সা দিয়ে সরে পড়ছে। অতীশ যখন খালাসি বাগানের বস্তিতে ঢুকছে, সূর্য তখন মাথার উপর। শীতকাল এসে গেছে। এ-কটা মাস তার নিদারুণ অসময় গেছে। সে অফিসে ঢুকে যাবার মুখেই দেখল, কুম্ভবাবুর ঘরে পিয়ারিলাল বসে আছে। আবার দেখা করতে এসেছে লোকটা। ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে।

পিয়ারিলালের সঙ্গে তার আবার অনেকদিন পর দেখা। ফোনে অনুনয় বিনয় করেছে।—তার কাজ-কাম বন্ধ। দু নম্বরী মাল সে অন্য কোথাও থেকে

নিতে পারে—কেন যে এখান থেকে নেবার জন্য জেদ ধরে বসে আছে বুঝতে পারছে না।

টিনের কৌটার কারখানা, এ-অঞ্চলে ছোট বড় অনেক আছে। তারা দিচ্ছে না কেন! কেন দিচ্ছে না অতীশ টের পায়। এত সস্তায় মাল আর কোথায় পাবে!

তাকে দেখেই সুধীর এগিয়ে এসে ব্যাগটা হাতে নিল।

পিয়ারিলাল উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। বলল, রাম রাম বাবুজী!

অতীশ সুইংডোর ঠেলে তার অফিস ঘরে ঢুকে গেল। দেখল, ক্যাশবুক এবং একগাদা ভাউচার। কুম্ভবাবু বলল, সান-রাইজ কোম্পানি থেকে লোক এসেছিল। অতীশ শুনেও কিছু শুনছে না। সে আজ সত্যি ভাল নেই। এদিকের শেডটার নিচে প্রিন্টিং মেশিন। গ্যাস চেম্বার। কুম্ভবাবুদের বসার ঘর কারখানার সদরে ঢোকার মুখে। তার অফিসের বিশাল টেবিলের পাশে ফোমের গদিআঁটা চেয়ার। বসলে সে অনেকটা ডুবে যায়।

টেবিলে এক গ্লাস জল। সে বসে এক চুমুকে সব জলটা খেয়ে বেল টিপল। সুধীর। সুধীর এলে বলল, কুম্ভবাবুকে ডাক।

কুম্ভ এসে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। চুল খাড়া, গোবদা চেহারা। মুখটা ফোটকা মাছের মতো ভারি। হাতে চার পাঁচটা আংটি, গোমেদ, পলা, মুনস্টোন। কথা আছে একটা নীলা ধারণ করবে। তাহলেই ওর যা মনস্কামনা সব পূর্ণ হবে। মনস্কামনা একটাই, অতীশকে উৎখাত করা। আংটিগুলি দেখলে অতীশের ভীষণ হাসি পায়। এবং হাত বিছিয়ে কুম্ভ যেন এই আংটির দৈবরহস্য কত শক্তি-শালী তার নিদর্শন সাজিয়ে রাখে।

কুম্ভ নিজে থেকেই বলল, পিয়ারিলাল শুনল না। বললাম হবে না। একবার আপনার সঙ্গে কথা বলবেই। কী করি! শত হলেও কাস্টমার। উঠতে না চাইলে···

অতীশ সে কথায় না গিয়ে বলল, মিটিংয়ের নোটিশ পাঠিয়ে দেবেন।

—কুমার বাহাদুর না এলে মিটিং হবে কী করে?

—এসে যাবেন।

কুম্ভ নিজেও এসব খবর কম রাখে না। তার বাবাই সবার আগে রাজবাড়ির খবর পায়! তারপরই কুম্ভ নিজে। এমন কি অনেক গুহ্য খবরও সে পায়। তবে ফাঁস করে না। গুহ্য খবর আরও আছে। যেমন কুম্ভ জানে কুমার বাহাদুর এলে কারখানার নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। অতীশের ঘোর আপত্তি টিকবে না। কারণ কারখানার লাগোয়া রাজার ছ'সাত কাঠা জমি শিউপুজন দখল করে রেখেছে। লোকটার কুষ্ঠ। এক সময় এ-কারখানায় বড় মিস্ত্রি ছিল সে। আগেকার বড়বাবুকে ভজিয়ে জায়গাটায়

সে ঠেলা রাখত। এখন তার পঁচিশ-ত্রিশটা ঠেলা, নামমাত্র ভাড়ায় জায়গাটায় রাখে। জায়গাটার দখল তার। শিউপূজনকে সেই রাজী করিয়ে উৎখাত করছে জায়গাটা থেকে। বলেছে, কোম্পানির নতুন বিল্ডিং হবে, ক্যানেস্তারা মেশিন কেনা হচ্ছে। বার্মাশেল থেকে মেশিন আসবে—রাজার জায়গার দরকার। ট্যাঁ ফু করবে তো চ্যাংদোলা করে রাস্তায় রেখে আসব। অতীশ নতুন বিল্ডিং তোলার পক্ষপাতী নয়। কারখানা মার খাচ্ছে, মান্ধাতা আমলের মেশিনপত্রের জন্য। ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল দরকার। তার এক কথা নতুন প্রিণ্টিং মেশিন দরকার। লিথো প্রিণ্টিং অচল। কার্মাড় মেশিন, পাঞ্চিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম মেশিন সব পাল্টানো দরকার। বাজারে টিকে থাকতে হলে আরও দুটো ল্যাদ মেশিনের দরকার। বিল্ডিং ধুয়ে জল খেলে চলবে না।

কুম্ভ বুঝিয়েছে, রাজার জমিটা বে-হাত হয়ে যাবে। নতুন বাড়িতে প্রিণ্টিং মেশিন গ্যাস চেম্বার সব তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এই শেডটায় ক্যানেস্তারা মেশিন বসবে।

কারখানার চেয়ে রাজার এই জমির দখল বেশি দরকার। অতীশ জানে বিল্ডিং উঠলে তার ইঁট বালি সিমেণ্ট থেকে সব সংগ্রহের ভার, রাজমিস্ত্রি ঠিক করার দায় কুম্ভ মাথা পেতে নেবে। কনট্রাকটারকে দিলে, অর্ধেক টাকা মেরে দেবে—নিজেরাই দেখেশুনে করাতে পারলে টাকা বাঁচবে—এবং এইসব পরামর্শে কেন যে অতীশ টের পায় হাজার হাজার টাকা তছরুপের একটা সুযোগ এসে যাবে কুম্ভবাবুর। দু নম্বরী মাল বন্ধ করে অতীশ কুম্ভকে যে লোকসানে ফেলে দিয়েছে, বিল্ডিং তুলে, ক্যানেস্তারা মেশিন বসাবার দায়িত্ব নিয়ে তা সুদে আসলে কিংবা বলা যায় এক অভাবিত অর্থের সন্ধানে কুম্ভ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কুম্ভ বলল, ডাকব পিয়ারিলালকে!

অতীশ বলল, পাঠিয়ে দিন গে।

কুম্ভ কেমন প্রমাদ গুনল। যদি পিয়ারীলাল বাবুজীকে খুশি করার জন্য সামনাসামনি সব বলে দেয়! যদি অতীশবাবু বলে, লালাজি দু-নম্বরী মাল পাবেন—কিন্তু তার আগে বলুন, চারু আপনার সত্যি কে হয়। বলুন, স্টেশনে আপনি সত্যি গিয়েছিলেন কি না। চারু বলে কাউকে আপনি আমার সঙ্গে তুলে দিয়েছেলেন কি না, সত্যি কথা বলুন, মাল আপনি পাবেন।

কুম্ভ বলল, এই সুধীর, পিয়ারিকে আসতে বল।

অতীশ চোখ তুলে কুম্ভকে দেখল। তাকে কুম্ভ বিশ্বাস করছে না। কুম্ভ ভাবছে গোপনে কোনো লেনদেন হবে। সে কপাল কুঁচকাল। টের পেল মাথাটা খুব ধরেছে। অমলার আজকের ব্যবহার তাকে অসহায় করে রেখেছে। এটা ভাল না। একজন গেরস্থ মানুষ সে। অমলার টান টান

শরীর এবং প্রাচীন মিশরীয় সৌন্দর্য তাকে পাগল করে দিচ্ছে ভেতরে। যেন আর্চি সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এই একটা পাপ কাজ করিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে। চারুর সঙ্গে সহবাসের পরই নির্মলার রক্তপাত। নির্মলা প্রায় যমের ঘর থেকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেও তার নিস্তার নেই। নির্মলা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর একদিনের জন্যেও সে তাকে আদর করতে পারেনি। পাশে বসে আদর করতে চাইলেই, নির্মলার এক কথা তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও!

এমন কথা শোনার পর মাথায় রক্তপাত শুরু হয়। সে স্থির থাকতে পারে না। ভারি বিমর্ষ হয়ে থাকে। কখনও জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে হয়। নির্মলা তার স্ত্রী। তার আকর্ষণ বড় গভীর। নির্মলা পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। তার ভিতরে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে, লাভা নির্গত হচ্ছে,—ওতে নির্মলার কিছু আসে যায় না। যুবতীর মুখ ফ্যাকাসে—ভয়ে কী ঘৃণায় বুঝতে পারে না। দিন যায়, মাস যায় নির্মলার একই রকমের আচরণ।

—বাবুজী।

—বলুন।

—হামার গদ্দি বিলকুল বন্ধ্ হো জায়গা।

—আমি কী করতে পারি! তারপরই অতীশ কেমন উন্মত্তের মতো আচরণ করল। —বাহার যাইয়ে। নিকালো ইঁহাসে।

—বাবুজী!

—কোনো কথা শুনতে চাই না। আপনি সেদিন চারুকে নিয়ে গেছিলেন কেন!

—নেহি বাবুজী!

—আবার মিছে কথা বলছেন। চারু আপনার কে হয়।

—কেউ না বাবুজী।

—আপনার ধরম এ বাত বলে!

—সাচ বাত, বিলকুল সাচ বাত।

কুম্ভ বলল, আপনি মিছিমিছি পিয়ারিকে টানছেন। আপনার সঙ্গে তার ভাইঝি গেলে কী ক্ষতির—গেলে বলবে না কেন! দাদা আপনি যে মাঝে মাঝে কী সব বলেন বুঝি না!

না, সে আর পারল না। ঘোরে পড়েই হয়েছে। মানুষ এত নিচে নামতে পারে না। সে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য কেমন অনুতপ্ত গলায় বলল, সারাটা ট্রেনে চারু আমার সুখের জন্য কী না করেছে। সেই চারু ট্রেন থেকে উধাও!

চারু তার সামনের আসনে পা মেলে শুয়েছিল। রাতের গাড়ি—চারপাশের গ্রাম মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। চারু ফ্লাস্ক থেকে চা খেতে দিয়েছিল। চারুর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। চারুর চোখে এত ধার ছিল যে সে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি।

স্টেশনের পর স্টেশন চলে গেল। চারু একসময় শুয়ে হাই তুলতে থাকল। শোওয়ার ভঙ্গিটি আশ্চর্য মনোরম। নির্মলাও ঘুমের আগে এ-ভাবে হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকে। সব মেয়েরাই বোধ হয় ঘুমের আগে এ-ভাবে শোয়! পাশ ফিরে শুয়ে আছে। সিল্কের শাড়ি গায়ে থাকছে না। পা ঢেকে শুয়েছে। অতীশ জানালার পাশে বসে। একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। চারু একবার বলেছিল, আপনি ঘুমোবেন না?

সে বলেছিল, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না।

—তাহলে আমি ঘুমোচ্ছি। সকাল হলে ডেকে দেবেন। বলে চারু চিৎ হয়ে শুল। স্তন ভারি পুষ্ট। এত পুষ্ট স্তনে শাড়ি পিছলে পড়ে যায়। দু চারবার পড়ে গেল। সে শাড়িতে বার বার শরীর ঢাকার চেষ্টা করছে। তারপর এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। ট্রেনে আর একটা কাক প্রাণী নেই। ঘুমের ঘোরে যা হয়, চারুর বেশবাস আলগা হতে থাকল। হাঁটু তুলে শুলে শাড়ি উপরে উঠে আসতে থাকল। পাশ ফিরে শুলে শাড়ি আরও উপরে—অতীশ অস্থির হয়ে উঠছে। অতীশ কী করবে! দেখতে পাচ্ছে সব। শেষ পর্যন্ত কেন যে বলতে গেল, চারু ঠিক হয়ে শোও—আর তখনই দেখল বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নাভিমূলে নরম রেশমের উষ্ণতা। মাথা দপদপ করছে! চোখ জ্বলছে। সে আর পারেনি।

আর আশ্চর্য গায়ে হাত দিতেই, চারু তাকে সাপ্টে ধরেছিল। চারু পাগলের মতো তাকে সাপ্টে সাপের মতো পেঁচিয়ে সব নিংড়ে নিয়েছিল—সেই অবিরাম তৃষ্ণায় চাতকের মতো অতীশ ছিল কতকালের কাঙাল, চারু অবলীলায় কোনো এক বর্ষণমুখর রাত্তিরে জোনাকি পোকা হয়ে উড়তে থাকল—তারপর কী ভাবে যে কতদিন পর অতীশ ঘুমে ঢলে পড়েছিল জানে না! ঘুম ভাঙতেই টের পেল, চারু বলে পাশে কেউ নেই। চারু হাওয়া। চারুর আর খোঁজ পাওয়া গেল না। চারু মাথায় তার পেরেক পুঁতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—বাবুজী।

—বলিয়ে।

—মেহেরবানি আপনার।

কুম্ভ বলল, দাদা আপনার শরীর ভাল নেই!

—কেন বলুন তো!

—না, মানে, চোখ এত লাল! রাতে ঘুমোননি!

অতীশ জবাব দিল না! ভাউচার উল্টে সই করতে থাকল। ভাউচার থেকে চোখ না তুলেই বলল, পিয়ারিলাল, আর কটা দিন সবুর করুন। দেখি কী করা যায়। মনমেজাজ ভাল নেই। আমি খুব দুঃখিত। কোনটা বেঠিক বুঝতে মনে হয় আরও সময় লাগবে। পরে আসবেন।

আর তখনই ফোন, হ্যালো, কে?

—আমি।

অতীশ কিছু বলছে না।

ও-প্রান্ত আমি বলেই চুপ।

সেও চুপ।

যেন ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। কেউ কথা বলবে না। অতীশও কম একগুঁয়ে নয়। সে ফোন ধরেই আছে।

কুম্ভ বলল, কার ফোন, কে কথা বলছে?

—কেউ না।

—কেউ না! ফোন তুলে রেখেছেন, কেউ না!

—বলছি কেউ না! আচ্ছা পিয়ারিলাল, পরে কথা হবে। আসুন।

কুম্ভকে বলল, নোটিশটা টাইপ করতে দিন।

—পিয়ারিলাল তোর সামনে?

—হুঁ!

—বললি কিছু? চারুর কোন খবর পেলি?

—না।—কুম্ভবাবু সামনে বসে আছে।

কুম্ভর কৌতূহল বাড়ছে। সে বলল, কে কথা বলছে দাদা। বলছেন, কেউ না। আবার বলছেন, কুম্ভবাবু সামনে বসে আছে।

—বৌ-রাণী।

কুম্ভ আঁতকে উঠল। বসে আছে কেন, কাজ নেই! বসে থাকলে চলবে। কুম্ভ বেশ জোরে বলল, নোটিশ তাহলে টাইপ করতে দিচ্ছি। বলে কুম্ভ পিয়ারিলালকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল। বাইরে বের হয়ে বলল, খবরদার মুখ খুলবে না। চারু বলে কেউ নেই। মনে থাকে যেন। চারুকে লেলিয়ে দিয়েছি জানলে তোমার আমার দুজনেরই অন্ন উঠবে।

পিয়ারি বলল, নেহি বাবু, কভি হাম বলবে না।

তখন অতীশের ভেতর তোলপাড় চলছে। সে কী করবে ঠিক করতে পারছে না। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! শরীর গরম হয়ে গেছে। কান গরম, চোখ আবার জ্বলছে—এক নিয়তি থেকে আর এক নিয়তি তাড়া করছে তাকে—আবার মনে হয় সবই ঘোরে পড়ে হচ্ছে—অমলাও এক ঘোরে পড়ে গেছে।

অতীশ অধীর গলায় বলল, কখন যাব ?

—নম্বরটা টুকে রাখ। তিনশ আটাশ। রিশেপসানে গিয়ে নম্বরটা দিলে তোকে বলে দেবে। ছটার মধ্যে বাস। কিরে যাবি তো ?

--যাব। বলতে পারল না আমাকে নষ্ট করে দিও না।

যাব কথাটা বলতে গিয়ে কেমন গলা ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়ে গেল। অমলার সঙ্গে হোটেলে কয়েক ঘণ্টা—সে স্থির থাকতে পারছে না। আরও একবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এবারে সে নিজেই ধরা দিয়েছে। অস্থির হয়ে উঠছে। আবার জল খেল এক গ্লাস। উঠে দাঁড়াল। এক যুবতী আজ তার অপেক্ষায় বসে থাকবে—সেই সুচারু নারীর গভীরে সে দীর্ঘকাল পর, কারণ সে জানে না, শৈশবের সেই বালিকা নারী হয়ে গেলে, তার খ্যাপামি কতটা ? কীভাবে কতটা অধীর আগ্রহে জলপ্রপাতের ধারা নেমে আসবে ! অথবা মনে হয় তার রক্তের গোপন গভীরে সেই জোনাকী পোকা দপদপ করে জ্বলতে থাকলে আগুন সারা শরীরে কখন না জানি জ্বলে উঠবে—আর সে দেখতে পায় সারাক্ষণ মাথার মধ্যে শুধু এক নারী হাসপাতালেই শুয়ে থাকে না, এক নারী উলঙ্গ হয়েও শুয়ে থাকে।

—ছাড়ছি।

—আচ্ছা।

অতীশ ফোন নামিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তার ভিতর পাপবোধ প্রখর। বাবা তাঁর এই সর্বনাশটি করেছেন। বাবা ! না টুটুল মিণ্টু ! না নির্মলা ! কে ! কিংবা সেই সুদূর অতীতে যে ছিল, অনন্ত হাহাকার সমুদ্রের একমাত্র সঙ্গী—সে না তো ! এও এক হাহাকার সমুদ্র। সারাদিন খাটাখাটনির পর বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে হয় এক বিষণ্ণ রমণী জানালায় দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়। সে-প্রতীক্ষায় কোনো উষ্ণতা থাকে না। বরফের কুচি টের পায় হাড়ে মজ্জায় ঢুকছে। নিষ্প্রাণ গলা, এত দেরি কেন ! সেই কখন দুটো খেয়ে গেছ ! টিফিন করেছিলে ? চোখে মুখের কী চেহারা হয়েছে ! হাত মুখ ধুয়ে নাও। এই মিণ্টু বাবার পাজামা পাঞ্জাবি বাথরুমে রেখে আয় ! তার তখন চিৎকার করে উঠেতে ইচ্ছে হয়, তোমার মধ্যে প্রাণের সাড়া নেই কেন ? সে দু-হাত তুলে যেন চিৎকার করলে বাঁচে, তোমার রক্তেও কী আর্চি আশ্রয় করেছে ? সে তোমাকে শুষে খাচ্ছে। সে তোমার সব জীবনের উষ্ণতা নিঃশেষে মুছে দিচ্ছে ! দিন দিন কাঠের পুতুল হয়ে যাচ্ছ, একটা কাঠের পুতুল দিয়ে আমার কী হবে নির্মলা ! আমি ঠিক থাকি কী করে ! তুমি বুঝছ না কেন, আমি মানুষ—আমি রক্ত মাংসের মানুষ নির্মলা।

আর তখনই মনে হয় সে ঘোরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে—এক সাদা বিছানায় প্রাচীন মিশরীয় সৌন্দর্য নগ্ন হয়ে আছে—অপেক্ষার অনন্ত ইচ্ছেয় নারী

মোমবাতির মতো গলে গলে পড়ছে—সিজারের মতো মাথায় পাতার মুকুট পরে নতজানু অতীশ ! নাভিমূলে সে এক ক্রীতদাস।

ঘোরের মধ্যেই অতীশ কাজ করে যাচ্ছিল। টুটুল মিণ্টুর কথা মনে নেই, নির্মলার কথা মনে নেই—সে কারখানার ভিতরে ঢুকে দুটো নতুন অর্ডারের মাল পরীক্ষা করে দেখল। কণ্টেনারের ঢাকনা লুজ কিংবা টাইট কিনা দেখল। প্রিণ্টিং রুমে ছাপা টিন তুলে রেজিস্টেন্স ঠিক আছে কিনা দেখল—ক্যাশ বুকে কটা এণ্ট্রি করল, শিউপূজনকে ডেকে বলল, তোমার লোককে বলবে, স্ক্র্যাপের দাম বেড়ে গেছে, বেশি দাম না দিলে দেওয়া যাবে না। নোটিশ সই করে নিয়ে গেল কুম্ভবাবু—আর মগজের মধ্যে শুয়ে থাকে সাদা বিছানায় নগ্ন সৌন্দর্য—সে টের পায়, এবং টের পায় বলেই আশ্চর্য স্বাভাবিক হয়ে গেছে কাজে কর্মে। সে একা এত কাজ করতে পারে ? নিজেই কেমন আশ্চর্য হয়ে যায়। এক ফাঁকে কুম্ভবাবুকে ডেকে বলল, বাসায় বলবেন, আমার ফিরতে রাত হবে। একটু কাজ আছে।

অফিসের বাথরুমের আয়নায় নিজেকে অনেকদিন পর দেখছিল। খুঁটিয়ে দেখছিল। গোপন অভিসারের কোন রেখা মুখে ভেসে উঠছে কিনা দেখছিল। ফোনটা ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে।

—সুধীর ফোনটা ধর।

সুধীর বাইরে থেকে ছুটে এসে ফোন ধরে বলল, বাবু রাজবাড়ির ফোন। আপনাকে চাইছে।

এ-সময় কে চাইবে ! ছুটি হয়ে গেছে। বের হয়ে পড়ার কথা। অমলা তিনটায় বের হয়ে কোথায় যাবে, তারপর আজ সাঁজবেলায় জমবে—এবং লোভ অতীব এক কঠিন আকর্ষণ, সে গোপন হয়ে আছে ভিতরে—আর এখন এই অসময়ে ফোন !

—ধরতে বল, যাচ্ছি।

সে তার জামার কলার ঠিক করল। কোট ঠিক করল। পামঅলিভ সাবানের ঘ্রাণ মুখে নিয়ে উবু হয়ে বলল, কে !

—আমি রাধিকাদা বলছি, শীগগির বাড়ি চলে এস। তোমার মেয়ে জলে ডুবে গেছিল। তোলা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। শীগগির।

মুহূর্তে সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। গলা কাঠ। সে আবার থরথর করে কাঁপছে। দৌড়ে বের হয়ে বাস ট্রাম ধরবে তারও যেন ক্ষমতা নেই—সে ডাকল, কুম্ভবাবু।

কুম্ভবাবু ছুটে এলে বলল, মিণ্টু পুকুরের জলে ডুবে গেছিল !

কুম্ভবাবু বলল, কে বলল ?

—জানি না। জানি না। সে ব্যাগ নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল পাগলের

মতো। কুম্ভবাবু বলল, এই দ্যাখ সব বন্ধ আছে কিনা, বলে সেও অতীশের পেছনে ছুটতে থাকল। যে-ভাবে ছুটছে, ট্রামে বাসের তলায় না আবার চাপা পড়ে।

অতীশ একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসল। কুম্ভও দরজা খুলে জায়গা করে নিয়েছে।

সে কি তখন বাথরুমে নিজের আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার করতে ব্যস্ত! পুকুরের গভীর কালো জলে ছোট্ট এক জলপরী ফ্রক গায়ে ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে! তখন সে দৃশ্যটার কথা ভাবতেই বুঝল, সেই আর্চির প্রেতাত্মা—তাকে এক দণ্ডের জন্য সুস্থির থাকতে দেবে না। সে ভয়ে চোখ মুখ দু হাতে ঢেকে ফেলল। কী দেখবে গিয়ে কে জানে!

গেট দিয়ে ঢোকার মুখে দেখল সব স্বাভাবিক। কেউ জলে ডুবে গেছে কাউকে দেখে মনেই হল না। সাদেক আলি সেলাম দিলে সে বলল, মিণ্টু জলে পড়ে গেছিল?

—জী সাব।

কিন্তু কারো কথা শোনার সময় অতীশের নেই। সে পাগলের মতো দ্রুত হাঁটছে! প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সে দরদর করে ঘামছে ভিতরে। নতুন বাড়ি পার হয়ে সে অবাক। মিণ্টুই সবার আগে দৌড়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

বলছে, জান বাবা টটুল না আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।

মিণ্টু সাঁতার জানে না। টুটুলও সাঁতার জানে না। সে এই বাড়িতে ঢুকে সবচেয়ে ভয়ের মধ্যে ছিল—যেন এক অন্ধকার জলাশয় কাউকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। সে সাঁতার শেখাবার চেষ্টা করেছে, পেরে ওঠেনি।

টুটুলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সবাই ছুটে এসে বলছে, আপনার সাত জন্মের পুণ্যফল, ভাগ্যিস অধীর দেখতে পেয়েছিল!

অতীশ চুপচাপ অন্দরের গাড়ি-বারান্দার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দম ফুরিয়ে গেছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কোনোরকমে সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় দেখল টুটুল দরজার পাশে লুকিয়ে পড়েছে তাকে দেখে। টুটুল তার অপরাধ বুঝতে পেরে বাবাকে দেখেও কাছে আসছে না। নির্মলা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

অতীশ ব্যাগটা রেখে বসে পড়ল।

মিণ্টু কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, জান বাবা টুটুল ঘাটলায় না, জলে নেমে গেছিল। কথা শোনে না বাবা। টেনে তুলতে গেছি। আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আমি বলেছি, বাবা এলে তোকে মারবে দেখিস।

মিণ্টুর যেন কিছুই হয়নি।

অতীশ দেখতে পাচ্ছে ফ্রক গায়ে একটা জলপরী ক্রমে গভীর অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। অতলে, মধ্য রাতের জ্যোৎস্নার মতো জলের অন্ধকার সুগভীর। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ছটফট করছে। খড়কুটো অবলম্বনের মতো সবুজ নীল অন্ধকারে ঘাস পাতা যা পাচ্ছে সাপটে ধরছে! ভাবতে ভাবতে ওর নিজেরও কেমন যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। শুধু সামান্য হেরফের। মিণ্টু পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। অজস্র নালিশ। টুটুল তেমনি দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে। এতবার নিষেধ সত্ত্বেও টুটুল একা ঘাটলায় চলে যায়। পুকুরের পাড় ধরে হাঁটে। কোন আকর্ষণে? কে সে? অতীশ গম্ভীর গলায় ডাকল, টুটুল, এদিকে এস!

টুটুল নড়ছে না।

কে সে? অতীশের ব্যক্তিত্বের চেয়ে প্রবল—কে সে? এতবার মানা করা সত্ত্বেও দরজা খুলে পুকুরের গাছপালার ছায়ায় তাকে টেনে নিয়ে যায়। চরম কিছু একটা সে ঘটাতে চায়! জীবনের সবচেয়ে বড় এক প্রতিদ্বন্দ্বী সামনে দাঁড়িয়ে। অতীশ ফের ডাকল, এস বলছি!

টুটুল নড়ছে না। দরজার সঙ্গে সেঁটে গেছে যেন।

—শুনতে পাও না। কী বলছি! কেন গেছিলে? কেন, কে তোমাকে টেনে নিয়ে যায়? বল সে কে? পাগলের মতো উঠে দাঁড়ালো অতীশ। হাতে হ্যাঙার নিয়ে অতীশ ক্রমে একটা দৈত্য হয়ে যাচ্ছে। সে ছুটে গিয়ে টুটুলের হাত টেনে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল।

কে বল? কেন যাও? আর যাবে? বল, আর যাবে? এতবার বলি, যাবে না, বল আর যাবে?

টুটুল কিছু বলছে না।

—এত সাহস তোমার! আমরা তোমার কেউ না? কেউ না? বলেই সে অমানুষের মতো এক ছোট শিশুকে পেটাতে থাকল—চিৎকার, বাবা, আর যাব না। বাবা, তুমি আমাকে মের না। লাগছে।

অতীশ জীবনের সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। নির্মলা তার স্ত্রী, বিরস মুখ, সে বড় নির্বান্ধব, বড় নির্বান্ধব—অতীশ দেখল পায়ের কাছে পড়ে তার ছেলেটা ছটপট করছে। নির্মলা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলেছে—বলছে, তুমি এত নিষ্ঠুর! হ্যাঙারটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সময়, দু-চোখ তার জলে ভার হয়ে আসছে।

—তুমি টুটুলকে মারলে!

তারপর অতীশের আর কিছু মনে নেই। কতক্ষণ সে গুম মেরে বসেছিল মনে নেই। কখন সে তার বিছানায় শুয়ে পড়েছে মনে নেই। এক অযাচিত আশংকায় সে শুধু কাঁপছে। সে বুঝতে পারছে, তার এই নিষ্ঠুর আচরণের

পেছনেও আর্চির প্রেতাত্মার প্রভাব। কত সহজে তাকে অমানুষ করে তুলেছিল।

জিরো পাওয়ারের বালব ঘরে জ্বলছে। তার ঘুম আসছে না। ও-ঘরে নির্মলা টুটুলকে বিছানায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুয়ে শুয়ে সব টের পাচ্ছে। ভিতরে অনুতাপের জ্বালা, যেন অতীশ টুটুলকে মারেনি—নিজের আত্মার ওপর পীড়ন চালিয়েছে।

তখনই পাশে কেউ দাঁড়িয়ে ডাকছে, বাবা!

অতীশ বুঝল, টুটুল এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছে। অতীশ মুখ তুলে টুটুলের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। সে অমানুষ। এমন সরল নিষ্পাপ শিশুর গায়ে হাত তুলে সে কেমন দিশেহারা।

টুটুল আবার ডাকছে, বাবা।

বালিশে মুখ গুঁজে অতীশ বলল, বল।

—আমি তোমার সঙ্গে শোব। তোমার পাশে শোব।

আর সঙ্গে সঙ্গে অতীশের মধ্যে কী হয়ে যায়। যেন সে আর অতীশ নেই, সে শৈশবের সোনা—পৃথিবীটা ছিল আশ্চর্য রকমের সবুজ গাছপালায় ভরা, পাখিরা সব উড়ছে। পাখি, প্রজাপতি, শস্যক্ষেত্র সব মাড়িয়ে এক বালক শুধু দৌড়ায়। অতীশের চোখে জল এসে গেল!

টুটুল মশারি তুলে তার পাশে শুয়ে লেপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে শুয়ে পড়েছে। বলছে, বাবা, আমাকে রেলগাড়ি কিনে দেবে? রেলগাড়ি। অতীশ বলছে, দেব। সব দেব! সব। টুটুলের ফের বায়না, দিদিকে কিচ্ছু দেবে না। দিদি আমাকে মারে। বাবাকে জড়িয়ে টুটুল একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

অতীশ তখন গোপনে টুটুলের পিঠে হাত রেখে খুঁজছে—কোথায় লেগেছে তার। কোথায় তার রক্তপাত!

আর তখনই যেন শুনতে পেল সেই দূরাতীত গ্রহ থেকে কেউ তারবার্তা পাঠাচ্ছে—লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস অ্যাট লাস্ট, ইফ ইউ ওনলি ওয়েট।

॥ ছয় ॥

শীতের সকালে মাধা রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকে। এই রোদটুকুর জন্য বড় তার অপেক্ষা। শহরের সব উঁচু দালান কোঠার জন্য নিচু তলার মানুষদের বড় কষ্ট। সব রোদ যেন সকালে ওরা আড়াল দিয়ে রাখে। বোঝেই না গরিব মানুষেরও রোদের দরকার হয়। ভাগ্যিস সে তেলকলের

পাঁচিলের পাশে তার ঝুপড়ি তুলেছে। ভিতরে বড় প্ল্যাটফরমের মতন লম্বা টিনের শেডের মাথায় সূর্য উঠে গেলেই সে ঝুপড়ি থেকে মুখ বার করে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসে। গায়ে নোংরা ছেঁড়া কাঁথা। শীতটা শরীর থেকে যেতেই চায় না। পোকা-মাকড়ের মত আটকে থাকে। শীতকালে এই একটা সুবিধা, তার স্নানটান করতে হয় না। জীবনের সব কাজই তার কাছে এখন বাতিল ন্যাকড়ার মত। যতটা কম নড়ে চড়ে থাকা যায়। সারাদিন খুকখুক করে কাশি। রাতে কাশির উপদ্রব বাড়ে। ঘুম হয় না। সকালে আর এক উপদ্রব, বাপ্পা এসে বলে গেছে, হাসপাতালে যেতে হবে। আজই।

কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে আছে মাধার। সে সাফ বলে দিয়েছে—যাবে না। এতদিন শুনে আসছে ই এস আই থেকে বেড পেলেই তাকে ঝুপড়ি ছাড়তে হবে। সে ত কবে থেকেই শুনে আসছিল—কান দেয়নি। সিট মেটালের সে ওয়ার্কার। বস্তির মধ্যে তার থাকার জায়গা পর্যন্ত মেলেনি। সংসারে সে একা। ক্যানিং লাইনের ট্রেনে চেপে সেই যে শহরে ছুটে এসেছিল সৎমায়ের তাড়া খেয়ে, আর ওদিকটায় ফিরে যায় নি! শহরে থেকে সে দেখেছে, ফুটপাথ বড় প্রিয় জায়গা। সেই প্রিয় জায়গা থেকেই সিট মেটালের হেলপার হয়ে গেছে। ঠিকানা সে বদলায় নি। এখন নাকি তাকে ঠিকানা বদল করতে হবে। সে রাজি না।

গোরাকে বলেছে, তোরা রুখে না দাঁড়ালে সব যাবে।

গোরা বলে গেছে, কোন শুয়োরের বাচ্চা আছে তোকে তোলে! কত ক্ষেমতা দেখব।

পারুলকে বলেছে, সকালে আসবে বাবুরা।

পারুলের এক কথা, তোর রাজরোগ। ও রোগের কোন ওষুধ নেই। খামোকা ঝুপড়ি ছাড়তে বললে রাজী হবি না।

পচারও এক কথা, হাঙ্গামা হুজ্জোতি হবে বলে দিস। আমরা মরে যাইনি।

তা পচা, গোরা হাঙ্গামা হুজ্জোতি করতে ওস্তাদ। তার ঝুপড়ি ওদের একটা বড় ঠেক। পারুলকে নিয়ে তারা ফুর্তিফার্তা করে—কালীমার্কা আর কাঁচা ছোলা খায়—সে তখন গাছ তলায় বসে এনামেলের বাটি বাজায়, দু চার পসয়া বাবুরা দেয়। ই এস আইয়ের দৌলতে টনিক ক্যাপসুল পায়, বাজারে ধারে দিয়ে কিছু উপরি রোজগার হয়। সে দিনমান এনামেলের বাটি ঝাঁকিয়েও দু পাঁচ টাকা সারাদিনে কামায়। বড় কাশির উৎপাত। আর শরীর একেবারে কাকলাশ! চোখ জবা ফুলের মত লাল, গিরগিটির মত চামড়া শরীরের। পারুলের মাথায় খুশকি, উকুন, পাগলী গোছের

—যখন যা মুখে আসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খিস্তিখাস্তা করে। তেল চিটচিটে শাড়ি পরে থাকে। দুর্গন্ধ শরীর—সেটা তার না পারুলের এখন আর তা টের পায় না মাধা।

কিন্তু সকাল থেকে কি যে হুজ্জোতি শুরু হয়েছে। কারখানা থেকে ইউনিয়নের পান্ডা মনোরঞ্জন বলে গেছে, বাবুরা এলেই কাগজপত্র দিয়ে আসব। রেডি থাকবি।

—কোথায় যাব।

—শালো জান না কোথায় যাবে! যমের বাড়ি। ঝুপড়িতে পড়ে মরে থাকলে ইউনিয়নের দুর্নাম। সিট মেটালের দুর্নাম।

—খেতা পুড়ি দুর্নামের। একদম ঘেঁষবে না। আমার কোন অসুখ নেই। অ পারুল শোন কী কয়!

—আছে কী নাই ঠেলা খেলে বুঝবি।

—বললাম ত আমার কোন অসুখ নাই। বাড়াবাড়ি করলে হাঁক মারব। অ পারুল, ডাক গোরা, পচাকে।

—হাঁক মেরে করবিটা কী! ডাক না।

—দেখবে? অ পচারে, আমারে মেরে ফেলল রে। তখন পারুল ছুটে গেছে ডাকতে। অ পচারে···রে···।

কোথা থেকে পাঁচ সাতজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে হাজির।

—কী হুজ্জোতি জুড়েছেন দাদা। ব্যারামি নাচারি লোকের সঙ্গে কচলা কচলি কেন করছেন দাদা!

মনোরঞ্জন বস্তি এলাকার সবাইকে চেনে। সবকটা ওয়াগন ব্রেকার। জেল হাজত কোন বিষয় নয়। থানার বড়বাবু সম্পর্কে মামা হয়। ভাগ্নেরা মনোরঞ্জনকে তড়পাবে বেশি কি?

কুম্ভবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। অতীশবাবুকে বলেছে, আপনি যান দাদা। আমরা দেখছি কী করা যায়। অতীশ কী ভেবে অফিসে ফের ফিরে গেছে। মনোরঞ্জন এসে বলল, হারামজাদা চিৎকার করে লোক জড় করছে। মহা ঝামেলা। হাসপাতালে যেতে চাইছে না। ঝুপড়ি ছাড়বে না বলছে।

কুম্ভবাবুর সাহস নেই একা যাবার। কারখানার বাঙ্গা যাদব দারোয়ান সঙ্গে। মনোরঞ্জনকে একা পাঠিয়ে একবার পরখ করে দেখল, বিষয়টা কতটা গোলমেলে। থানা পুলিশের যদি সাহায্যের দরকার হয়। কী করবে ঠিক করতে পারছে না। ঝুপড়ির দখল ছাড়তে মাধা রাজি না।

এই, ই এস আইয়ের বেড পাওয়া নিয়ে কী লড়ালড়িটা না তার গেছে! তার ম্যানেজার বাবুটি ত বেশি ঝামেলা দেখলে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে

থাকবেন। মর শালা তুমি!

—এই যাদব, তুই যা একবার। বুঝিয়ে বল।

—আপনি সঙ্গে চলুন।

—মনোরঞ্জন! কুম্ভ আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ছোঁড়াগুলো কারা? চলে গেছে, না আছে!

প্রতাপের দুই বেটা, যাদবের ভাইপো একটা। বাকি তিন চারটেকে দেখেছি। খালপাড়ে ডেরা আছে। নাম জানি না।

—কী করবে তবে?

—আপনি বুঝিয়ে বলুনগে। যদি রাজি হয়!

সহসা কুম্ভর ভয় ধরে গেল কেমন—এ কী ফ্যাসাদ—বলে কিনা অসুখ নয়! দু-দুবার রক্ত বমি করেছে কারখানায়। ই এস আইয়ের ডাক্তার প্লেট তুলে বলেছে, টি বি—ভিতরে ঢুকতে দেবেন না। বস্তির যে খুপরিটায় থাকত, খবর পেয়ে তারাও মরিয়া, এক সকালে এসে কুম্ভ দেখেছিল মাধা তার পোটলা-পুঁটলি নিয়ে অফিসের রোয়াকে বসে আছে, আর খুকখুক করে কাশছে। বিড়ি টানছে নির্বিকার চিত্তে। মাধা সবাইকে মজাতে চায়। এক তাড়া লাগিয়েছিল, ভাগ বেটা—কিন্তু ভাগ বললেই সে শুনবে কেন, কারখানার কর্মী উদাস চোখে বলেছিল, যাইটা কোথায়!

ইউনিয়নের পান্ডারাও ধারে কাছে সেদিন ছিল না—কার ঘাড়ে কোপটা পড়বে কে জানে!—তা মনোরঞ্জন, তুমি ইউনিয়নের এক নম্বর পান্ডা, বাড়তি ঘর তোমার নেই?

—না স্যার। নেই। মনে মনে বুঝেছিল, সমূহ সর্বনাশ সামনে। পালাতে পারলে বাঁচে। কুম্ভবাবু বলেছিল, ম্যানেজারবাবু আসুক। তিনি কী বলেন দেখি!

ম্যানেজারবাবু এলে বলল, দাদা খুবই সমস্যা!

—কিসের সমস্যা?

—মাধাকে বাড়িওয়ালা তাড়িয়ে দিয়েছে। রোয়াকে বসে আছে। অতীশ অফিসে ঢোকার মুখেই দেখেছিল দৃশ্যটা—বালিশ কাঁথা, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শতরঞ্চ একখান, তার উপর বসে মাধা বিড়ি ফুঁকছে। ম্যানেজারবাবুকে দেখেই বিড়িটা লুকিয়ে ফেলেছিল আর কোঁত করে ধোঁয়া গিলে ব্যাঙের মত দু চোখ উপরে তুলে দিয়েছিল—এমন নিরীহ গোবেচারা মানুষ ত্রিভুবনে নেই চোখ স্থির রেখে ম্যানেজারবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

অতীশ বলেছিল, কারখানার লোহালক্কড়ের জায়গাটা পরিষ্কার করে দিন, সেখানটায় থাকুক। শিউপূজনের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করবে। ই এস আই থেকে বেড না পাওয়া পর্যন্ত থাকুক। সত্যি যাবেটা

কোথায় !

কুম্ভ বলেছিল, দাদা বলছেন কী। আপনার কি রাইট আছে, কারখানার মধ্যে থাকতে দেওয়ার।

অতীশ পরে বুঝেছিল, সত্যি জটিল বিষয়। কুম্ভ কারখানার অভিজ্ঞ লোক, সব বোঝে। সে আর সেদিন কিছু বলতে পারেনি। তারপর বলেছিল, রোয়াকে থাক। আপনি ত বলেছেন, ই এস আইয়ের বেড পেতে দেরি হবে না।

—এই রোয়াকে !

—হ্যাঁ ! কী হবে ! এ ত কুকুর বেড়াল নয় যে তাড়িয়ে দেবেন !

আসলে সেদিন কুম্ভর মাথা এত গরম হয়ে গেছিল যে মনে মনে অতীশকে আর একবার শুয়োরের বাচ্চা বলেছিল। এটা তার নিজের স্বার্থে নয়, সেদিন কারখানার স্বার্থে অতীশকে শয়তান ভেবেছিল। রোয়াকে থাকলে, সেটাও মৌরসিপট্টা হয়ে যাবে। ম্যানেজারবাবুটির মাথায় দোষ আছে, না হলে এই কারখানায় এসে দু তিন বছরে যা উৎপাত শুরু করেছে তাতে করে কুম্ভর মত ঠাণ্ডা মাথার লোক বলেই টিকে আছে। সেই কুম্ভ এখন গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে, যদি ভাগ্নেরা থাকে, সে যাবে না। ইউনিয়নের পাণ্ডাদের হাতে কাগজ পত্র দিয়ে পাঠাবে—গেলে যাবে, না গেলে শালো ঝুপড়িতে ঠাণ্ডায় পড়ে মরে থাকবে। কার কি করার আছে।

—কী ব্যাপার, আপনারা যান নি ?

কুম্ভ দেখল দেরি দেখে ফের অতীশবাবু নিজেই চলে এসেছেন। সে পই পই করে বারণ করে এসেছে আপনি কারখানার ম্যানেজার, আপনার যাওয়া ঠিক হবে না ! কারখানার ইজ্জতের কথা ভেবেই বলা, তা শুনল না ! চলে এসেছে আবার ! কাউকে বিশ্বাস করে না ! দাঙ্গা হাঙ্গামা হতে পারে এমন ভয়ও দেখিয়ে এসেছে। আরে নিজের জীবনটা তো আগে। অফিসে ঢুকেই বুঝেছিল কুম্ভ, মাধাকে ঝুপড়ি থেকে তুলতে গেলে তার ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটে হাত দেওয়া হবে। মাধা তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত একটা মন্দিরের রোয়াকে আশ্রয় নিয়েছিল—বেড পেলে তুলে নেওয়া যাবে। ব্যাটা যে এত ধুরন্ধর সে জানবে কী করে ! নেশা ভাঙের অভ্যাস আছে। গাঁজা খায় তাও জানত। উপার্জন, পয়সা কড়ি সব ওতেই উবে যেত। এখন মাধা নানা দিক থেকে গেরস্ত মানুষ ; পারুল বলে একটা ফুটপাথের আধ-পাগলী তার ঘরে শোয় পর্যন্ত। এত সব খবর পাবার পরই সে ম্যানেজারবাবুর কাছে প্রটেকসানের কথা তুলেছিল। শুনল না। আপনারা না যান, আমি যাচ্ছি, বুঝিয়ে বললে মাধা বুঝবে। ওর ভালর জন্যই করছি, খারাপ ত কিছু করছি না। ভয়ের কি আছে।

কুম্ভ বলল, যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন ?

—মনোরঞ্জন তাড়া খেয়েছে !

—কারা তাড়া করল ?

—ভাগ্নেরা।

অতীশ কেমন চোখ ছোট করে ফেলল। কুম্ভবাবুর উপর অনেক বিষয়েই তাকে নির্ভর করতে হয়। কুম্ভ তাকে খুশি করার জন্য নানাভাবে তোয়াজ করেও থাকে—তবে সম্পর্কটা একই বাড়িতে থাকে বলে দাদা ভাই পাতিয়ে নিয়েছে, কিন্তু কোনদিন রসিকতা করেনি। ভাগ্নেরা বলে রসিকতা করেছে কুম্ভ ! কপাল তার কুঁচকে গেল। না বলে পারল না, ভাগ্নে থাকলে মামার ভূমিকায় নেমে পড়ুন ! কার জোর বেশি পরখ করা যাক, ভাগ্নে না মামার ! ভয় পান ত আমিও না হয় আপনাদের সঙ্গে মামার ভূমিকায় নেমে পড়ি।

তুমি মামা সাজাতে চাও। কেন ? যাও তবে। দেখ ভগ্নেরা কী আদরযত্ন করে ! তারপরই মনে হল, যা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ, তাতে মামা সেজে চলে যেতেই পারে। কিন্তু পরে রাজবাড়িতে কৈফিয়ত—কিছু হলে তার চাকরি নিয়ে টানাটানি। কুমার বাহাদুর বলবে, তুই ত জানিস অতীশকে, বৌ-রাণী ডেকে পাঠাবে, তোরা কোথায় ছিলি, হ্যাঁ তোদের দিয়ে আর কারখানা চালান যাবে না। অতীশকে সঙ্গে নিলি !

এমন ভাবতেই কুম্ভর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ভাগ বললে যাবে কোথায় ! সেও তখন আর এক মাধা ! সাত পাঁচ ভেবে বলল, আপনি যাবেন না। দেখছি কী করা যায় !

যাদবকে পাঠাল কুম্ভ। তুমি গিয়ে বল।

যাদবের সুপারিশেই হেলপারের কাজ দিয়েছিল মাধাকে। বস্তির অশ্বত্থ গাছের নিচে পড়ে থাকে, বিশ-বাইশ বয়সের তাগড়া ছোকরা, যাদবের বউকে দিদি বলে ডাকে, কারখানায় চলে এলে মাধা দিদির কাছে গিয়ে নাকি বসে থাকে, আদরযত্ন খায়। তা সোমত্ত বউ ঘরে একা থাকলে একটা আতঙ্ক যে থেকেই যায়। মাধার উৎপাত আর বউয়ের সায়া শাড়ি রাতে খুলতে গেলে এমন ভাব করত, যেন সে পরপুরুষ, জোর করে ধরে এনে ধর্ষন করছে। কাঁহাতক ভাল লাগে ! কাজ হলে বাড়ির উৎপাত থেকে রক্ষা পাবে ভেবেই ধরেছিল কুম্ভবাবুকে।

—তোমার কে হয় ?

—আমার শ্যালক।

—তা শ্যালক এসে কাঁধে চেপে বসেছে।

যাদব কারখানার পাঞ্চ মেশিন চালায়, ডাইসপত্রের কাজ ভাল বোঝে, ছোট্ট একটা কারখানার পক্ষে যাদবের মত সব কিসিমের কাজ জানা কর্মীর খুবই অভাব। কাজে মন দিতে পারছে না। কারখানার লোকসান। যখন তখন যাদব নাগা করছে, এ-সব ঝুট ঝামেলা যে মাধাকে কেন্দ্র করে বুঝতে অসুবিধা হয়নি কুম্ভবাবুর—প্রডাকসন ঠিক না হলে আগেকার ম্যানেজার তাকে ছেড়ে কথা কইত না, এমন বহুবিধ কারণে শ্যালকের চাকরি না দিয়ে পারে নি। পরে শুনেছিল মাধা যাদবের কেউ হয় না। মাধা কাজটা হতেই ফুটপাথে গিয়ে উঠেছিল। তখন আর একজন হেলপারের মাইনে কত! উনত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা মাস গেলে। ফুটপাথ ছাড়া এত বড় শহরে মাধার মত মানুষের আর ঠাঁই পাবার জায়গা কোথায়! অতীশবাবু আসার পর এক লাফে মাইনে তিনগুণ বাড়তেই মাধা বস্তির একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল—কিন্তু যা হবার আগেই হয়ে গেছে। খুকখুক কাশি, জ্বর, তারপর মেশিনের উপরই রক্ত বমি।

কুম্ভ এবার বিশ্বনাথকে পাঠাল।

অতীশ বলল, আপনারা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সবাই চলুন এক সঙ্গে! বিশ্বনাথকে একা পাঠিয়ে কী হবে!

কুম্ভ বলল, যাদবের শ্যালক, বিশ্বনাথের দেশের লোক। এক এক করে চেষ্টা হচ্ছে।

বিশ্বনাথ এসে বলল, না স্যার যাবে না। হাতে লাঠি নিয়ে ঝুপড়ির দরজায় বসে আছে। বলছে, কোন শালা আসে দেখব।

—একা? কুম্ভ প্রশ্ন করল।

—না একা না। ফুটপাথের পাগলীটা ঘরে বসে চিনেবাদাম নিজে খাচ্ছে, মাধাকে ছাড়িয়ে দুটো একটা দানা দিচ্ছে।

কুম্ভ বলল, ব্রেকফাস্ট ছাড়ছে তবে।

তারপর অতীশর দিকে তাকিয়ে বলল, ব্রেকফাস্টের সময় যাওয়া কি ঠিক হবে, দাদা?

—হবে, চলুন।

এভাবে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলে বস্তির লোকজনের কৌতুহল বাড়ে।

—স্যার আপনারা এখানে! কী ব্যাপার!

—ব্যাপার কিছু না। সব তো খুলেও বলা যায় না। কুম্ভ আর পারল না। যা আছে কপালে হবে। রাস্তার লোকজন যাচ্ছে। সকালে এক কিসিমের লোক যায়—তারা গঙ্গা স্নানে। তারপর আর এক কিসিমের লোক যায়—তারা যায় তেলকলে কাজ করতে। রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। কিন্তু তিন চারটা তেলকল এ জায়গাটায় আছে বলে গেরস্ত মানুষের ঘরবারি কম।

নেই বললেই চলে। শুধু মোড়ে যতীন সাহার টিন প্লেটের আড়ত। দোতলা বাড়ি। একতলার ছাদ কাঠের পাটাতনের, দোতলার ছাদ টিনের। এখানকার সব বাড়ি ঘরই এ-রকমের। রাজার বস্তি—বস্তির মধ্যে থেকেও কেউ কেউ যে মাসে লাখ লাখ টাকার কারবার করতে পারে যতীন সাহাকে না দেখলে বোঝা যায় না।

বাড়িতে তার চার পাঁচ পুত্রবধূ, বিঘেখানেক জমি দখল করে আছে। ওরা দোতলার জানালায় দাঁড়ালে মাধার কাণ্ড কারখানা দেখতে পায়। যতীন সাহা আবার সিট মেটালে টিনপ্লেট সাপ্লাই করে। সেই সুবাদে অতীশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। কোটার টিনে হয় না। কারখানা চালু রাখতে গেলে খোলাবাজারে টিন কিনতেই হয়। অতীশের তখনই যে কেন মনে হল, সাহাদের বউ মেয়েরা বড় রূপসী হয়। যতীন সাহার ছোট মেয়েটা একদিন তাকে দু চোখ ভরে চুরি করে দেখার সময় অতীশের কেন জানি মনে হয়েছিল, নারীর জঙ্ঘায় একই জোনাকি পোকা দপদপ করে জ্বলছে। সব নারীর জঙ্ঘায়। চারুর কথা মনে হল তার।

চারুকে নিয়ে বউরাণী খাপ্পা। চারুটা কে? হ্যাঁ তুই চারু চারু বলে, সবার মাথা খাচ্ছিস।

সে বোঝায় কী করে চারু কে। চারু যে তাকে সব দিয়েছে।

নির্মলা অসুস্থ না থাকলে চারুর কথাটা বোধহয় মাথায় থাকত না। আজও অফিসে বের হবার সময়, নির্মলার হাতের কাজ অনেক এগিয়ে রেখে এসেছে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর নির্মলা আজকাল ভারি কাজ ছাড়া প্রায় সবই করার চেষ্টা করে। অতীশের সকালে বড় তাড়া থাকে। বাজার, মিণ্টুকে স্কুলে দিয়ে আসা, বাথরুমের চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখা, কিছু কাচাকাচি থাকলে তাও করতে হয়। সুখি ক'দিন থেকে জল বাটনা দেয়। কুম্ভবাবুই ঠিক করে দিয়েছে।

নির্মলা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর মা এসেছিল প্রহ্লাদ কাকাকে নিয়ে। দু'দিনও থাকে নি। নির্মলা বাড়ির লোকজনের কথা উঠলে আজকাল খুবই তিক্ত ব্যবহার করে। ওর এক কথা, তোমার সঙ্গে বাড়ির শুধু টাকার সম্পর্ক।

অতীশ টের পেতে শুরু করেছে যেন সত্যি টাকার সম্পর্ক। তার এত বড় বিপদেও কেউ বাড়ি থেকে এসে থাকে নি। বাবার চিঠি পেয়েছিল শুধু—তোমার মাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছ। টুটুল মিণ্টু বাড়িতে একা থাকবে লিখছ। কিন্তু তোমার মা যায় কী করে! অলকার পড়া আছে, হাসু ভানু স্কুলে যায়, গৃহদেবতার কাজ থেকে সব এক হাতে তোমার মা সামলায়। অলকাই যাবে কী করে! সামনে পরীক্ষা। দু-বার অকৃতকার্য হয়েছে, এবারে

উঠে পড়ে লেগেছে—ওর কোন পাত্রের সন্ধান পেলে কি না জানাবে।

চিঠি লিখেছিল কাউকে পাঠাবার জন্য আর উত্তর এসেছে পাত্রের সন্ধান দেবার জন্য।

বাবার চিঠি সেখানেই শেষ নয়। বাড়িতে কালসাপ ফণা তুলে আছে। আমার রাতে ঘুম হয় না। ইষ্টদেবতার স্মরণই সম্বল। অলকার কী ব্যবস্থা করছ জানাবে। শহরে গিয়ে যে শেকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে, তোমার নিস্পৃহ স্বভাব থেকে তা টের পাচ্ছি।

অতীশ তখন দেখল বিশ্বনাথও ফিরে আসছে। এটা অতীশের পছন্দ হচ্ছে না। কুম্ভবাবুর এত সব রোয়াব গেল কোথায়! আসার সময় শ্রীনাথকে খুঁজেছে। শ্রীনাথ থাকলে কিছুটা সুবিধা হবে অতীশও জানে। কিন্তু বেটা বস্তির কার ঘরে বসে চা খাচ্ছে কে জানে! তাকে খুঁজে বার করাই কঠিন।

অতীশ নিজেই হাঁটা দিল, আমি যাচ্ছি। বুঝিয়ে বলতে পারলে ঠিক যাবে।

কুম্ভ প্রমাদ গুনল। বলল, আমরা সবাই যাচ্ছি। আপনি বরং যতীন সাহার গদিতে গিয়ে বসুন। দরকার পড়লে খবর দেব।

যতীন সাহার গদি থেকে ঝুপড়িটা দেখা যায়। কিন্তু মুশকিল যতীন সাহা গেলেই এত বেশি আপ্যায়ন শুরু করবে যে সহজে উঠতে দেবে না। চা মিষ্টি সিগারেট সাজিয়ে রাখবে। তাকে বেশ সমীহ করে কথা বলে। বাবার বয়সী মানুষটা তাকে দেখলেই উঠে দাড়ায়। হাত জোর করে থাকে। ব্যবসার রীতি এইটাই বোধ হয়। একটা কারণে যতীন সাহার অবশ্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকার কথা। খোলাবাজার থেকে টিন তুললে আগেকার ম্যানেজার তার কাছ থেকে কমিশন নিত। বাজারে এটাই রেওয়াজ। কমিশন বাবদ তার প্রাপ্য টাকা লোক মারফত খামে ভরে পাঠালে, অতীশ ফোন করে বলেছিল আর কখনও করবেন না। এবার থেকে কমিশন বাদ দিয়ে টিনের দর ধরবেন। খামে যে টাকাটা গুনে দিয়েছিলেন ওটা ফের গুনে নেবেন। আপনার মত ধার্মিক মানুষের কাছে এটা আমি আশা করিনি।

যতীন সাহার কথাবার্তায় ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব আছে। মাথার উপরে গণেশের ছবি। গলায় কণ্ঠি। সে গেলেই জাহাজের খবর নেবে—আপনি জাহাজে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন! কী সৌভাগ্য, আপনাকে দেখলেও পুণ্য।

—ঘুরেছি। দেখে এবার পুণ্য সঞ্চয় করুন। মহাপ্রভুতে যখন হল না!

—কী করে গেলেন! কী সাহস!

—জাহাজী হয়ে। ওতে সাহসের কী আছে!

—সমুদ্রে খুব ঢেউ…না?

—তা আছে।

যতীন সাহার ঐ এক স্বভাব। কথার শুরু সব সময় জাহাজ দিয়ে। অতীশ প্রথম আলাপেই টের পেয়েছিল, যতীন সাহা তার নাড়ি-নক্ষত্রের সব খবর আগেই নিয়ে নিয়েছে। সে এক সময় নাবিক ছিল, সে খবরও। তার লেখালেখির বাই আছে। দুটো উপন্যাস সিনেমা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায়, ছোট মেয়েটা তার খবর রাখে সব চেয়ে বেশি। সে গেলেই ও-পাশের দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে তাকে দেখে। তখনই তার কেবল মনে হয়, নির্মলা কবে যে নিরাময় হবে! মানুষের শরীরে কী যে থাকে! তার লেখায় নারী মহিমার কথা একটু বেশি মাত্রাতেই থাকে। নারী মাত্রেই দেবী, এবং এমন সব জটিলতা সৃষ্টি করে তোলে নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে মনে হবে নারী হল ভাসমান নৌকা। পুরুষ তার উপর পাল খাটিয়ে বসে আছে।

অতীশ গদিতে ঢুকতেই যতীন সাহা উঠে বসল। সাদা ফরাসে বড় বড় তাকিয়া—তাতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। পাশের টেবিলে একজন বাবু খটাখট টাইপ করে যাচ্ছে কপির পর কপি—তার ক্লিয়ারিং এজেন্ট, তার প্রিন্সিপাল, ইমপোর্ট লাইসেন্সের সব কপি। টিন প্লেটের গুদামে কুলিদের চিৎকার চেঁচামেচি। নির্বিকার চিত্তে একের পর এক টাইপবাবু সব সামলায়। দুটো ফোনে অনবরত কথাবার্তা চলে—ভাও কেতনা, ডেমারেজ খাচ্ছে মাল, জাহাজ ভিড়েছে, আনলোডিং কবে হচ্ছে, তার লোক কবে যাবে, ট্রাক বোঝাই হয়ে কার ঘরে মাল পেঁাছে দেবে, এ সব নিয়ে সব সময় ব্যস্ত মানুষটা। সে গেলেই সব কেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়। টাইপবাবু পর্যন্ত কাজ বন্ধ করে দেয়। হাত ধরে অতীশকে টেনে গদিতে বসায়, তারপর একটা তাকিয়া পাশে ঠেলে দিয়ে বলে, আরাম করুন। সাহাবাবু তার মত দশ বিশ জন লোক পোষে, অথচ তার কী খাতির! সে ভেবে অবাক হয়ে যায়, মানুষটা এই ঘরে বসে, কোথায় দারুচিনি পাওয়া যায়, কোথায় জায়ফল পাওয়া যায়, তার দর তাও পর্যন্ত খবর রাখে। দুটো ফোন পৃথিবীর সব খবর এই গদিতে পেঁাছে দেয়! সেই সাহাবাবু আজ অন্য কথা বলল, মাধাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শুনেছি।

—আর বলবেন না, যেতে চাইছে না

গদিতে ধূপকাঠি জ্বলছে। সুঘ্রাণ পাচ্ছিল অতীশ। লোকটা কী জানে, তার জাহাজ বিকল হয়ে গেছিল সমুদ্রে। সে কী জানে বনিকে নিয়ে জাহাজ থেকে বোটে ভেসে পড়েছিল, লোকটার কথাবার্তা শুনলে অতীশের এমনই মনে হয়। না হলে রাজবাড়ির সব খবর লোকটা আগেই পায় কী করে। বৌ-রাণীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক সে খবরও রাখে। এই এক বিঘা জমি রাজার কাছ থেকে টেনেনসি রাইট নেওয়া। রাজাকে ধরে যদি বেনামে কিছু করিয়ে

নেওয়া যায়। অর্থাৎ একেবারে খাস তালুক বানাবার ফন্দি! মাঝে মাঝে সে পচা টাকার গন্ধ পায়, এ খবরও রাখতে পারে সাহাবাবু। তা না হলে সে গেলেই সুগন্ধী ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতে বলে কেন! এইসব রহস্য টের পায় বলেই, পারতপক্ষে অতীশ খুব দরকার না পড়লে সাহাবাবুর গদিতে যায় না। আর ওর ছোট মেয়েটা কলেজে পড়ে। সে গেলেই টের পায়, মেয়েটা বেশ চঞ্চল হয়েছে—সিঁড়ি ধরে দৌড়ে দোতলায় উঠছে, নেমে যাচ্ছে, ওঠানামার মধ্যে তার শরীর স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুন্দরী মেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠলে সে কেমন ভিতরে ভিতরে নিজেও চঞ্চল হয়ে পড়ে। চুরি করে দেখার প্রলোভন জাগে। চারুকে নিয়ে সে যে একটা বিভ্রমে পড়ে গেছে তাও কী সাহাবাবু জানে। জানতেও পারে।

তখনই সাহাবাবু ডাকলেন, ওরে কে আছিস ?

এই কে আছিসই যথেষ্ট। চা এবং মিষ্টি পর্ব শুরু হবে। অতীশ বলল, কিছু খাব না। এক গ্লাস জল দিতে বলুন!

—কী যে বলেন, সে হয়! আপনি এসেছেন, কী সৌভাগ্য আমার! কুম্ভবাবু তো বলে, আপনি মানুষ না দেবতা।

অতীশ এসব শুনে অভ্যস্ত। আসলে সে এও জানে কুম্ভবাবু তাকে দেবতা বলে না, বলে অপদেবতা। কারখানার ঘাড়ে অপদেবতা ভর করেছে। লাটে উঠল বলে। দু নম্বরী মাল না হলে বন্ধ করে দেয়! কারখানার লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দেয়!

সাহাবাবু এ খবরটাও রাখে। সহসা সাহাবাবু বলল, অতীশবাবু একটা কথা বলি।

—বলুন।

—দোষ নেবেন না বলুন। দোষ করলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন বলুন।

— ক্ষমা করে দেবার কথা উঠছে কেন!

—না অভয় দেন তো বলি।

লোকটা বলে কী! সে তো সামান্য মানুষ। সাহাবাবুর নিজেরও একটা কেনেস্তারার কারখানা আছে। বড় ছেলে তার ওটা দেখে। তার ম্যানেজারকে গাড়ি দেওয়া হয়। সে তাও পায় না। তার ম্যানেজার অতীশের মত প্যান্ট শার্ট পরে না। ধুতি পাঞ্জাবি পরে। বয়স্ক মানুষ, তার নিজের কলকাতায় ফ্ল্যাট পর্যন্ত আছে। অথচ অতীশের কাছে এমনভাবে কাতর গলায় অভয় ভিক্ষা করছে যে লোকটাকে মাথার চেয়ে এক ইঞ্চি বড় মাপের মানুষ মনে হচ্ছে না।

সে বলল, বলুন না।

—না আপনি যে বলেন না, লাভ ডাজ ব্রিং এবাউট জাস্টিস অ্যাট লাস্ট ইফ ইউ ওনলি ওয়েট!

অতীশের মনে হল এক ঝলক বিদ্যুৎ তার মধ্যে কে ঢুকিয়ে দিচ্ছে! সাহাবাবু এটা জানলেন কী করে! এ তো সেই বনি বলত। সে কী কোনো ঘোরে পড়ে অফিসে এ কথা উচ্চারণ করেছে। তার কেমন মাথাটা ঘুরতে থাকল। নিজেকে সামলে বলল, আমি একথা বলি কে বলেছে আপনাকে। বনি, নির্বান্ধব সমুদ্র, মরীচিকা এসব যে সে ছাড়া কেউ জানে না!

—কুম্ভবাবুই যেন বলল!

—কবে বলল!

—এই তো ক'দিন আগে মনে হচ্ছে। বড়ই জব্বর কথা।

—আমি কুম্ভবাবুকে বলেছি ?

—না, কুম্ভবাবুকে নয়। তবে আপনি কাউকে বলেছেন! কথাটা শোনার পর মনে হয়েছে সত্যি আপনি দেবতা। আমিও বিশ্বাস করি। আমার এই যে ব্যবসাপ্রীতি এও এক অতীব ভালবাসা থেকে। আর কিছু বুঝি না কোথাও যাই না, কেবল লেনদেন করতে ভালবাসি। সল্ট লেকে ছেলেদের নামে নামে জমি কিনে দিয়েছি, বাড়ি উঠছে, ছেলেরা মেয়েরা সবাই ভাল থাকুক এই চাই। উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে ব্যবসাটাকে এমন ভালোবেসে ফেললাম, যে আমি যা চাই হাতের কাছে পেয়ে যাই। আপনার কথা ক'দিন থেকে বড় মোহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আপনার মত মানুষই এমন কথা বলতে পারে। এমন কথা কেন জানি আমার মনে হয় আর কেউ বলতে পারে না।

এসব শোনার পর অতীশের দৃঢ় ধারণা হল, চারুকে সে ঘোরেই দেখেছে। ঘোরে পড়েই মনে হয়েছে, রাতের নির্জন ট্রেনের কামরায় চারু উলঙ্গ, সে সহবাস করছে। ঘোরে পড়ে গেলে এসব হয়। চারুর কথা নির্মলার কানে তুলে দিলেই সর্বনাশ। কুম্ভ, বউদি বউদি করে। যেন কত আপনজন। নির্মলা সরল সহজ স্বভাবের মেয়ে। বিশ্বাস করতেই পারে। কোনদিন আবার অফিসে এসে দেখবে, কেউ নেই—সব খাঁ খাঁ করছে। কেবল সিঁড়ি ধরে এক রহস্যময়ী নারী উঠছে নামছে। তার আঁচল উড়ছে, তার চুল উড়ছে হাওয়ায়। বলছে, এই আসুন না। উপরে চলুন, আমার ঘরে বসবেন। বড় সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি আপনি আসবেন বলে। রহস্যময়ী নারী বোঝে, পুরুষ, কোনো মন্দিরে ঢুকে বসে থাকতে ভালবাসে। আমরা নারীরা শরীরটাকে পবিত্র করে রাখি, মন্দিরে কেউ এসে একটু বসবে বলে। দেখুন হাত, ফুলের গন্ধ পাবেন, দেখুন না স্তন, ফলের গন্ধ পাবেন। নাভিমূলে মুখ রাখুন, চন্দনের গন্ধ পাবেন। অতীশ ভাবতে ভাবতে ভিতরে

কেঁপে উঠল। কী ভাবছে সব!

আর তখনই বিশ্বনাথ, মনোরঞ্জন ছুটে এসে বলল, শিগ্গির আসুন, স্যার। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে মনে হচ্ছে।

অতীশ চোখ তুলে দেখল, বেশ লোকের ভিড় হয়ে গেছে মাধার ঝুপড়ির চার পাশে। হৈ-হল্লা হচ্ছে।

সে ছুটে বের হয়ে গেল।

সাহাবাবু বলল, কোথায় যাচ্ছেন। এরা মানুষ না। এরা শহরটাকে হেগে মুতে নষ্ট করছে পারলে এখন আমাদের মাথায় হাগে মোতে। কিছু বলার নেই। যে যার খুশি মত ফুটপাথ দখল করছে।

অতীশ ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে।

কে যেন বলল, এই তো শালা শুয়োরের বাচ্চা ম্যানেজার এসেছে। মার শালাকে!

অতীশ ভ্রূক্ষেপ করল না।

—মার শালাকে। মাধাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়। মাধাকে ঝুপড়ি থেকে হঠাতে চায়। মাধাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছে। মার। মার! মেরে পাট বানিয়ে দে।

অতীশ কেমন আবার ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে—সেই তারবার্তা কে যেন পৌঁছে দিচ্ছে মাথায়—লাভ ডাজ ব্রিং এবাউট জাস্টিস অ্যাট লাস্ট…।

—এই মাধা!

—হুজুর।

—ওঠ বলছি।

—কোথায় যাব, স্যার?

—যাবি আমার সঙ্গে।

—এরা আমাকে যেতে দেবে না বলছে।

—কারা?

মাটি ফুঁড়ে যেন সেই হাঙ্গামাকারীরা দৃশ্যমান হতে থাকল। হাতে লোহার রড। পাইপ গান। আজ তারা বিপ্লব শুরু করবে বলে হাজির। মাধাকে দিয়েই বিপ্লব শুরু করতে চায়। মাধার ঝুপড়ি বেদখল হয়ে গেলে কে দেখবে! অন্যায় অবিচার চলছে—মাধার যাও আশ্রয় ছিল, তাও আজ ভেঙে চুরমার করে দিতে এসেছে নিমকহারাম ম্যানেজার। মার শালাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অতিকায় বিস্ফোরণ।

অতীশ অবিচল। নড়ছে না। ডাকছে, এই মাধা, বের হয়ে আয়।

পচা, গোরা ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। মাধা যাবে না।

—যাবে।

পচা, গোরা পেটো ফাটিয়ে ভয়ের উদ্রেক করতে চেয়েছে। কারখানার সবকটা লেজ তুলে পালিয়েছে। রাস্তার মোড়ে জটলা

কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। আর লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই!

অতীশের মাথার উপর লোহার রড উঠে আসছে।

সেই তারবার্তা – লাভ ডাজ ব্রিং এবাউট…

সে স্থির অবিচল। নড়ছে না। কে যেন ভিতরে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে।

সে ডাকল মাধব, তুই মরে যাবি। তোর ভালর জন্য বলছি বের হয়ে আয় ঝুপড়ি থেকে। কী করেছিস, হাত মুখ ফুলে গেছে। এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে। তোর জন্য বেড পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে তুই ওষুধ পাবি, পথ্য পাবি, যে ক'দিন বেশি বেঁচে থাকা যায়! মানুষ, মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না। আয় লক্ষ্মী ছেলে। পারুল তুমি দেখ ওর ঝুপড়িটা।

মাধা বের হয়ে এল। হাঁটতে থাকল। ভেবে পেল না মানুষটা এত জোর পায় কী করে!

অতীশ আগে, মাধা তার পিছনে। দুজনেই হাঁটছে আরোগ্য লাভের জন্য। রাস্তা ফাঁকা। কেউ নেই।

—হ্যালো রাজবাড়ি!

—হ্যাঁ কে বলছেন!

—প্রাইভেট অফিস!

—হ্যাঁ কে বলছেন!

—তুমি সুরেন!

—আজ্ঞে।

—বাবাকে দাও।

—অ. কুম্ভদা!

—আরে কুম্ভদা, কুম্ভদা পরে করবে। শিগগির দাও।

কুম্ভ ফোনের মুখ চেপে, বলছে এই তোরা সব দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ভিতরে ঢুকে যা! দরজা জানালা বন্ধ করে দে। এরা বোমবাজি এখানেও এসে শুরু করতে পারে। সুধীর, এই ব্যাটা শুয়োরটা যে যায় কোথায়! জানালা বন্ধ কর।

—কুম্ভ!

—হ্যাঁ বাবা, সর্বনাশ। অতীশবাবুকে ঘিরে ফেলেছে।

—কারা ঘিরে ফেলেছে!

—বস্তির লোকেরা!

—কী দায় পড়েছে! রাজার বস্তি, রাজার লোককে ঘিরে ফেলতে পারে!

—দায় না, আপনি কী বুঝছেন না, কারখানায় চাকরি হচ্ছে না ওদের লোকদের, বদলা নিচ্ছে। এটা অজুহাত!

—কিসের বদলা!

—আমাদের মাথা।

—তোমার মাথা! স্পষ্ট করে বল!

—মাথার রেড পাওয়া গেছে বলেছি না। সেই নিয়েই ক্রাইসিস। ভিতরে খবর দিন। কুমার বাহাদুরকে বলুন।

—কুমার বাহাদুরকে বলে কী হবে! থানায় খবর দে। ওকে ঘিরে রেখেছে, আর তোরা কী করছিস! শ্রীনাথ কী করছে!

কুম্ভ এবারে আর এক গোলমালে পড়ে গেল! বৌ-রাণী বলবে তোরা কোথায় ছিলি! ওকে ঘিরে রেখেছে, তোরা কী করছিলি!

—আমরা কী করব! বললাম, শিগ্‌গির দাদা পালান, আমরা পালালাম, তিনি পালালেন না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—ও দাঁড়িয়ে থাকল, আর তোরা পালালি!

কুম্ভ অবাক। কোথায় বাবা তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে! আসলে কুম্ভ জানে বৌ-রাণী কিংবা কুমার বাহাদুরকে বললে এক কথা, কুম্ভ কোথায় ছিল, কারখানার এতগুলি লেবার, প্রিণ্টার, লেদম্যান সবাই থাকতে অতীশবাবুকে ঘিরে রাখে এমন সাহস হয় কোথা থেকে! এক ঝলকে সব ভেবে কুম্ভ বলল, থানায় ফোন করে দিন শিগ্‌গির।

—কেন, তুই করতে পারলি না।

সে করতে পারত। থানায় ফোন না করে রাজবাড়িতে ফোন কেন যে করতে গেল! পালিয়ে নিজে প্রাণে বেঁচেছে—ওর সঙ্গে যারা গেছিল তারাও, কিন্তু আসল লোকটাকেই তারা ঘিরে রেখেছে। ঠিক ঘিরে রেখেছে, কে যেন তখন বলল, মাথায় রড তুলে বাড়ি মারতে ছুটে গেছে স্যার! তবে কী ওখানে এখন অতীশবাবুর লাশ পড়ে আছে!

চার পাশের বাস্তর সব দরজা জানালা বন্ধ। খালপাড়ের দিকে কিছু লোকের ভিড়, তারা তামাশা দেখছিল, ট্রামরাস্তার মোড়েও জটলা। মারদাঙ্গা শুরু হলে যা হয়, দরজা জানালা সব পটাপট বন্ধ হয়ে যায়। যে যার ঝাঁকা মুটে নিয়ে দৌড়ায়। সহসা সারা রাস্তা খাঁ খাঁ করতে থাকে। কুম্ভ কী করবে বুঝতে পারছে না। সেও কারখানার গেট বন্ধ করে বলছে, লোহার রড-টড হাতের কাছে যা পাচ্ছ তুলে নাও। আমি থানায় ফোন করে দিচ্ছি।

আর তখনই জানালায় উঁকি দিয়ে যাদব চিৎকার করে উঠল, আসছে। আসছে।

কেউ বলল, বড়বাবু আসছে।

অতীশকে বয়স্করা বড়বাবু বলে, ছেলে ছোকরারা স্যার বলে, আর একদল আছে যারা ম্যানেজারবাবু বলে। আসছে আসছে বলায়, প্রথমে কুম্ভ ভেবেছিল, পুলিসের গাড়ি বড় রাস্তায় এসে গেছে। অতীশবাবু ফিরে আসতে পারেন, এটা কুম্ভ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না। বড়বাবু বলায় ভেবেছে, ও সি নিজে আসছেন। তার বুক ধড়ফড় করছে। কাঁপছে হাত পা। নিমেষে অঞ্চলটায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল! শুয়োরের বাচ্চা মাথার এত রোয়াব! এবারে এসে পড়ায় সে বলল গেট খুলে দে। আমি বের হচ্ছি। দেখি কার কত হিম্মত। তা লাশ পেলে ভালই হয়, অন্তত কারখানার ঘাড়ের অপদেবতাটির হাত থেকে তবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যা জ্বালাচ্ছে।

অতীশবাবু লাশ হয়ে গেছে ভাবনায় কুম্ভর মন কেন জানি প্রসন্ন হয়ে গেল। সে ভাবল, এসব মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। মাথা খারাপ লোক। না হলে এভাবে মাথায় রড তুলে মারতে আসলে পাগল না হলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে? যাই হোক এখন কী করা! অকুস্থলে একবার যেতে হবে পুলিসের সঙ্গে। ফোনে যদি কাবুলকে পাওয়া যেত, বেটা শ্রীনাথ বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়, রাজবাড়ির পাইক, ট্যাক্স আদায় করার সঙ্গে মেয়েছেলের সম্পর্ক আছে বস্তিতে—বেটা নির্ঘাত সেখানটায় পড়ে আছে। এসব বিষয়ে হাঙ্গামা হুজ্জোতির শেষ থাকে না।—কেন অতীশ গেল, তোরা কী করছিলি—বার বার এই একটা প্রশ্নের কামড়ে পাগলা কুকুর হয়ে গেছে—এখন পুলিস যখন এসেই গেছে—বিষয়টাকে কী ভাবে সাজালে, সে ধোওয়া তুলসীপাতা সেজে থাকতে পারবে সেই চিন্তায় অস্থির।

আর তখনই দেখল গেটের বাইরে সবাই বের হয়ে গেছে। সেও বের হয়ে গিয়ে যা দেখল একবারে হতভম্ব। অতীশবাবু, আসছেন। যেন এই বস্তিতে কিছুই হয়নি। কিছু দরজা জানালা খুলে গেছে। অনেকে বেরও হয়ে এসেছে! কলে জল এসেছে বলে একটি যুবতী নারী সতর্ক চোখে বাইরে বের হয়ে এল—আর সেও অবাক হয়ে দেখছে।

এই লোকটাকে নিয়েই তো ঝামেলা। লোকটাকে দেখলে, যুবতীরা চোখ ফেরাতে পারে না। কিন্তু জল না নিলে কখন আবার কোন দিকে পেটো পড়তে থাকবে কে জানে—বস্তিতে বাস করে যুবতীটি বুঝেছে, দরকারে জলও নিতে হয়, দরকারে দরজা জানালা বন্ধ করে বসেও থাকতে হয়। এখন সময় বড় খারাপ যাচ্ছে। পুলিস নিজেই তটস্থ। প্রকাশ্য দিবালোকে তিন চারজন যুবক পুলিসের পিস্তল কেড়ে নিচ্ছে। পুলিসের গলা কেটে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তে রাস্তা সুনসান করে দিতে পারে। তখন মনে হয়, কিছু কাক ছাড়া শহরটায় মানুষজনের বাস নেই। এখানে সেখানে গাড়ি থেমে থাকে। খালি ট্রাম, খালি বাস। যেদিকে পারছে ছুটছে; যাবেন না,

বোমা পড়ছে, যাবেন না।—'

অতীশের পিছু পিছু মাধা। গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার। মাথায় গরম টুপি, গলায় মাফলার। লুঙ্গি পরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছে। শীতের ঠাণ্ডায় গোড়ালি এত ফেটে যায় যে পা ফেলতে পারে না। ক্যাম্বিসের জুতো —একটাও তার নিজের নয়, কেউ না কেউ দয়া দেখিয়ে দিয়ে গেছে। কেবল লুঙ্গি দেয় না বলে, সেটা পাছার দিকে ফাটা। ছেঁড়া লুঙ্গির ফাঁকে পাছা দেখা যাচ্ছে। ওটা মাধা ইচ্ছে করেই দেখাচ্ছে কি না কে জানে!

সব ঠাণ্ডা। বস্তির লোকজন আবার দরজা জানালা খুলতে থাকল। উঁকি দিয়ে দেখল। অনেকে বের হয়ে দেখছে, কারখানার ম্যানেজার একটা নোংরা পুঁটুলি হাতে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, পেছনে মাধা। ম্যানেজারের উপর কম বেশি সব এলাকার মানুষদেরই যেমন আক্রোশ থাকে—এই এলাকায়ও তা আছে। পোকা-মাকড়ের মত মানুষ বাড়ছে। ঘরে ঘরে বেকার, কেউ কাজ পায় না কারখানায়। সব বাইরের লোক। রোষ আছে তাদের। কারখানার লোকদের সঙ্গে কালীতলায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে শুনে তারা মজাই পাচ্ছিল। সেটা যে এত সহজে থেমে যাবে, বস্তির লোকজন ভাবতে পারেনি।

দারোয়ান ছুটে গিয়ে অতীশের হাত থেকে নোংরা পুঁটুলিটা প্রায় কেড়েই নিল।

কুম্ভ দেখছিল আর ক্ষেপে যাচ্ছিল! তুই কারখানার ম্যানেজার, আর তুই হাতে নোংরা পুঁটুলি নিয়ে হাঁটছিস। ইস্ বউ-রাণীর কানে কথাটা উঠলে যে কী হবে! এটা হাতে কেন! মাধাকে দেখে পাছায় একটা লাথ কষাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কারখানার লোকেরা সবাই বাইরে।

অতীশ বলল, কী ব্যাপার, তোমরা সব কাজ ফেলে বাইরে কেন! ভিতরে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সব ভিতরে।

কুম্ভ, হরিচরণ, প্রিণ্টার, সুপারভাইজার আর দারোয়ান শুধু রোয়াকে দাঁড়িয়ে।

অতীশ যেন কিছুই হয়নি এমন চোখে মুখে দেখল সবাইকে।

কুম্ভ কথা বলছে না। কারণ ফোনে রাজবাড়িতে যা খবর দিয়েছে, তাতে সবাই ছুটে এল বলে! এসে দেখবে, কোনো গণ্ডগোল নেই। খামকো সবাইকে তটস্থ করে তোলা। রাধিকাবাবু নিজেই ছুটে আসতে পারেন। পুত্রের ফোন পেয়ে কুমার বাহাদুরকে জানালে তিনিই তাকে পাঠাতে পারেন, কাবুলও আসতে পারে। গাড়ি করে সবাই ছুটে এল বলে! তার আগেই ফোনে জানিয়ে দেওয়া ভাল—কুম্ভ, অতীশবাবুকে দেখতে পেয়ে মাথায় এত

সব জট নিমেষে খুলে ফেলে বলল, হ্যালো, রাজবাড়ি?

—রাজবাড়ি।

—প্রাইভেট অফিস!

—হ্যাঁ

—কে সুরেন?

—কুম্ভদা!

—বাবাকে বল, কিছু হয়নি। অতীশবাবু চলে এসেছেন।

—ধরুন দিচ্ছি। বাবুকে আপনি নিজেই বলুন।

—আমি কুম্ভ।

—বল।

—কিছু হয়নি।

—এই যে বললি, অতীশকে ঘিরে ফেলেছে।

—না ঘিরে ফেলেনি। অতীশবাবু ফিরে এয়েছেন। কোনো ঝামেলা হয়নি!

—কুমার বাহাদুর তো বললেন, ওরা কেন যে ঝুট ঝামেলায় জড়ায় বুঝি না! ঝামেলা হলে, থানা পুলিসের কাজ। আমরা কী করব! কুম্ভকে থানায় ফোন করতে বলুন।

কুম্ভ খুব হাল্কা হয়ে গেল। কুমার বাহাদুর ঝামেলায় জড়াবেন কেন! রাজবাড়ি থেকে লোকজন পাঠালে, কুমার বাহাদুর নিজে জড়িয়ে যেতে পারেন —যা দিনকাল, এখন টাকা না খসালে কোথাও কোনো কাজ হয় না। তোমরা কারখানা চালাও, তোমরাই লড়বে। বস্তির মাতব্বরদের হাতে রাখতে জানলে, গণ্ডগোল হয়, হতে পারে! আসলে যে যত ট্যাক্টফুল তার উন্নতি তত চড় চড় করে উপরে ওঠে।

সে সহসা বাইরে বের হয়ে মাধার উপর হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। এই হারামজাদা, কী ভেবেছিস তুই? হ্যাঁ এলি কেন? সুড়সুড় করে চলে এলি। তোর ইয়ার দোস্তরা কোথায়? অতীশ ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, যেন ছুঁলে রোগের জীবাণু তার গায়েও ছড়িয়ে পড়বে—কুম্ভ সট করে দূরে সরে গিয়ে পথ করে দিল অতীশকে।

অতীশ একটা কথাও বলছে না।

সে ভিতরে ঢুকে পাশের বাথরুমে চলে গেল। আগেকার ম্যানেজার খুবই শৌখিন লোক ছিলেন। দিন রাত কারখানায় পড়ে থাকতেন। কারখানায় পড়ে থাকলে হাগা মোতার কাজ থাকে। চান টান করতে হয়। তাই বাহারি বাথরুম। রাজা অমত করেন নি। রাজার কারখানা আছে এটাই বিলাস— রাজার শুধু জমিদারিই নেই, কলকারখানাও আছে। এই বিলাস থেকেই

আগেকার ম্যানেজার বুঝেছিলেন, কারখানার লাভ অলাভে রাজার কিছু আসে যায় না। এস্টেট থেকে যে কিছু সাহায্য করতে হয় না এই ঢের। বুড়ো ম্যানেজার সেই সুযোগে অফিসের পাশে নিজের একটা শৌখিন বাথ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

অতীশ এখন সেখানে হাত ধুচ্ছে। কী নোংরা, দুর্গন্ধ—! সে মুখ হাত ধুয়ে চেয়ারে বসল না, দাঁড়িয়েই বেল টিপল।

সুধীর এলে বলল, কুম্ভবাবুকে ডাক।

কুম্ভ বাইরে থেকেই শুনতে পাচ্ছে সব। সে নড়ছে না। কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারে না, কীভাবে এত বড় একটা হামলার মোকাবেলা করে এসে মানুষটা এত নির্বিকার থাকতে পারে! কাউকে দোষারোপ পর্যন্ত করল না। বলল না, এই কী, তোরা সব আমাকে একা ফেলে পালালি! তোরা কী রে। তোরা পারলি আমাকে ফেলে আসতে!

কুম্ভ চড়া গলায় মাধাকে হম্বিতম্বি শুরু করেছে, সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! ভেবেছিলি, তোর স্যাঙ্গাতরা রক্ষা করবে। পুলিস দিয়ে তোকে ঝুপড়িছাড়া না করতাম তো আমার নাম কুম্ভ না। বেটা, তোর ভালোর জন্য হাসপাতালের বেড যোগাড় করলাম, তুই আমাদের মাথা নেবার জন্য উসকে দিলি।

মাধার এক কথা, আমি কী করব বাবু!

—কী করবি! মরবি, এলি কেন?

—স্যার যে বলল, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

—স্যার বলল, তোকে বেঁচে থাকতে হবে!

—তাই তো বলল। বিশ্বাস না হয় স্যারকে জিজ্ঞেস করুন! বেঁচে থাকতে বললে মরি কী করে? গোরা, পচারাও বলল, তা স্যার ঠিক বলেছেন, বেঁচে থাকতে হবে। ওকে আপনি নিয়ে যান। বলল, আমরা জানেন তো স্যার চোখ রাঙানিকে একদম বরদাস্ত করি না! শালারা বাপের লাট পেয়েছে, গাড়ি চড়ে মাগি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ফুর্তিফার্তা করলে দোষের নয়। যত দোষ আমাদের!

—কে মাগি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, শুয়োর কোথাকার! নিজে করছিস, এখন সবাইকে মজাতে চাস! কে মাগি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বল!

—ওরা তাই বলে।

—ওরা কারা!

—পচা, গোরা, গৌর সবাই বলে। বাবুরা সব লুটেপুটে খায় বলে। দেখলেই ঠেঙাতে বলেছে।

—কাকে?

—বাবুদের। আর ওর জন্যই তো বলল, বেঁচে থাকা দরকার।

—অতীশবাবুর সামনে বলেছে!

মাধা একহাত জিব বের করে বলল, না। অরা তা পারে বলতে। পচা লোহার রড তুলেছিল মারবে বলে।

—আর তুই দেখছিলি!

পচা মারতে পারল না। ওর হাত থেকে রড খসে গেল! পায়ের কাছে বসে বড়ল। ওই দেখে সব পালাতে থাকল। গুরুর গুরু আছে ভবে বলেই মাধা গান জুড়ে দিল।

বিষয়টা কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে কুম্ভর কাছে।—আরে ধুস, বার বার বেল বাজছে, সুধীর ছুটে আসছে, স্যার ডাকছেন।

—যাচ্ছি, তেনার কী, কিছু হলেই কুম্ভর ডাক পড়বে।

আসলে যেন অতীশ না শুনতে পায় এমন করে বলা—যেন দারোয়ান, হরিহর, প্রিন্টার, সুপারভাইজার বোঝে, কুম্ভবাবুই আসলে সব। নৈবেদ্যের মাথায় বাতাসার মত অতীশবাবুকে বসিয়ে রাখা শুধু। হামলাবাজরা যে ভেগেছে, তার ফোনের খবর পেয়েই। থানায় ফোন গেছে, গাড়িতে পুলিস ফোর্স আসছে—এসব খবর না পেলে শালোরা কখনও হটে যায়! সে এ সবই এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে মাধার কাছে এসে হাঁকছে, ওঠ শুয়োর, এই মনোরঞ্জন, নিয়ে যাও। ট্যাক্সি ডেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি না।

আবার সুধীর!

এবারে কুম্ভ বেশ জোরগলায় বলল, আজ্ঞে যাই।

তারপর ভিতরে ঢুকেই আর এক রূপ!—দাদা আপনি নিজের কথা ভাবলেন না! ওর জামাকাপড় বিছানা সব আপনি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন!

—মাধা যে বলল, সে কিছু ফেলে যাবে না। তাই নিয়ে এলাম।

—ও ফেলে যাবে না বলল, আর আপনি ওগুলো নিয়ে এলেন! মাধা অসুখের ডিপো একটা জানেন। সারা গায়ে বীজাণু থিকথিক করছে। রোয়াকে রেখেছেন, ডেটল, ফিনাইল ঢেলে সাফ করতে হবে। কে ধরবে ওগুলো!

—মাধা যে বলল, ওতে ওর সব আছে। একটা কিছু খোয়া গেলে আমাদের নামে মামলা ঠুকে দেবে।

কুম্ভর মাথা ফের গরম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। আসলে রড তুলে মাথায় বসাবার সময় দাঙ্গাবাজ পচা কী টের পেয়েছে, লোকটা আসলে পাগল, কিংবা চোখে অস্বাভাবিক কিছু এমন টের পেয়েছে যা দেখলে অন্তরাত্মা কেঁপে যায়! ধুস্ যত বাজে চিন্তা—সে এখন নিজেকে

সামাল দেবার জন্য গাওনা গেয়ে রাখছে, পরে কোনো কৈফিয়ত যদি দিতে হয়, সে বলল ভাগ্যিস থানায় ফোন করে দিলাম। ফোর্স সঙ্গে সঙ্গে হাজির। ও দেখেই শালোরা ভেগেছে।

অতীশ ঠিক জানে না, তখন কী কী ঘটেছিল। অতীশের মনে হচ্ছিল এখন এটাও আর এক ঘোরে পড়ে করা। যখন চারপাশ থেকে তাকে সবাই ঘিরে ধরেছে, তখন সে এক আশ্চর্য মজা অনুভব করছিল। ওরা তাকে খুন করতে চায়। খুন বিষয়টাই মজার! আর্চির মত খুনের সময় কী কী কষ্ট ভোগ করতে হয় এ-বেলা যেন সে এটা টের পাবে। এটা তার নিয়তি। সে অনেকবার নিজে দমবন্ধ করে দেখেছে, কেমন হাঁসফাঁস করতে হয়। আর্চির বুকের উপর বসে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে খুন করেছে—সে আর্চির চেয়ে অনেক বেশি মজবুত, লম্বা এবং জাহাজে কয়লা মেরে হাতে পায়ের পেশিতে তার দানবের মত শক্তি। খুন করবার সময় বোধহয় ভেতরের শক্তি আরও বেশি প্রবল হয়ে ওঠে—দুর্বল হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। ভয়েই মরে যায় অর্ধেক বাকিটা খুনীর কাজ।

সে ঠিক বুঝতে পারল না, পুলিস এসেছিল কি না। তার মনে আছে সে তখন একটা কথাই বলেছে, তোমরা আমাকে মারছ কেন! মাধার বেঁচে থাকা দরকার। আর কি বলেছিল, ঠিক মনে করতে পারছে না—আর তখনই কী মনে পড়ায় বলল, কুম্ভবাবু আমি কবে বলেছি, লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস অ্যাট লাস্ট, ইফ ইউ ওনলি ওয়েট।

—আমি এ-কথা বলেছি কে বলল!

—সাহাবাবু।

—ওকে বলতে যাব কেন!

হামলা শুরু হবার আগে অতীশ ভাগ্যিস সাহাবাবুর গদিতে গিয়ে বসেছিল—না হলে মাধাকে নিয়ে আসা যেত না। সে গদিতে বসেই লক্ষ্য করছিল কালীতলায় মানুষের জটলা বাড়ছে। কুম্ভবাবু, ইউনিয়নের পাণ্ডা মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় কিছুতেই মাধাকে রাজি করাতে পারছে না। কারখানা থেকে মাধার নির্বাসন ঘটেছে, তা টি বি রুগীকে কে রাখে! বস্তি থেকেও। ধরা পড়ে গিয়ে মাধার উপর অকারণ সব মানুষ বিরূপ, তার ঝুপড়ি সম্বল, সে হাসপাতালে বেড পাওয়ায় যেতে রাজি না হতে পারে, ঝুপড়ি ছেড়ে উঠলে মাধার শেষ আশ্রয় যাবে—এ-সবই সাহাবাবুর গদিতে বসে অতীশ ভাবছিল—কুম্ভই চায়নি কারখানার খোদ ম্যানেজার একটা তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক, এ-সব কারণে অ্যাসিস্ট্যান্ট কুম্ভর উপর একটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছে, কিন্তু থানা থেকে ফোর্স পাঠিয়েছে, সে কেমন বোকার মত আবার বলল, সাহাবাবু কিন্তু বললেন আপনি বলেছেন। কবে আপনাকে

আমি এ-সব কথা বলেছি! বলুন!

কুম্ভ নিরতিশয় বিষণ্ণ বোধ করছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে কুম্ভ দেখছে, মাধা নেই, তার ঝুপড়ি নেই, হাসপাতালে নিয়ে যাবার দৃশ্যও নেই—একেবারে অন্য দৃশ্য, লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস…যদি বলেই থাকি তবে দোষের কী! কবে যেন কথাটা কুম্ভ শুনেছে, অতীশবাবু নিজেই কী বলেছেন! কোনো দুনম্বরী কারবার থেকে কুম্ভকে মুক্ত করার সময় কী কথাটা বলেছিলেন, না পচা টাকার গন্ধ পাবার সময়, পচা টাকার গন্ধ পায় লোকটা। কুম্ভর হা হা করে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন সিরিয়াস অভিযোগ শুনে সে হাসতেও পারছে না! কুম্ভ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, আপনি নিশ্চয়ই বলেছেন, আপনি না বললে জানব কি করে? কথাটা তো খারাপ নয়। ভারী সুন্দর কথা! আপনি নিশ্চয় এ-সব বিশ্বাস করেন। আপনার মত মানুষই এমন কথা বললে শোভা পায়। ওতে আপনার ক্ষোভ হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। যদি বলেই থাকি, খারাপ কি করেছি!

অতীশ তাকিয়েই আছে।

কুম্ভ এমন ঠাণ্ডা চোখ দেখলে ঘাবড়ে যায়। কিন্তু এ মুহূর্তে সে বিশ্বাসই করতে পারছে না অকারণ একটা অভিযোগ এনে তাকে দুর্বল করে দেবে! আসল অভিযোগ তো পালালেন কেন। আমাকে একা ফেলে আপনারা পালালেন কেন। আপনারা এত ভীরু দুর্বল! মাধা অসুস্থ। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। চোখ রাঙালে যাবে কেন।

সে সব অভিযোগ অতীশবাবু তুলছেনই না। কুম্ভ এবারে পাল্টা অভিযোগ তুলল, আপনি ওর নোংরা পুঁটুলিটা যে আনলেন, কার কাছে ওগুলো গচ্ছিত রাখবেন।

অতীশ আসলে তলিয়ে যাচ্ছিল। সে জাহাজের নাবিক ছিল এ-খবর কম বেশি সবাই রাখে। গভীর সমুদ্রে ঝড়ে পড়ে অচল হয়ে পড়ায় জাহাজ ছাড়তে হয়েছিল, সে খবরও অনেকে রাখে। নাবিকদের অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছিল পত্রপত্রিকায় সে খবর সে সময় প্রকাশ হয়েছিল। কাপ্তান স্যালি হিগিনস, সে, কাপ্তানের একমাত্র তরুণী কন্যা বনি এবং সারেঙ জাহাজ ছেড়ে পালায় নি, এমন খবর দেশে ফেরার পর কোনো কাগজে প্রকাশ হয়েছে বলে সে জানে না। অচল জাহাজেই তারা কিছুদিন বসবাসের পর খাবার এবং জল ফুরিয়ে গেলে কাপ্তান তাকে এবং বনিকে বোটে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা-ছাড়া বোটে সে এবং বনি, অজ্ঞাত এক সমুদ্রে তারা ভাসমান, দুটো ক্রস, বাইবেল, মাসখানেকের মত খাবার এবং জল আর একটা পাখি, লেডি অ্যালবাট্রস—এই তিনজন মাত্র জানে লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস ইফ ইউ ওনলি ওয়েট অ্যাট লাস্ট।

আর কেউ জানে না। দেশে ফিরে সে তার সেই অজ্ঞাতবাসের কথা কাউকে বলেনি। বাবা তার বিষণ্ণতা লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে বলতেন, তোমার কী হয়েছে! যখন নির্মলার সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে আলাপ, সেও প্রশ্ন করেছে, তুমি এত চুপচাপ থাক কেন! তুমি এত বিষণ্ণ কেন! নির্মলাও বিয়ের পর মাঝে মাঝে কেমন জলে পড়ে গেলে বলত কেন তুমি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাক! সে নির্মলাকে কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি।

প্রকাশ করতে পারলে সে হাল্কা বোধ করত।

প্রকাশ করতে পারলে বোধ হয় আর্চির প্রেতাত্মা তাকে তাড়া করতে সাহস পেত না।

কিন্তু সেই অজ্ঞাতবাসের জন্য তার আচরণই দায়ী। যেমন সে ভেবে থাকে, আর্চিকে খুন না করলে, জাহাজের বয়লার চক বসে যেত না। প্রপেলার স্যাফট দুমড়েমুচড়ে যেত না। স্টিয়ারিং এঞ্জিনে ধস নামত না। এমন কী ট্র্যান্সমিশান রুমও ঝড়ে উড়ে যেত না। ঝড়ের মধ্যে সে খুন করেছিল আর্চিকে। খুন না করলে বনিকে সে ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে পারত না। শুধু কী ধর্ষণ, দীর্ঘ সমুদ্র সফরে বালকের ছদ্মবেশে কাপ্তানের তরুণী কন্যা জাহাজে যুবতী হয়ে উঠছে, সে আর আর্চি বাদে কেউ তা টের পায়নি। দুই প্রতিপক্ষ। আর্চি তাকে দিনের পর দিন স্টোক-হোল্ডে নামিয়ে নির্যাতন করেছে। আর্চি তার ওপরওয়ালা। আর্চি অকারণে তাকে ঝড়ের রাতে বিলজে নামিয়ে বরফ ঠাণ্ডা জলে কাজ করতে বলেছে। জাহাজের তলায় জলের বিশাল ট্যাংক, ট্যাংকের ফাঁকফোকরে ঢুকে যাওয়া, তলা সাফ করা কিংবা উষ্ণ সমুদ্রে, বয়লারের নিচ থেকে ছাই তুলে আনা—এমন সব দুরূহ কাজ দিত যে, মাঝে মাঝে তার প্রাণ সংশয় দেখা দিত। খুনের পেছনে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে সে এত দীর্ঘকাল পরেও তা টের পায়।

অজ্ঞাতবাসের কথা বলতে গেলে, শুরুই করতে হবে, সে জাহাজের মেজ-মিস্ত্রি আর্চিকে খুন করেছিল!

বাবা শুনলেই আঁৎকে উঠবেন, তুমি খুনী।

নির্মলা বিশ্বাসই করতে পারবে না, সে খুন করতে পারে। টুটুল মিণ্টু শুনলে বলবে, বাবা তুমি মানুষও মেরেছ!

সে বলতেই পারে না, লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস ইফ ইউ ওনলি ওয়েট অ্যাট লাস্ট।

পালে হাওয়া না থাকলে, নিথর সমুদ্রে মরীচিকা দেখে ভেঙে পড়লে বনি তাকে এ-সব বলে প্রেরণা দিত। সে এসব কথা কুম্ভবাবুকে বলতে যাবে কেন! চারুর কথা উঠতেই কুম্ভ বলেছিল, চারু কে? চারু পিয়ারিলালের ভাইঝি—তাও কুম্ভ অস্বীকার করেছে। এমন মানুষকে সে কেন বনির সেই সব কথা

বলতে যাবে! কুম্ভ এমনও বলেছে, আপনি দাদা ঘোরে পড়ে যান। টের পান না। ঘোরে পড়ে চারুকে দেখেছেন।

অতীশ ভয়ে চারুর নাম পর্যন্ত এখন উচ্চারণ করে না। বৌ-রাণী পর্যন্ত তাকে ধিক্কার দিয়েছে, তুই কীরে চারু চারু করে সবার মাথা খাচ্ছিস!

চারুর কথা সত্যি তবে কেউ জানে না।

আসলে এই হল অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। পাপবোধ একটা লোককে নিরন্তর তাড়া করলে শেষে বোধ হয় মানুষ পাগল হয়ে যায়। এই যে এখন মাধাকে নিয়ে আসতে পারল সেই এক পাপবোধের যন্ত্রণা থেকে। মৃত্যু অকিঞ্চিৎকর, বেঁচে থাকা অনেক বড় ব্যাপার। মাধাকে নির্ভয়ে আজ সে-কথা বলতে পেরেছে। পেটো পড়ছে, লোহার রড নিয়ে তাড়া করছে সে সব দেখেও বিচলিত বোধ করেনি। কত দীর্ঘকাল পর বনির এক একটা কথা তার মগজের মধ্যে ভেসে আসছে, আর অবলীলায় এমন কাজ করে ফেলছে, যা পাগলের কাণ্ড ছাড়া কিছু না। কারণ সে কারখানায় ঢোকার মুখেই যেন কথাটা শুনেছিল, পাগল না হলে এমন হল্লার মধ্যে কেউ এত স্থির অবিচল থাকতে পারে!

কুম্ভ দেখছিল, কী গভীর ঠাণ্ডা চোখ অতীশবাবুর। সে জানে এই ঠাণ্ডা চোখই বাবুটির মাথায় এক সময় ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকার নির্দেশ দেবে। যেন অতীশবাবুকে কিছুটা সজাগ করে দেবার জন্য বলল, আপনার ঘেন্না-পেত্তা নেই। কফ থুথু কী না লেগে রয়েছে। বেটার রক্তবমি পর্যন্ত। ওগুলো পুড়িয়ে না দিলে, ব্যাধি সংক্রামক কত বোঝেন না! মাধা কিছুই ফেলে আসতে না পারে, অসুখে ভুগে ভুগে ব্যাটা পাগলা কুকুর হয়ে গেছে, কাকে কামড়াবে ঠিক নেই। কিন্তু আপনি তো আর পাগলা কুকুর নন, যে কামড়াবার জন্য যত রাজ্যের অসুখ নিয়ে কারখানায় হাজির হবেন।

অতীশ বলল, তাহলে আমি বলেছি বলছেন!

—কী বলেছেন!

—এই যে বললাম, লাভ ডাজ ব্রিং···

শুয়োরের বাচ্চা ভাবি ভুলবার নয়। কুম্ভ মনে মনে অতীশ সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে গেলে এ-ছাড়া অন্য কোনো জন্তুর সঙ্গে লোকটাকে তুলনা করতে পারে না। পাছা চুলকে তার ঘা করে ফেলেছে, তার ছ্যাঁচড়া স্বভাব যে কত অধিক এই লোকটার জন্য, বৌ-রাণী কুমার বাহাদুর পর্যন্ত তা টের পেয়ে গেছে!

কুম্ভ বলল, না আমি এমন কথা কাউকে বলি নি।

—না বললে সাহাবাবু জানলেন কী করে!

—তার আমি কী জানি!

আচ্ছা ফ্যাসাদ। এমন উজবুক লোকের পাল্লায় পড়তে হবে কুম্ভ যেন

দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি। আর কুম্ভ এও জানে—লোকটা গোঁয়ার, সহজে ছেড়ে দেবে না।

সে বুঝিয়ে বলল, দাদা এখন মাধাকে নিয়ে ভাবুন। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কিছু টাকা পয়সা দিন ইউনিয়নের পান্ডাদের দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তাই তো। এ সময় এমন একটা বেয়াড়া তক্ক জুড়ে দিলে লোকের আর দোষ কী—অতীশ দাঁড়িয়েই টেবিলের নিচের দিকের একটা দেরাজ খুলে বলল, কত দিতে হবে ?

—ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে ছেড়ে দেন।

—আপনি যাবেন না ?

—আমি কী করতে যাব। কাগজপত্র নিয়ে দেখালেই হবে।

অতীশ টাকা বের করে বলল, আমি বাসায় যাচ্ছি।...কাকে যে বললাম লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট !

টাকা গুনতে গুনতে কুম্ভ চোখ ট্যারচা করে বাবুটিকে দেখছে। আর এক কামড়। শালা মানুষের কত রকমের কামড় থাকেরে বাবা, লাভ ডাজ ব্রিং ছাইপাঁশ কী সব বলছে—সে এমন কথা কাউকে বলেই নি !

অতীশ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

কুম্ভ বলল, একটু দাঁড়ান। বলে সে ইউনিয়নের পান্ডাদের ডেকে অতীশের সামনেই টাকাটা দিল তাদের হাতে। কাগজপত্রের ফাইল দিয়ে দিল। বলল, শিগ্‌গির চলে যাও।

আর তখনই দেখল মাধা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সবাইকে প্রণাম করছে। বলছে, আপনারা সবাই প্রার্থনা করুন, আমি যেন ভালো হয়ে উঠি।

কুম্ভ বলল, হয়েছে যা। আমরা সব সময় তোর জন্য প্রার্থনা করব। যা তো। উঠে গিয়ে বস। মাথা ঠেকাতে হবে না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, এখন মানে মানে রওনা হয়ে যাও।

অতীশ ভিতরের দিকে। এত ভেতরে ঢোকার হুকুম মাধার নেই। মাধা দূর থেকেই গড় হয়ে বলল, যাই স্যার। আমার জিনিসগুলি থাকল। কাউকে দেবেন না স্যার। পারুল চাইলেও না।

কুম্ভ আর পারল না !—ওতে কি আছে তোর! লাখ টাকার মাল রেখে যাচ্ছিস মনে হয় !

—ওই আমার লাখ টাকা বাবু।

কথা বাড়ালে বাড়বে। কুম্ভ বলল, ঠিক আছে, রেখে দেব ! কারণ কুম্ভর ধারণা বেটা আর ফিরছে না। হাত পা যখন ফুলে গেছে তখন শমন বলতে গেলে ধরিয়েই দেওয়া হয়েছে। যে বেটার আর ফেরার কথা না, তাকে কথা দিতে

কোনো অসুবিধাও থাকে না।

কুম্ভ দারোয়ানকে ডেকে বলল, মাধা চলে গেলে সব তুলে রাখবে। ওর একটা জিনিস যেন এদিক ওদিক না হয়।

ট্যাক্সি এলে মাধা উঠে যাবার আগে দুটো শেডের গেটে দাঁড়াল। কারখানার সব কর্মীরা গেটের মুখে জড় হয়েছে। সে সটান রাস্তায় শুয়ে পড়ল। সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত জানাল কারখানাকে। সে অশ্রু বিসর্জন করল। এই কারখানা তার অন্ন দিত। এই কারখানার দৌলতে সে রাস্তায় পড়ে থাকল না। তার আর থাকার ভাবনা নেই, হাগা মোতার ভাবনা নেই, জামা কাপড়ের ভাবনা নেই। হাসপাতাল থেকেই সব পাবে। ভাগ্যিস সৎমায়ের তাড়া খেয়ে এই শহরে এসে জুটেছিল, যাদবের বউয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে এমন জল ঘোলা করে তুলেছিল যে, শেষ পর্যন্ত কারখানার গেট-পাস পেয়ে গেল।

বস্তির মানুষজনও বের হয়ে এসেছে। মাধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বস্তিতে এটা খুবই বড় খবর একটা। বস্তি বলেই হরেকরকম মজা সব সময় একটা না একটা লেগে থাকে। কাচ্চাবাচ্চা, জোয়ান মরদ, যুবতী এবং প্রৌঢ়ারা সবাই মাধাকে চেনে, চেনে বলেই ট্যাক্সিটা যতক্ষণ দেখা গেল সবাই দেখল। মাধা আজ সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

ট্যাক্সিটা চোখের অন্তরাল হতেই কুম্ভ বলল, দাদা ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছি।

—ওগুলো মানে ?

—মাধার পোঁটলাপুঁটলি।

অতীশ টের পায়, সর্বত্র সংক্রামক ব্যাধি থিকথিক করছে—মাধার শেষ সম্বল পুড়িয়ে দিলেই যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যেত—তবু সে কেন যে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারল না, ওগুলো পুড়িয়ে আর কতটা কাজ হবে।

অতীশ তবু বলল, খুলে দেখা দরকার, যদি টাকা পয়সা কিছু থাকে। আনার সময় বেশ ভারী লাগছিল।

কুম্ভ মাধার সম্পত্তির এদিকটা একেবারেই ভাবেনি। সে খবরের কাগজে রোজ চমকপ্রদ খবরের আশায় থাকে। পৃথিবীতে কিছু ঘটুক। তা না হলে কাগজ পড়ে সুখ পায় না। দাঙ্গা ধর্ষণের খবর তার খুব প্রিয়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা আরও প্রিয়। সব সময় সে ইস্টবেঙ্গলকে শত্রুপক্ষ ভেবে থাকে। বাঙালরা এসে দেশটাকে ছন্নছাড়া করে দিল। শালা মুখ্যমন্ত্রী থেকে অধিকাংশ মন্ত্রী বাঙাল, কোত্থেকে উড়ে এসে সব জুড়ে বসেছে। এইসব চমকপ্রদ খবরের মধ্যে একবার একটা খবর তাকে ভারি উচাটনে ফেলে দিয়েছিল—ফুটপাথে ভিখারির লাশ। পোঁটলাপুঁটলি থেকে নগদে আর নোটে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

কুম্ভ পাগল অথবা ভিখিরির ঝুপড়ি ফুটপাথে দেখলেই ভাবে কোনো গুপ্তধন ঠিক আছে। একবার একটা খবরে সে খুবই ঘাবড়ে গেছিল, ঝুপড়ি থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার হেরোইন উদ্ধার। বস্তুটি কী সে জানে না। পরে শুনে অবাক হয়েছে। সাদা গুঁড়ো মতো এক প্রকারের মাদক, যা জ্বালিয়ে ধোঁয়া নিলে, বেশ দিনমান তুরীয় এক আনন্দ উপভোগ করা যায়। এ-সব খবর তার যে মাথায় ছিল না তা নয়, তবু সে ভাবতে পারেনি মাধার মতো একটা ঘাটের মড়ার পোঁটলাপুঁটলিতে গুপ্তধন থাকতে পারে।

কুম্ভ কিছুটা হতবাকই হয়ে গেছে শুনে।

থাকতেই পারে। সে আর বলতে পারল না, পুড়িয়ে দিই। কিন্তু ওতে হাত দেওয়া মানে কেউটে সাপের গর্তে হাত বাড়ানো। বাতাসে তারা ভেসে বেড়ায়। তার হাসি, চারুহাসিনী, সুহাসিনীও বলা যায়, রাতের বেলা সেই চারুহাসিনীকে সাপ্টে ধরলে টের পায় বেঁচে থাকার কী মজা। এ হেন দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলতে থাকলে সেও না আর এক অতীশবাবু হয়ে যায়। কি যে করে!

তা হাসি তার চারুহাসিনী—না হলে কাবুল শালা এত মজে। রাজবাড়িতে ততক্ষণে খবর হয়ে গেছে, না লাশ পড়েনি। অতীশবাবু অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছেন। ঘরে ঘরে খবর, বাবুর্চি পাড়া, মেসবাড়ি এখন সর্বত্র এক কথা। অতীশবাবুর কিছু হয়নি। হাসিও মেসবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—কী খবর, কী হল, লোকজন দেখলেই মুখ মাগীর চুলবুল করবে। হাসি তার সতীসাধ্বী স্ত্রী, অথচ মাগী কথাটা এ-সময় কেন যে মনে এল! হাসির সতীপনা নানাভাবে গোলেমালে ফেলে দেয় তাকে। সতীপনা কথাটাও মনে এল তার—হাসি কাবুলকে ডেকেও জিজ্ঞেস করতে পারে—সিট মেটালে গণ্ডগোল, অতীশবাবুকে ঘিরে ফেলেছে কারা, যেন অতীশবাবুর জন্য দুর্ভাবনার শেষ নেই! নবীন সন্ন্যাসীর মতো শুয়োরের বাচ্চার চোখমুখ না হলে হাসিকে লক্ষ্মীর পট কিনে দেবে বলতে সাহস পায়! হাসি তার নিজের মানুষের জন্য বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনায় থাকে না—কুম্ভর এটাই বড় কামড়। যেন যা মানুষ সে, তাতে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে হাসি বিশ্বাস করে না।

কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিলেও চলে না।

কুম্ভ এখন তার মাথার প্যাঁচ ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করে দিল।

অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে অধম ছিল বলে।

—কী-ভাবে সেটা?

কুম্ভ থানায় ফোন না করলে অক্ষত অবস্থায় আর ফিরে আসতে হত না। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে টের পেয়েই সব পালিয়েছে। পুলিশ এলে দাঙ্গাবাজরা

সট করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে আজকের ঘটনা তার সাক্ষী। রাজবাড়ি ফিরে দশ কাহন করে বলতে না পারলে বউ-রাণী, কুমারবাহাদুর সহ সবার কাছে বেইজ্জতের একশেষ। অতীশকে ফেলে সে পালায় নি। অতীশকে উদ্ধার করার জন্যই কারখানায় ছুটে এসেছিল—পুলিশকে খবর দিয়েছিল। নিজের জান বাঁচানোর জন্য সে সট করে গা ঢাকা দেয়নি, অতীশবাবুকে রক্ষার জন্যই সে কারখানায় ছুটে এসেছে। ফোন করেছে। সে না থাকলে আজ লাশ নিয়ে রাজবাড়ি ফিরতে হত।

এবং এই সব দুরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনা মাথার মধ্যে তার অহরহ কাজ করে। তার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে লোকটা সিট মেটালে মাথা হয়ে বসে আছে। শকুনের মতো তার চোখ। শকুনের মতো ঘ্রাণ শক্তি। যেখানে দু পয়সা তার হয়, সেখানেই উড়ে এসে জুড়ে বসে।

অতীশ বলল, আমি যাচ্ছি।

কুম্ভর কপাল কুঁচকে গেল। গেলেই হল! মাধার পোঁটলা পুঁটলির দায় কে নেবে?

অতীশ দাঁড়িয়ে আছে। বসতে পারছে না—কারণ, ওর মনে হচ্ছিল সত্যি শরীরে বীজাণু থিকথিক করছে। হাত ডেটল দিয়ে ধুয়েও তৃপ্তি পাচ্ছে না। বাসায় ফিরে ভাল করে চান করবে। বিকেলে আজ লিখতে বসবে। তার আজ কেন জানি মনে হয়েছে, সে মাধাকে ফুটপাত থেকে উদ্ধার করতে পেরে আর্চির প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাব খানিকটা দূর করতে পেরেছে। তার আজ দিনটা ভাল যাবে।

কুম্ভ চুলে চিরুনি চালাবার সময় বলল, দাদা এগুলির কোন সদ্‌গতি করে যান।

—লোহা লক্করের ঘরটায় ফেলে রাখুন না। তা-ছাড়া রাখার জাগয়া কোথায়?

—ওখানে রাখতে দেবে না।

—কারা দেবে না?

—ইউনিয়নের পাণ্ডারা। আনহেলদি, আনহাইজিনিক বোঝেন না! ওরা রাজি হবে কেন!

—তবে কি করবেন?

—আমি কি বলব দাদা! আপনি যা অর্ডার করবেন—অতীশ পড়ে গেল ফ্যাসাদে। —দেখুন না কি আছে!

—কে ধরবে ওগুলো? কুম্ভর ঠোঁট ঘৃণায় বেঁকে গেছে।

—অতীশের মাথায় আসছে না, কী করা যায় পোঁটলা-পুঁটলিগুলি নিয়ে। তার নিজের কেমন নোংরা ঘাঁটতে সাহস হচ্ছে না। তার টুটুল মিণ্টু আছে।

নির্মলা আছে। তার বাপ মা ভাই বোন আছে। সবার জন্য তার বেঁচে থাকা দরকার। কেবল সে তার বেয়ারা সুধীরকে ডেকে বলতে পারে, দেখতো খুলে কী আছে। কিন্তু সে নিজে যা করতে পারছে না, সুধীরকে দিয়ে সে কাজ কী করে করায়। সুধীর বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। যেন পোঁটলা-পুঁটলিতে সংক্রামক ব্যাধির পোকা বিজবিজ করছে। হাত দিলেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তারা উঠে এসে সুধীরের বুকের মধ্যে বাসা বানিয়ে ফেলবে! সে নিজেকে মজাতে যেমন ভয় পায়, অপরকেও। কারণ এতে তার আচরণ অধার্মিক হতে পারে। অধার্মিক আচরণকে সে জীবনে সব সময় ভয় পেয়ে আসছে।

সেদিন মিণ্টু রাজবাড়ির পুকুরের গভীর জলে ডুবে গিয়েও বেঁচে গেছে—মনে হয়েছে, সেই দূরবর্তী নীহারিকা থেকে কেউ যেন তাকে সতর্ক করে দেয়। লোভে পড়ে, অধার্মিক আচরণ সে যে না করে ফেলে তা নয়, তবে বার বার রক্ষা পেয়ে যায়, ঠিক কোনো মুহূর্তে তাকে কেউ সজাগ করে দেয়—ছোটবাবু এ তুমি কি করছ! বউ-রাণীর ফোন পেয়ে সে সেদিন এত বেশি কুহকে পড়ে গেছিল, যে তার মগজে ঘণ্টা বাজলেও তাতে সে সাড়া দেয়নি। বউ-রাণীর পরিপুষ্ট যৌবন এবং সেই শৈশব থেকে এক গভীর পিচ্ছিল অন্ধকার জগৎ তাকে কুহকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে আসছে। সে নিজেকে বার বার তার হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য যাবতীয় বিধিনিষেধের বেড়া চারপাশে তুলে রেখেছিল। সেদিন বউ-রাণীর শরীর সম্ভোগের সুযোগ তাকে এত কাতর করে রেখেছিল, যে টেরই পায়নি—কোনো গভীর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে জ্যোৎস্নায় সে বনিকে নিয়ে বোটে ভেসে গেছিল। সব অমঙ্গল থেকে যেন এখন সেই তাকে রক্ষা করে আসছে। আর্চির অশুভ প্রভাব তাকে অধার্মিক করে তোলার চেষ্টা করলেই, বনির আর্ত গলা শুনতে পায়—লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস—ইফ ইউ ওনলি ওয়েট অ্যাট লাস্ট।

সে ওয়েট করছে।

নির্মলা জীবনে একদিন না একদিন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। নির্মলা সহবাসে ভয় পাবে না। কাছে গেলেই বলবে না, না না আমি পারব না। তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও!

নির্মলার জরায়ুর অসুখের পর থেকেই এটা সে টের পায়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তাকে আর কাছে ঘেঁষতেই দিতে চায় না। নির্মলার ধারণা, সে আর ভাল হবে না। নিরাময় হবে না। কিংবা তার এও ধারণা হতে পারে, সে নিরাময় হয়েছে ঠিক, তবে আবার সহবাসে রাজি হতে পারছে না। যেন উপগত হলেই নির্মলা ফের অসুস্থ হয়ে পড়বে।

সে কতদিন রাত জেগে কাটিয়েছে।

নির্মলা এখন স্বাভাবিক, তার শরীর রুগ্ন নয়। বরং মুখে চোখে লাবণ্য ইদানীং উপচে পড়ছে। নির্মলা এখন এত বেশি সেবাপরায়ণ অথচ রাত যত বাড়ে তত সে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়।

টুটুল মিণ্টু ঘুমিয়ে থাকে।

রাজবাড়ির সদরে ঘণ্টা বাজে।

সে তার টেবিলে বসে লেখালিখি করে রাতে।

রোজই আশা, নির্মলা তার বিছানায় আসবে।

অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে, যেমন সে সেদিন বউ-রাণীর নির্দেশ মতো বের হবার মুখেই কে ফোন করে বলল, তুমি যাবে না।

এখন সে মনে করতে পারে না।

রাজবাড়ির অফিস থেকে রাধিকাবাবু—রাধিকাবাবুর গলাই মনে হয়েছিল—অতীশ তোমার মেয়ে জলে ডুবে গেছে। তারপরও আবার দীর্ঘ এক কাঁপুনির মধ্যে শুনতে পেয়েছে, ভয় নেই। তোমার মিণ্টু ভাল আছে। সে রাজবাড়িতে ঢোকার মুখেই নতুন বাড়ির রাস্তায় দেখেছিল মিণ্টু বাবাকে দেখে দৌড়ে আসছে। কে যে রক্ষা করল—কার অশুভ প্রভাব মিণ্টুকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, কার শুভ প্রভাবে মিণ্টু প্রায় অলৌকিক উপায়ে যেন বেঁচে গেছে। কেউ তো তখন ঘাটলায় থাকার কথা না। অধীর না কে যেন দেবদারু গাছের পাশ থেকে দেখেছিল, একটা জলপরী সবুজ শ্যাওলায় সাঁতার কাটছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে এনেছে।

অতীশ বলতেও পারছে না, পোঁটলা-পুঁটলি সব তবে ফেলে দিন। খাল পাড়ে নিয়ে যান রিকশা ডেকে। কিন্তু এতে যে অবিশ্বাসের কাজ হবে। মাধা বিশ্বাস করে তার সম্বল অতীশের কাছে গচ্ছিত রেখে চলে গেছে। কী মনে হল কে জানে, সে বলল, দাঁড়ান দেখছি কী আছে ওতে।

কুম্ভ আর পারল না, আপনি কি পাগল হলেন দাদা!

কুম্ভের সেই এক ভয় বৌ-রাণীর কানে কথাটা উঠবে। এমনিতেই তার উপর খাপ্পা, কারণে অকারণে তাকে দায়ী করতে পারলে যেন আর কিছু চায় না। কারখানার এত লোক থাকতে অতীশকে নোংরা ঘাটালি! তারপরই মনে হল যদি গুপ্তধন সত্যি থাকে—বলা যায় না, মাধার ডেরায় রাতের বেলা বেওয়ারিশ নারী পুরুষের ভিড় থাকত। কার কি আছে কে বলতে পারে! কুম্ভ বলতে গেলে লোভেই পড়ে গেল। সে বলল রিকশায় তুলে ফেলে দিয়ে আসছি। তারপরই মনে হল, এ নিয়ে ইউনিয়ন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। দু-একজনকে ডেকে পরামর্শ করলে হয়। অবশ্য সে যে খুব একটা তোয়াক্কা করে তা না—তবু হাত পা ধুয়ে সাফ থাকা ভাল।

এখন অতীশবাবু চলে গেলেই মঙ্গল। অতীশবাবু থাকলে ঠিক টের পাবে তার আসল মতলবটা কী। কী করে যে টের পায়! না হলে পিয়ারিলালের দু নম্বরী মাল সাপ্লাই করে সে যে পয়সা কামাচ্ছে, কাজে যোগ দিতে না দিতেই টের পায় কি করে লোকটা!

কুম্ভ বলল, আপনি যান। দেখছি কোথায় রাখা যায়। দারোয়ানদের একজন কুম্ভর খুবই অনুগত। সে তাকে দিয়েই কাজটা করাবে ঠিক করল। অতীশ চলে গেলে, সে সুধীরকে ডেকে বলল, এগুলো তোল। শিউপূজনের ঘরটার পাশে রেখে দে। শিউপূজনের কুষ্ঠ রোগের মতো এই পোঁটলা-পুঁটলি। ওর ঘরের পাশে রেখে দিলে সে গাঁইগুঁই করতে পারবে না। বস্তির খালি জমিটাতে শিউপূজন ঠেলা রাখে। ওটাতে কারখানার বিল্ডিং উঠলে হাতছাড়া হবে—মামলা মোকদ্দমা রাজার সঙ্গে চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার কম।

এখন সম্বল মাত্র কুম্ভবাবু। জমিটার দখল সে ছাড়তে রাজি আছে। বেইমানি জানে না। আগেকার ম্যানেজার তাকে জমিতে ঠেলা রাখার অনুমতি দিয়েছিল বলেই সে এই শহর ছেড়ে যেতে পারেনি। ঠেলা ভাড়া খাটিয়ে পয়সা। কারখানার পুরনো আমলের মিস্ত্রি। জটিল কাজকর্মে তার সাহায্য দরকার পড়ে। এই একটা খুঁটির জোরেই তার কদর। কুম্ভবাবু বলেছে, সে তার বাবাকে বলে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। টোপ ফেলে রেখেছে, কুম্ভ কাকে কী টোপ দিয়ে টুপি পরাতে হয় ভালই জানে। সাত কাঠার উপর জমি। জমিটার দখল নিতে পারলে কুম্ভ জানে, সে রাজার আরও কাছের মানুষ হয়ে যাবে। সে ছাড়া কারখানা যে অচল রাজার বুঝতে কষ্ট হবে না। কুম্ভ এ কারণে মাধার পোঁটলা-পুঁটলি শিউপূজনের ঘরের এক কোণায় ফেলে রাখলেও কিছু বলতে সাহস পাবে না।

সে ইউনিয়নের পাণ্ডা মনোরঞ্জনকে তার বাসনার কথা জানাল। শত হলেও মাধা কারখানার কর্মী। তার সম্বল গচ্ছিত রেখে গেলে তা পাহারা দেবার দায়িত্ব নিতে হয়। বিবেচক মানুষ কত কুম্ভ—এটাই যেন সে এখন কারখানার কর্মীদের কাছে জাহির করতে চায়।

তখন অতীশ রাজবাড়ির সদর দরজায় ঢুকে দেখল, বেশ এধার ওধার জটলা। সাদেক সেলাম ঠুকছে। রাজবাড়ির অফিসার অতীশ। সেলাম ঠুকলে আজকাল তার অভ্যাস—কপালে হাত ঠেকানো। এটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে অতীশ ঢোকার মুখেই মাথায় হাত ঠেকায়। সেলাম ঠুকল কী ঠুকল না তাও সে লক্ষ্য করে না। তার মন মেজাজ প্রসন্ন। মেসবাড়ির দোতলার বারান্দায় মানসদা উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেলিংয়ে ভর করে। অতীশকে দেখেই হাত তুলে দিল। বলল, সাবাস নবীন সন্ন্যাসী। এই মানুষটা অতীশকে নবীন সন্ন্যাসী বলে যেন ভেতরের শুভবোধকে আরও তীব্র করে তোলে।

সে দেখল, মানসদাও বেশ প্রসন্ন আজ। ঘরের মধ্যে মানুষটা বন্দী অবস্থায় থাকে। রাজবাড়ির অন্দর থেকে তার খাবার আসার সময় হয়ে গেছে। সেই আশাতেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মানসদার সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলবে সেই অবকাশও কম। লোকজন ছুটে আসছে—কী হয়েছিল জানার আগ্রহ। সে শুধু বলছে, না না কিছুই হয়নি।

—তোমাকে কারা ঘিরে ধরেছিল?

—ঘিরে ধরবে কেন!

—মাথায় রড তুলেছিল।

—ও কিছু না।

আসলে অতীশ নিজের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক মানুষকে আজ আবিষ্কার করে ফেলেছে। নির্যাতন কতটা শরীর সইতে পারে তারই পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখল, আততায়ীরা কেমন ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ভিতরের এই জোরটার কথা তার যেন এতদিন জানা ছিল না। প্রায় নিজেকে আবিষ্কারের শামিল।

সে কিছুটা জোরে হেঁটে গেল। মেসবাড়ি পার হয়ে যাবার সময় দেখল, হাসি দরজায় দাঁড়িয়ে।

—দাদা আপনার লাগেনি তো?

—লাগবে কেন!

—কে যে বলল রড তুলে মেরেছে।

অতীশ বুঝতে পারল, রাজবাড়িতে বেশ ভাল করেই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। নির্মলা তার জন্য অস্থির হয়ে থাকবে। তার নিরাপত্তা নিয়ে নির্মলার এমনিতেই একটা ভয় আছে। বাসে ট্রামে ফেরার সময় মানুষটার যদি কিছু ঘটে যায়। যা অন্যমনস্ক। এখন দরকার যত দ্রুত নতুন বাড়ি পার হয়ে বাগানের রাস্তাটায় ঢুকে পড়া।

সে দেখল, জানালায় টুটুল মিণ্টু নির্মলা—তারই জন্য অপেক্ষা করছে। এই ফেরা কী যে আশ্চর্য জীবনের খবর বয়ে আনে! যেন এরা আছে বলেই তার এই ফেরা সার্থক।

অতীশকে দেখেই টুটুল মিণ্টু যা করে থাকে—দৌড়ে আসে। এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুটুল মিণ্টু লাফিয়ে নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে।

সে সরে দাঁড়াল। বলল, ওহো, না না, আ কী হচ্ছে, আমাকে ছোঁবে না।

টুটুল মিণ্টু কী বুঝল কে জানে। বাবা বুঝি তাদের ভালবাসে না। টুটুলের ঠোঁট কেঁপে গেল। বড় অভিমানী ছেলে।

অতীশ হেসে দিল। বলল, জামা-কাপড় নোংরা। তোরা কীরে! স্নান করে কোলে নেব। লক্ষ্মী ছেলে।

সে মিণ্টু টুটুলকে কিছুটা এড়িয়েই যেন সিঁড়িতে উঠে গেল। করিডর ধরে যাবার সময় শুধু নির্মলাকে বলল, আমার পাজামা বের করে দাও।

নির্মলা দরজায় ছুটে গেছিল। সে ফেরায় কতটা হাল্কা হয়ে গেছে—এই ছুটে যাওয়ার মধ্যে অতীশ অনুভব করেছে, নির্মলাকেও সে যেন এড়িয়ে গেছে। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় অথবা কিছুটা শুচিবাইগ্রস্ত রমণীর মতো বড় বড় পা ফেলে বাথরুমে ঢুকে যাওয়ার কারণ নির্মলা ঠিক বুঝতে পারছে না। অসময়ে স্নান। এটা আবার মানুষটার আর একটা নতুন উপসর্গ কী না, কে জানে! সে যে ভারি উচাটনে ছিল, কারখানায় গণ্ডগোল লেগেই থাকে—আজ আবার কী নতুন গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, হাসি ছুটে এসে একবার বলেছিল, দিদি বস্তির লোকেরা কারখানা ঘিরে ফেলেছে।

আবার ছুটে এসে বলেছিল, না, দাদাকে ঘিরে রেখেছে কারা।

কুম্ভবাবুর বাবা রাজবাড়ির অফিসে আছে। অফিসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে কারখানার সঙ্গে। হাসি সঙ্গে সঙ্গে সব খবর পায়। দাদাকে ঘিরে রেখেছে কারা শুনেই মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল নির্মলার। সে আর দেরি করতে পারেনি। টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে কুম্ভবাবুর বাসায় ছুটে গেছে। হাসি সান্ত্বনা দিয়েছে, তার কর্তা যখন সেখানে আছে কোনো ভয় নেই। দিদি কাঁদছেন কেন! আর তখনই খবর এসেছে রাজবাড়ির অফিস থেকে, অতীশ মাধাকে নিয়ে কারখানায় ফিরে আসতে পেরেছে।

মাধাকে নিয়ে কারখানার জল ঘোলা করার চেষ্টা করছে কারা এমন খবর অবশ্য নির্মলা রাখত। কারখানায় নিরাপদে ফিরে এসেছে জেনে, নির্মলা হাল্কা হয়ে গেছিল। বড় রকমের কোনো ঝামেলা তবে হয়নি। সে মিণ্টু টুটুলকে নিয়ে ফিরে এসেছে, আর করিডরের জানালায় দাঁড়িয়ে শুধু প্রত্যাশা কেউ আবার নতুন খবর দিয়ে যাবে। সে তার নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছিল। অতীশ সশরীরে হাজির হতেই তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। অসময়ে সাধারণত তার মানুষটা বাড়ি ফেরে না। ফিরে আসায় নির্মলা বুঝেছে তার কিছু হয়নি সশরীরে হাজির হয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। না হলে নির্মলা দুশ্চিন্তায় থাকবে সারাটা দিন। খাবে-দাবে না। মিণ্টু টুটুল মা মা করবে। বাবার কী হয়েছে বলবে। মিণ্টু সব বোঝে। টুটুল ঠিক না বুঝলেও মার বিষাদ তাকে দুঃখী করে রাখবে। সংসারে প্রসন্নতা কত দরকার মানুষটা বুঝতে পেরেই চলে এসেছে। কিন্তু কোনো কথা না বলে, সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল গা বাঁচিয়ে—এটা কেন!

নির্মলা তবু ছুটে ছুটে কাজ করছে।

অতীশ বাথরুম থেকেই টের পাচ্ছিল, নির্মলার মানসিক অবসাদ যেন আর সেভাবে নেই। বাসায় ঢোকার মুখেই নির্মলার চোখ মুখ একেবারে স্বাভাবিক যুবতীর মতো। জরায়ুর অসুখে ভোগার পর থেকেই কেন যে নির্মলা তাকে ভয় পায়। জরায়ু বাদ দেবার পর সেটা যেন আরও বাড়ছিল। অথচ আজ অন্যরকম।

—এই শুনছ।

—বল।

—তোমার পাজামা।

দরজা সামান্য ফাঁক করে পাজামা টেনে নিল। সম্পূর্ণ নিরাবরণ অতীশ।

—সার্ফ দাও।

নির্মলা বলল, রেখে দাও! আমি ধুয়ে দেব।

—দাওনা বলছি।

অতীশ চায় না, এই নোংরা জামা প্যাণ্ট আর কেউ ধরুক! কাচাকাচি করুক।

নির্মলা দরজার কাছে এসে বলল, সার্ফ।

অতীশ দরজা ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে সার্ফ নিল।—ডেটল আছে?

—আছে।

—শিগগির দাও।

আগেই জল ঢেলেছে শরীরে। ঠাণ্ডা লাগছে অতীশের।

নির্মলা ডেটল দিলে আবার দরজা ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে নেবার সময় দরজাটা হাওয়ায় বেশি খুলে গেল। নির্মলা অতীশের এত লাবণ্য শরীরে যেন আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। সে কেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে অতীশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নির্মলার চোখে মুখে উষ্ণতার আভাস। অতীশ কেমন লজ্জায় গুটিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এত লজ্জা তার। সেই এক দীর্ঘ সফরে এমন সঙ্কোচ এবং লজ্জা সে প্রথম অনুভব করেছিল। এই লজ্জা নিরাবরণ পৃথিবীর কোনো এক ভূমিকা থেকে বুঝি জন্ম—অতীশের কেন যে আবার সেই দূরবর্তী তারবার্তা মাথায় ভেসে আসছে—লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস ইফ ইউ ওনলি ওয়েট অ্যাট লাস্ট। তবে কী আজ মাধাকে উদ্ধার করে আনার মধ্যে অদৃষ্ট কোনো ভালবাসাকে সম্মান জানিয়েছে।

কী জানি কে জানে!

মনটা আজ অতীশেরও বড় বেশি অভিভূত।

সেই কবে থেকে চারুকে খুঁজছে। অথচ চারু বলে কেউ নেই। নির্মলার

অসহিষ্ণুতা তাকে কী তবে ঘোরে ফেলে দিয়েছিল। নির্মলা তার স্ত্রী, দিন যায়, মাস যায়, এমন কী এবারে বছর বুঝি গড়িয়ে যাবে ভেবেছিল, তার সঙ্গে সহবাসের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নির্মলার থাকে না। জটিল মানসিক রোগ হতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হত, নির্মলাকে কোনো মনোবিদের কাছে নিয়ে যাবে। আবার ভয়ও কম না, যেমন নির্মলা ভাবতে পারে তবে কী তার মাথার গণ্ডগোল আছে। হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ !

সে জামা সার্ফে ভাল করে কেচে দিল।

সে জামা প্যান্ট ডেটল জলে চুবিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিল। ভাল করে ডেটল জলে স্নান করে সাবান মাখল গায়ে। শরীরের সর্বত্র ফেনা। মাথায় সাদা ফেনা—যেন সে এখন কোনো ডিটারজেন পাউডারের বিজ্ঞাপনের ছবি।

স্নান সেরেও তার মনে হল, কেমন অপবিত্র শরীর। সে সবাইকে ছুঁতে ভয় পাচ্ছে। এ-বড় কঠিন অসুখ, যদিও এখন আর ভয়াবহ বলে অসুখটাকে ধরা হয় না, অধিকাংশ রোগীই বেঁচে যায়—এসব রোগের চিকিৎসা জলভাত হয়ে গেছে, তবু ভিতরের খিঁচটা থেকেই গেল। সে স্বাভাবিক হতে পারছে না।

আর তখনই নির্মলা বলল, বাবার চিঠি এসেছে।

চিঠি ! বাবার !

হ্যাঁ লিখেছেন, টুটুলের তিনি হাতে খড়ি দিতে আসছেন। সঙ্গে পঞ্চতীর্থ কাকাকে নিয়ে আসবেন।

এত সব সুখবর কখনও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে জীবনে সে যেন এর আগে টের পায়নি। বাবা তো বলেন, সব কর্মফল। জীবনের সব কর্মই কখনও পাপতাপের, কখনও মুক্তির স্বাদ বহন করে থাকে—অথবা এও হতে পারে তার মাথার মধ্যে যদি সত্যি কোনো গণ্ডগোল থেকে থাকে, তবে এইসব খবর বেঁচে থাকার জন্য জীবনে অধীর আগ্রহ তৈরি করবে একদিন।

টুটুলের হাতেখড়ি।

অতীশ বের হয়ে মাথাটা ভাল করে তোয়ালে দিয়ে ঘষছে।

টুটুলের হাতেখড়ি !

ঘাড়ে গলায় অতীশ তোয়ালে দিয়ে জল শুষে নিচ্ছে। শীত করছিল। নির্মলা হাতে গেঞ্জি এবং পাঞ্জাবি নিয়ে আছে।

অতীশ বলল, দাও তো চিঠিটা।

বাবার চিঠি পড়ার খুব একটা আগ্রহ থাকে না তার। কারণ চিঠিতে বাবার শুধু অভিযোগ, চিঠিতে বাবা লিখবেন, অলকার পাত্র খোঁজা নিয়ে দেখছি তোমার কোনো দায় নেই। সবাই যদি একে একে পাখা মেলে উড়ে যাও তবে সংসারের এই দুটি প্রাণীর কি হবে ! দুটি প্রাণী বলতে বাবা নিজে

এবং সঙ্গে মার কথা উল্লেখ করেন। কতদিন পর যেন বাবা তার এবং তার পুত্রের শুভাশুভের কথা ভেবে নিজে চলে আসছেন। চিঠিতে নিশ্চয়ই কোনো অভিযোগ নেই।

বাবা কলকাতাকে বড় ভয় পান। এত মানুষজন গাড়ি ঘোড়া, মানুষের এত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস একই জায়গায় কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকলে শরীর কখনও সুস্থ থাকতে পারে বিশ্বাস করতে পারেন না। অতীশ রাজার কারখানায় কাজ নিয়ে আসার পর দু তিন বছর কেটে গেল, বাবা একবারও আসেন নি। এমন কী তিনি বাড়ির অন্যদেরও পাঠাতে যেন সাহস পান না। কলকাতায় এসে সে এবং তার সন্তানেরা এখনও বেঁচে আছে এটাই বোধ হয় বাবার কাছে পরম বিস্ময়ের। তিনি এলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন নির্ঘাত এবং কে জানে কিছু ঘটেও যেতে পারে—এমন আশঙ্কা থেকেই বোধ হয় তিনি এতদিন আসতে সাহস পান নি। গাছপালা ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে বাবার শঙ্কা বোধ হয়।

সেই বাবা টুটুলের মঙ্গলার্থে বলতে গেলে জীবন বাজি রেখেই আসছেন।

কারণ তিনি বুঝেছেন, তাঁর পুত্রটি ধর্মবিমুখ। কবে না আবার হাতে খড়ি না দিয়েই পুত্রের পড়াশোনা শুরু করে দেয়। জীবন শুরুর মুখে এসব অনাচার তিনি পুত্রের জন্য সহ্য করতে পারলেও, পৌত্রের ক্ষেত্রে সহ্য করবেন না। পূর্বপুরুষের পিণ্ডদানের একমাত্র অধিকার এখন টুটুলের উপর বর্তে আছে। বড় পুত্রের সব কটি কন্যা। অতীশের এক কন্যা, এক পুত্র। হাসু ভানু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এখন ক্লাব-টাব করছে। মাঝে মাঝে বাবার চিঠিতে তাদের চাকরির কথা লেখা থাকে—তুমি চেষ্টা না করলে কে করবে। ওদের স্থিতিলাভের দরকার।

সব বাবাই এটা চায়।

এক বয়সে বাবা মা ভাই বোন, এক বয়সে স্ত্রী পুত্র কন্যা, আর এক বয়সে ঝাড়া হাত পা হতে গিয়ে আরও জটিল গাড্ডায় জড়িয়ে পড়া। মানুষ যতদিন বাঁচে, ততদিন তার এক জটিলতা থেকে অন্য জটিলতায় গমন। এই যেমন সে সাত আট বছর আগে থাকতে জানতই না নির্মলা বলে এক যুবতী তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবে। বনি ছাড়া তার জন্য আর কেউ কখনও অপেক্ষা করতে পারে বিশ্বাস হত না। এখন দেখছে, নারী মাত্রেই প্রেমিকা, না হলে কোথাকার কে এক চারু তাকে এ-ভাবে বিভ্রমে ফেলে চলে যেতে পারে ! ছ সাত মাস হয়ে গেল, সে খোঁজাখুঁজি করে বুঝেছে মাথার দোষ, আসলে চারু বলে কোনো যুবতীর সঙ্গে তার কখনও কোনো ট্রেনে দেখা হয়নি। কোনো নীল জ্যোৎস্নায় গভীর ফসলের ভেতর দিয়ে তার ট্রেন যাত্রা করেনি। এতে আর কী এসে যায় জীবনে ! এমনই কোনো স্বপ্নের ট্রেনে সবাই চড়ে বসবে বলে বসে আছে ! আর এইসব ভাবনাই চারু নামক এক

রমণীর বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে!

বাবা জানেন এই টুটুল তাঁর আপাতত একমাত্র উত্তর পুরুষ। তার বংশগৌরব। মিণ্টুর বেলায় হাতে খড়ি হয়নি—এতে বাবার কোনো আক্ষেপ নেই। কিন্তু টুটুলের যদি হাতে খড়ি না হয়, বাবার জীবনে বড় আক্ষেপ থেকে যাবে। বাবা তবে আসছেন।

সব মানুষই সব সময় একা, এক সময় সংসার, এক সময় ঘরবাড়ি, শেষে এই বংশগৌরব। বংশের ধারাবাহিকতা এ-ভাবেই মানুষ রক্ষা করে যায়। টুটুলের হাতে খড়ি না দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলে দেবীর কোপে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। অমানুষ হলে কে কাকে রক্ষা করে! অথচ হাসু ভানুর বেলায় বাবা তো হাতে খড়ি দিয়েই বিদ্যাভ্যাস শুরু করেছিলেন। কিন্তু হাসু ভানুর ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিপাকে পড়েছেন এমন মনে হয় না। তাঁর ধারণা, তিনি তার কর্তব্য করেছেন—কর্মফলে হয়নি। কর্তব্যে অবহেলা তাঁর ছিল না। এই আপ্তবাক্যের তাড়না থেকেই তিনি আসছেন। তিনি কর্ম করার অধিকারী। তার ফল ভোগের অধিকারী নন।

অতীশ তক্তপোশে বসলে নির্মলা চিঠিটা বের করে দিল।

সেই এক সম্বোধন,

পরম কল্যাণবরেষু—

আশা করি, তুমি বউমা কুশলে আছ। অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। চিঠি না পেলে আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি এটা তোমার বোঝা উচিত। শ্রীপঞ্চমীর আগের দিন আমরা আসছি। আমি এবং তোমার পঞ্চতীর্থ কাকা। সকাল ৭।২৮।৫৯ সেকেন্ড গতে ১০।৪৫।২২ সেকেন্ডের মধ্যে শ্রীপঞ্চমীর অনুষ্ঠান ও হাতেখড়ি।

এইটুকু লেখার পর পর বাবা পুজোর উপকরণের একটি ফর্দ জুড়ে দিয়েছেন। কালোপাথরের থালা, চকখড়ি সঙ্গে পুজোর বিবিধ উপকরণের তালিকা। যেমন অবশ্যের তালিকায় আছে পলাশ ফুল। মাটির দোয়াত, কাঁচা দুধ, শরের কলম।

অতীশ বাড়িতে থাকার সময় বাবার যজন, যাজন পছন্দ করত না। বাড়িতে বৈশাখ মাসে বারের মঙ্গলচণ্ডী, জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠী পুজো, শ্রাবণে মনসা, আশ্বিনে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো থেকে ক্ষেত্রপাল, বাস্তুপুজো—হেন পার্বণ নেই করেন না। বাড়ির ঠাকুরঘরে শালগ্রামশিলা, লক্ষ্মী জনার্দনের পেতলের মূর্তি। সকালে বাগান থেকে ফুল তোলা, জবা ফুলের গাছই কত রকমের, যে ফুলে যে ঠাকুর তুষ্ট, ফলে বাগানে নানা ফুলের বাহার। জীবন নিয়তি নির্দিষ্ট জেনেও বাবা ঈশ্বরসেবায় পরাঙ্মুখ নন। বরং ঈশ্বরের কোপ থেকে বাড়িঘর সন্তান-সন্ততিকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দুর্ভোগ মানুষের থাকবেই তবু যতটুকু তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ভেবে বাবা তাঁর ঈশ্বর সেবার কোনো ত্রুটি জীবনে রাখতে চান না।

তালিকাটি খুবই দীর্ঘ। নির্মলা বছর চার-পাঁচ বাড়িতেই ছিল। সে বাবার ঠাকুরের কাজকর্ম যত্নের সঙ্গে করত। বউমার ঈশ্বর বিশ্বাস প্রবল—তাঁর পুত্রের ঈশ্বর বিশ্বাসের খামতি নির্মলা অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছিল। নির্মলার পুণ্যফল তাকেও স্বস্তি দেবে এমন ভেবে থাকেন।

তবে কলকাতায় এলে মানুষ কিছুটা ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এটা বাবার বিশ্বাস। শহরের জাঁকজমক এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় মানুষ নিরন্তর ছুটছে। অতীশও তাই। না হলে সপ্তাহে না হোক মাসেও অন্তত পরিবারের মঙ্গল জানিয়ে চিঠি দিতে পারে। সে তাও দেয় না। আগে নির্মলা নিয়ম করে চিঠিপত্র লিখত। জরায়ুর অসুখের পর থেকে ওর কী ধারণা হয়েছে কে জানে—মানসিকভাবে বাড়ির মানুষজনের উপর তার ক্ষোভ জন্মেছে। সে আর চিঠি লেখে না। অন্তত হাসপাতালে থাকার সময় সে ভেবেছিল বাড়ি থেকে কেউ এসে থাকবে। তার মানুষটা বাবা, মা ভাই বোনের জন্য এত উদ্বেগ ভোগ করে - সময় মতো বাবার মাসোহারা না পাঠাতে পারলে অস্বস্তির মধ্যে থাকে এটা বাড়ির সবাই জানে। অথচ এত বড় বিপদের সময় বাড়ি থেকে মা, একবার এসে হাসপাতালে একদিন গেছে এবং পরদিনই আবার ট্রেনে তুলে দিতে হয়েছে। সংসার কে দেখে! আর কেউ আসেনি, থাকেও নি। অথচ চিঠিতে সময়মতো টাকা যেন অতীশ পাঠায় তার তাগাদা দিতে বাবা ভুল করতেন না।

নির্মলার ক্ষোভের কারণ অতীশ বোঝে। সে অফিস চলে গেলে মিণ্টু টুটুল বাসাবাড়িতে একা। কেউ দেখার নেই। বড় জেঠিমা কিছুদিন ছিলেন। তাঁকেও বড়দা এসে নিয়ে গেল। এখন একান্ন নয় যে জোর করে রাখবে। নির্মলা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বুঝেছিল তার মানুষটা কত অসহায়। সকালে ওঠা, বাজার করা, রান্না করা, মিণ্টুকে ইস্কুলে দিয়ে আসা। নির্মলার ওষুধ-পথ্য সব যোগাড় করে টেবিলে সাজিয়ে রাখা থেকে টুটুলকে চান করান খাওয়ান এক হাতে। নির্মলা তার মানুষটার উপর এত চাপ পড়ছে ভেবেও কখনও ভেঙে পড়ত। বলত, তোমার সঙ্গে বাড়ির শুধু টাকার সম্পর্ক।

অতীশ বলত, এটা বলছ কেন। আমার মা বাবার কষ্ট ঠিকই হয়! কী করবেন। ওখানেও তো তাঁদের সংসার আছে।

নির্মলার এক কথা, অলকা এসে থাকতে পারে না!

অতীশ বলত, ওর স্কুল কামাই হবে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে এটা বুঝছ না কেন!

—পড়াশোনা না ছাই। কেবল তো ফেল করছে।

অতীশ এও দেখেছে, কেউ নিজের স্বাধীনতা হারাতে চায় না। এখানে মা এসে থাকেন না, কারণ মার ধারণা এটা তার নিজের সংসার নয়, পুত্রের সংসার। অলকা এসে থাকে না—কারণ ওর ধারণা দাদার বাড়িতে সে আছে। নিজের বাড়িতে নয়। পক্ষকালের মধ্যেই যেন মনে হয় অলকা বড় একঘেয়েমিতে ভুগছে। সারাদিন বাসায় আটক কে থাকতে চায়!

এই শহরে এসে তারা জীবনকে যেন উপভোগ করতে পারে না। প্রবাস জীবনে হাঁপিয়ে ওঠে। অতীশ ওদের আচরণে এটা লক্ষ্য করার পরই কাউকে আর বাড়ি থেকে আসার কথা লেখে না। আসলে তারও ভিতরে বাড়ির প্রতি কেমন একটা অভিমান ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। আগে সে নির্মলা কিংবা টুটুল মিণ্টুদের সামান্য অসুখ বিসুখেই ঘাবড়ে যেত। বাবাকে চিঠি দিত—বাবার চিঠি এলে সাহস পেত। বাবা লিখতেন, শরীর থাকলে তার কষ্টভোগ থাকবেই। জীব মাত্রই এটা ভোগ করতে হয়। জন্মের সঙ্গেই সে এটা বহন করে। তুমি অযথা দুশ্চিন্তা করবে না। প্রাণ তার নিজের সঞ্জীবনী শক্তিতে বাঁচে, বড় হয়। তার শ্রীবৃদ্ধি হয়। কষ্টভোগও থাকে। সব নিয়েই জীবন।

তখনই মিণ্টু লাফাতে লাফাতে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—বাবা টুটুল আমাকে মারছে!

—টুটুল!

টুটুল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসছে না।

—তুমি দিদিকে মারছ!

—না বাবা দিদি আমাকে মারছে।

টুটুলের কোঁকড়ান চুল। এখন সে দৌড়াতে পারে। ধরতে গেলেই মার কাছে ছুটবে। মার পাশে বসে থাকবে। নির্মলা রান্নাঘরে খাচ্ছে বোধহয়। চিঠিটা ধরিয়ে দিয়েই সে বাথরুমে চলে গিয়েছিল। অতীশ বিছানায় শুয়ে বাবার ফর্দ দেখছে। পুজোর এতটুকু বিঘ্ন হয় বাবা চান না। কলা, কদমা, বাতাসা, কলাপাতা থেকে আরম্ভ করে তিল তুলসী হরিতকী কিছুই ফর্দে বাদ দেন নি। এমনকি নৈবেদ্য কটা হবে তারও উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদেবতার পাঁচটা। লক্ষ্মী সরস্বতীর দুটো নৈবেদ্য, চক্ষুদানের জন্য কাজল, অর্থাৎ পঞ্চতীর্থ কাকা সঙ্গে আসছেন—তিনি যেন টের না পান, বাবার মেজ পুত্রটির পরিবার পুজো আর্চার বিষয়ে এতটুকু অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ ধরা পড়লে বাবার কলঙ্ক।—তাহলে এই আপনার পুত্র, পুত্রবধূ। শহরে এসে ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। নিজের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। এ-কারণেই বাবা বোধহয় এতবড় ফর্দ পাঠিয়ে কোনও ত্রুটি যাতে না থাকে তার চেষ্টা করেছেন। আর শেষে লিখেছেন, এখন

তোমার গ্রহ সমাবেশ খারাপ। দুষ্টগ্রহের কোপে পড়ে গেছ। গ্রহ-শান্তি দরকার।

অতীশ বালিশে ভর দিয়ে বলল, এই টুটুল আয় জানিস আমার বাবা আসছে।

টুটুল এখানে এসে তার ঠাকুরদার কথা ভুলে গেছে। সে বলল, তোমার বাবা আছে?

—বারে থাকবে না!

—তোমার সত্যি বাবা আছে?

তা টুটুল বলতেই পারে। সে বিশ্বাসই করে না, বাবার একজন বাবা থাকতে পারে। সে কেমন ঘাবড়ে গেছে কথাটাতে। তার পাকা পাকা কথা। তাদের বাবার বাবা থাকবে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অতীশ কেমন ছেলে মানুষের মত বলল, সত্যি আমারও বাবা আছে। বাবা আসবে। তোমার হাতেখড়ি হবে।

মিণ্টু বলল, হাতেখড়ি কী বাবা!

—পড়াশোনা আরম্ভ করার আগে হাতেখড়ি দিতে হয়।

—হাতেখড়ি না দিলে কী হয় বাবা?

মিণ্টু লতাপাতা আঁকা ফ্রক গায়ে বাবার খাটের কাছে দুহাত গালে রেখে তক্তপোশে ভর করে আছে। চোখ বড় বড়। 'হাতেখড়ি' কথাটা সে বোধহয় শোনেই নি। আবার শুনতেও পারে। টুটুলের জন্য একবার 'খুশির পড়া' নামে একটা বই কিনে এনে এনেছিল নির্মলা। সে তখন বলেছে, পড়াও কিন্তু হাতেখড়ি না হলে লিখতে পারবে না। নির্মলাদের বাপের বাড়িতে এ সব নেই। তবু ওর দাদা দিদিরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার।

হাতেখড়ি না দিলে কী হয় সে জানে না। আসলে সংস্কার। অতীশ নিজের বিদ্যারম্ভের দিনটির কথা মনে করতে পারল। বাবা মেজ জ্যাঠামশাই বাড়ি এলেন। সঙ্গে দশাসই এক গৌরবর্ণ মানুষ। গায়ে সিল্কের চাদর, পাটভাঙা ধুতি। গায়ে জামা নেই। খড়ম পায়ে দশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে যেতে পারেন। চুল সব সাদা। লম্বা টিকিতে জবা ফুল বাঁধা। সারা কপালে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ।

বিশাল অনুষ্ঠান। তার বিদ্যারম্ভ একভাবে হয়েছিল, তালপাতায় সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মানুষটি অ আ লিখে দিয়ে গেলেন। পুজোআর্চা, ভোজন কতকিছু তার বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে। আসলে একজন মানুষের যাত্রা শুরু। শুভ দিনক্ষণ দেখে দেবদেবীর প্রসন্নতা লাভ না করতে পারলে, পদে পদে বিঘ্ন। বাবা জ্যাঠারা সবরকমের বিঘ্ন থেকে ত্রাণের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কালো পাথরের থালার উল্টোপিঠে সূর্যকান্ত পণ্ডিত তাকে

কোলে বসিয়ে প্রথম সরস্বতীর স্তব পাঠ করালেন। বড় হয়ে বুঝেছে, স্তব পাঠ করে বিদ্যারম্ভ শুরু। বিদ্যার দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য কতকিছুর আয়োজন।

তার পুত্রের ক্ষেত্রে বাবা চান এমনই অনুষ্ঠান হোক্। সদ্-ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে কিনা চিঠিতে লেখেন নি। এখানে আসার পর বোঝা যাবে বাবার আর কী ফরমাস তাকে পালন করতে হবে।

টাকার দরকার।

সে বলতে পারবে না, এত টাকা আমি পাব কোথায়! আপনাদের একরকমের দিন গেছে, আমাদের অন্যরকম।

হাতেখড়ি না দিলেই বা কী হয়। কিছুই হয় না আবার কেন যে মনে হয়, কিছু হয়—নিজের বেলায় না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পুত্রের বেলায় হবে না, তা অতীশ ভাবতে পারে না। কোনও কারণে টুটুলের পড়াশোনা না হলে মনটা খচ্ খচ্ করবে। আসলে আশ্চর্য এক পবিত্র খবর যেন বাবা তাকে দীর্ঘদিন পর দিয়েছেন।

তার মনে হল, সে বাবার কর্তব্য ঠিক পালন করছে না।

যেমন শৈশবে, বাড়িতে বাবা কিংবা জ্যাঠামশাই কর্মস্থল থেকে ফিরে এলে বলতেন এদিকে আয়। সে মেজদা বড়দা কাছাকাছি বয়সের। তিনজনকেই পাশে বসিয়ে মুখস্থ করাতেন।

তারা বলে যেত।

বাবার নাম?

চন্দ্রনাথ ভৌমিক।

এ-ভাবে পিতামহের নাম থেকে অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম তাদের বলে যেতে হত।

অতীশ টুটুলের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দরজার কাছ থেকে নড়ছে না ছোট্ট সরল শিশু—যত আক্রোশ দিদিটার উপর। দিদির খবরদারির তার একদম পছন্দ নয়। দিদি প্যাণ্ট পরাতে গেলে, কিছুতেই পরবে না। শার্ট গায়ে দিতে গেলে দৌড়ে পালাবে—সেই দিদিটা বাবার এত কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে—আর তাকে বাবা ডাকছে না, ক্ষোভ হতে পারে, অতীশ ডাকতেই, টুটুল বাবার বুকের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অতীশ বলল, তোমার বাবার নাম বল তো?

—অতীশদীপঙ্কর ভৌমিক।

—তোমার পিতামহের নাম?

টুটুল বলল, বাবা পিতামহ কি?

বাবার বাবাকে পিতামহ বলে। তোমার পিতামহের নাম চন্দ্রনাথ ভৌমিক।

কি মনে থাকবে?

—হ্যাঁ, থাকবে।

—বল পিতামহের নাম কি?

টুটুল দৌড়ে পালাল।

—এই শোন। কোথায় গেলি! অতীশ উঠে দরজা পার হয়ে দেখল করিডোরে টুটুল নেই। দরজা খোলা নেই তো! এই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেই, অন্দরমহলের বিশাল এলাকা, কলকাতা শহরে এমন ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। এত গাছপালা যে, টুটুল যদি ইচ্ছে করে বাবাকে ভয় দেখাবে, তবে সে সারাদিনেও খুঁজে পাবে না। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বিঘার ওপর এই প্রাসাদবাড়ি, বাগান, পুকুর, গ্যারেজ, গোয়ালঘর, বাবুর্চিপাড়া, বাবুপাড়া, মেসবাড়ি, অতিথিভবন, ধোপাখানা কী নেই বাড়িটাতে। দরজা দিয়ে বের হয়ে যদি অন্দরে বউ-রাণীর মহলে চলে যায় তবে আর এক বিড়ম্বনা। সে করিডোর দিয়ে দৌড়ে যাবার সময়েই নির্মলা বলল, তুমি ওকে বকেছ?

—কাকে?

নির্মলা আসনে বসে খাচ্ছিল। তার পিছনে এমন ঘাপটি মেরে বসে আছে যে টুটুলকে দেখাই যায় না।

সে বলল, টুটুলটা ছুটে ওদিকে কোথায় চলে গেল! এত করে বলি সদর বন্ধ রাখবে। কোথায় খুঁজি! আমি বকব কেন!

নির্মলার চোখে ভারি তৃপ্তির হাসি। এই হাসিটুকু দেখার জন্য অতীশ যেন সারাজীবন প্রতীক্ষা করে আছে। তার টুটুলের কথা মনে থাকল না। নির্মলাকে জড়িয়ে পাশে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেন এই নারী আবাদের ক্ষেত্র। এবং সে বীজ বহন করে। অতীশ নিজে বীজ বপনকারী মাত্র। সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে নির্মলা বলল, আমার পেছনে লুকিয়ে বসে আছে। এই কি হয়েছে তোর?

—কী পাজি দেখেছ!

—কী করেছে?

বললাম, তোমার পিতামহের নাম কি বল তো? শুনেই দৌড়।

নির্মলা বুঝতে পারল না, হঠাৎ টুটুলকে তার ঠাকুরদার নাম মুখস্থ করাচ্ছে কেন? বলল, কেন ও জানে না?

—জিজ্ঞেস করে দেখ! জানে কিনা!

নির্মলা এঁটোকাঁটা বাসনে তুলে কলপাড়ে রেখে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালে টুটুলকে দেখা গেল। সে চোখ বুজে ঘাপটি মেরে আছে। মা যে তার উঠে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি। অতীশ দৌড়ে গিয়ে টুটুলকে বুকে তুলে নিল।

নির্মলার দিকে তাকিয়ে অতীশ বলল, ও বাবার কথা ভুলে গেছে। জান ও বিশ্বাসই করে না আমার বাবা থাকতে পারে।

টুটুল বুকের উপর দাপাদাপি করছে। সে নেমে যেতে চাইছে।

আর তখনই মিণ্টু দরজায় এসে বলল, আমি বলব বাবা?

—কী বলবি?

—ঠাকুরদার নাম।

মিণ্টু বলতেই পারে।

অতীশ বলল, বল তো!

সঙ্গে সঙ্গে টুটুল চিৎকার করে উঠল, না না আমি বলব।

মিণ্টু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, চন্দ্রনাথ ভৌমিক।

আর টুটুলের সহসা কি ক্ষোভ জন্মাল কে জানে। কেউ বোধহয় জীবনে হারতে রাজি থাকে না। দিদির কাছে হেরে যাবে সে সহ্য করবে কেন। জোরজার করে বাবার কোল থেকে নেমেই মিণ্টুর চুল খামচে ধরল।

—বাবা আমাকে মারছে।

—টুটুল কী হচ্ছে। শোন। আঃ দিদির লাগে না! দিদিকে একদণ্ড না দেখলে তো ভেউ ভেউ করে কাঁদিস। মারলে দিদি তোর রাগ করবে না! ঠিক আছে, এই মিণ্টু তুই বলবি না। বল তোমার পিতামহের নাম কী?

—চন্দ্রনাথ ভৌমিক। বলেই টুটুল বাবার কোমরে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলল। সে যে পারে, সে যে দিদির মত সব বলতে পারে এটা জানার পর তার বোধহয় লজ্জা হয়েছে। এ-লজ্জার কী হেতু থাকতে পারে অতীশ ভেবে পেল না। বাবার বাবা থাকে এই স্বীকারোক্তিতে কী কোনও কারণে শিশুর মধ্যে গভীর কোনও আনন্দের প্রকাশ ফুটে ওঠে অথবা শিশু কি বোঝে এই বলার মধ্যে তার বড় এক কৃতিত্ব আছে, সে জানে, সে বলতে পারে পিতামহের নাম।

অতীশ বুঝতে পারল, মিণ্টুই এখন তার সম্বল, সে টুটুলকে সরাসরি না বলে, মিণ্টুকেই বলবে—এতে টুটুলের শেখার আগ্রহ বাড়বে, দিদি পারে সে পারবে না, তাহলে যে বাবা মার কাছে তার গুরুত্ব কমে যাবে। এতটুকু শিশুর এত বুদ্ধিতে অতীশ জীবনধারার কোনও এক আশ্চর্য চমক আবিষ্কার করে ক্ষণিকের জন্য আবার পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এরা তার আত্মজ। আসলে এরাই তার জীবনে বেঁচে থাকার আগ্রহ।

বাসাবাড়িতে এরাই তার অস্তিত্ব। এরা ভাল থাকলে সে ভাল থাকবে। সে দুজনকেই নিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে বলল, মিণ্টু এখানে বোস। টুটুল এখানে।

অতীশ ঠিক মাঝখানে।

সে তক্তপোশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল, তোমার প্রপিতামহের নাম মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক। বল। হ্যাঁ বল। মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক। বল। মনে রাখবে। আমি বলে যাচ্ছি। জান, আমার বাবা কাকারা জীবনের শুরুতেই চেয়েছিলেন, আমরা যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলে না যাই।

টুটুল মিণ্টু ভারি বিস্ময়ের সঙ্গে বাবার অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করছে। ঠাকুরদার চিঠিটা পড়ে বাবা তাদের যেন কেমন হয়ে গেল।

—কী মনে থাকবে তো? আমার অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, রাঢ়ি শ্রেণী, বন্দ্যোঘাটি গাই মনে রাখবে। বাবা আসছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে সব ঠিক ঠিক বলবে। না বলতে পারলে তিনি খুব দুঃখ পাবেন।

টুটুল মিণ্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে কখন যে তার শৈশবে চলে গেছে টের পেল না। নিজেও কেমন শিশুর মত, বলল, জান আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল একটা পুকুর ছিল। পুকুরের পাড়ে অর্জুন গাছ ছিল। আমার বড় জ্যাঠামশাই পাগল ছিলেন। কতদিন সকালে তাঁর সঙ্গে হাত ধরে আমি বের হয়ে গেছি।

—একবার জান, হাতিতে চড়ে পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সেই কোথায় কতদূরে চলে গেছিলাম। জসীম এসেছিল হাতিটা নিয়ে। শীতে গ্রীষ্মে বাবুদের হাতি নিয়ে সে বের হয়ে পড়ত। সে ছিল মস্ত বড় মাহুত।

—মাহুত বোঝ?

—মাহুত হাতির পিঠে বসলে, হাতিটা খুব বাধ্য হয়ে যায়, সে যা বলে তাই শোনে। হাতি নিয়ে সে বের হয়ে পড়ত। গাঁয়ের লোকেরা ভাবত, হাতিটা এলে জমিতে ফসল ফলবে, অজন্মা হবে না, মড়ক লাগবে না। হাতির প্রতি সরল বিশ্বাসে বাড়ি বাড়ি উৎসবের আমেজ আসত। চাল কলা ধান দূর্বা দিয়ে গেরস্থরা হাতিটাকে বরণ করত।

—আমার বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। জমিদারের হাতি। আমাদের পুকুরের পাড়ে হাতিটা বাঁধা থাকত। সেই হাতি নিয়ে আমার পাগল জ্যাঠামশাই একদিন হাওয়া। সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে আমরা চলে গেছিলাম, কত গাছপালা, পাখি, বিশাল বনভূমি—এ সব তোমরা দেখতে পেলে না। আমার কষ্ট হয় জান। আমরা কীভাবে বড় হয়েছি, আর তোমরা একটা বাসাবাড়িতে বড় হচ্ছ—জীবনে সেই অমল আনন্দ থেকে তোমরা বঞ্চিত। শৈশবের কথা বলতে বলতে আবেগে তার চোখে জল এসে গেল।

মিণ্টু বলল, বাবা তুমি কাঁদছ!

—কাঁদছি ?

—হ্যাঁ, তুমি কাঁদছ।

—যা ! বলে তাড়াতাড়ি অতীশ নিজের গোপন দুঃখকে আড়াল দেবার জন্য চোখ মুছতেই নির্মলা কলপাড় থেকে হাজির। হেসে বলছে, কী ব্যাপার এত শান্তশিষ্ট তোরা !

মিণ্টু হতবাক হয়ে গেছে। সে স্পষ্ট দেখেছে, বাবার ঠোঁট বেঁকে গেছিল। চোখে জল। বাবাকে সে দেখেছে, চুপচাপ, কথাবার্তা খুব বলে না। বাসায় যতক্ষণ থাকে, সংসারের দরকারী কথা ছাড়া একটা কথা নেই মুখে। মার শরীর ভেঙে পড়ার পর বাবার চোখ মুখ দেখলে টের পেত, কেমন জলে পড়ে গেছে যেন। সব বিষয়ে ভারি সতর্ক। যেন কেউ বাবার সব হরণ করে নেবে এমন একটা ভয়। রাতে শোবার আগে দরজা সব বন্ধ আছে কিনা, জানালায় দামী কোনও জিনিস পড়ে থাকছে কিনা সব দিকে লক্ষ্য। আর বাবা সবাই শুয়ে পড়লে নিজের টেবিল চেয়ারে বসে চুপচাপ কী লেখে। বাবা কখন ঘুমোতে যায়, সে টের পায় না, বাবা কত সকালে ওঠে তাও সে জানে না। যেন বাবা সবাইকে জাগিয়ে দেবার জন্য রাত জেগে বসে থাকে। সেই বাবা শিশুর মত কেঁদে ফেলায় মিণ্টু কেমন ঘাবড়ে গেছে।

সে মার হাত ধরে বলল, মা শোনো !

—কী শুনব !

—এস না !

—কোথায় যাব ?

—এসই না। সে নির্মলার হাত ধরে টানতে থাকল।

নির্মলা বলল, তোরা আজ ঘুমাবি না ! বাবা আসায় তোমাদের দেখছি পাখা গজিয়েছে।

—বলছি শোন।

আসলে এ-সময় ভাই বোন দুপুরে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমায়। মিণ্টুর স্কুল ছুটি। বড়দিনের বন্ধ। দুপুরে না ঘুমালে সাঁজ না লাগতেই ঢুলতে থাকে। বড় ঘুমকাতুরে। দুপুরে ঘুমালে রাতে নির্মলা তাকে পড়াতে পারে। ছুটির দিনে আজ না ঘুমিয়ে বাবার সঙ্গে জমে গেছে।

তখনও হাত ধরে টানছে মিণ্টু।—এস না মা।

মিণ্টু নির্মলাকে পাশের ঘরে নিয়ে দেখল, বাবাকে দেখা যায় কিনা। দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল নির্মলাকে। তারপর ফিসফিস গলায় কী বলল, যার একবর্ণ নির্মলা বুঝতে পারছে না। খুব গোপন কথা—বাধ্য হয়ে নির্মলা হাঁটু গেড়ে বসলে, কানে কানে বলল, জান মা, বাবা না কাঁদছিল !

—যা !

—হ্যাঁ। বাবা একবার নাকি হাতিতে চড়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। বাবার জ্যাঠামশাই জান পাগল ছিল !

নির্মলা এ সব খবর রাখে। অতীশের বড় জ্যাঠামশাই পাগল ছিলেন, অতীশের ঠাকুরদার মৃত্যুর পরই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও খবর নেই। বিশ বাইশ বছর হয়ে গেছে, বড় জেঠিমা রোজই ভাবেন মানুষটা তাঁর ফিরে আসবেন। অতীশ তখন খুব ছোট। দেশভাগ হয়ে যাওয়ায়, বাড়িঘর জমিজমা সব বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। নিখোঁজ মানুষটা ফিরে আর আসেন না। অতীশ তার পাগল জ্যাঠামশাইর জন্য একটা গাছে লিখে এসেছিল, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি। ইতি সোনা।

আরও কত সব খবর, মানুষটা তাকে দিত। জ্যাঠামশাই তার ভারি সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘকায় মেধাবী এবং কিটসের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন। অতীশ আর্চির প্রেতাত্মার ভয়ে যখন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে থাকে তখন নির্মলারও কেন যে মনে হয় এক সকালে দেখতে পাবে মানুষটা তার আর ঘরে নেই। নিখোঁজ হয়ে গেছে। এ-সব ভাবলে নির্মলা রাতে ঘুমাতে পারে না। সেই মানুষটার চোখে জল। কেন ?

কী এত কষ্ট ?

সে কেমন আরও মায়ায় জড়িয়ে যায়।

আজ প্রথম মনে হল, সেও মানুষটাকে কম নির্যাতন করছে না। ছ সাত মাসের মত তারা দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। জরায়ু বাদ দেবার পরই নির্মলা তলপেটে কেমন একটা ব্যথায় কষ্ট পায়। এই অসুখটার জন্য সে অতীশকেই দায়ী ভেবে থাকে। বাপের বাড়ির সবাই এই ধারণা আরও তার মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে—অবিবেচক, শরীর বাদে কিছু বোঝে না। মা বাবা ভাই বোনই সব। নিজের কীভাবে চলবে সেটা অতীশ ভাবে না। বাবার মাসোহারা পাঠিয়ে দাও, পরে দেখব। লেখালিখির পয়সা যখন আছে, হয়ে যাবে। হয়ে যায় ঠিক, তবে নির্মলা টের পায় তার জন্য তাকে কতটা কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করতে হয়। সেই জ্বালাবোধ থেকেও হতে পারে রাতে অতীশ কাছে এলেই এক কথা, আমার শরীর ভাল নেই—পারব না। মানুষটা তখন কিছু বলে না। মুখ ব্যাজার করে উঠে চলে যায়। নির্মলা নিজের বিছানায় শুয়েও টের পায় অতীশ বাথরুমে ঢুকে স্নান করছে। শরীর গরম হয়ে গেলে, অতীশের বোধহয় এছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না।

আর তখনই মনে হয় অতীশ ভারি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছে। নির্মলার ভিতর অনুতাপ জেগে উঠলে বলবে, কী করব বল, আমার ভাল লাগে না।

অতীশ পায়চারি করবে, অথবা লেখার টেবিলে বসে বলবে, তোমার কোনও

দোষ নেই। তোমাকে আমি দায়ী করছি না। এই আমার নিয়তি। এই আমার সাফারিংস।

টুটুল মিণ্টু ঘুমিয়ে থাকে। ওরা টের পায় না বাবা মার মধ্যে গভীর রাতে কথা কাটাকাটি চলছে। একজন ঠাণ্ডা মেরে গেছে অন্যজন উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারছে না। অধীর হয়ে পড়ছে।

নির্মলা পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

অতীশ বলছে, নিয়তি।

নিয়তি কী শেষ পর্যন্ত মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। নির্মলার সঙ্গে তার প্রেম, প্রেম কী, না শরীর, নির্মলা এভাবে জোরজার করে তার সঙ্গে বাড়ি চলে না গেলে, সে শেষ পর্যন্ত কী করত বুঝতে পারে না। সেই শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে তার উচ্চারণের ত্রুটি ধরিয়ে না দিলে, সে নির্মলার সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পেত না। তার উচ্চারণে কখনও বাঙাল টান থাকে। কো-এড়ুকেশন কলেজ। নির্মলার বান্ধবীরা তার উচ্চারণ নিয়ে হোস্টেলে মজা করত। নির্মলা কেন যে সহ্য করতে পারত না। একদিন থাকতে না পেরে ছুটে এসে বলেছিল, মেলবোর্ন হবে, ম্যালবোর্ন বলেন কেন। আসলে সহানুভূতি থেকে ধীরে ধীরে এক গভীর জীবনের উন্মেষ, নির্মলার ক্ষেত্রে ভালবাসা ছিল, তার ক্ষেত্রে কী নির্মলার শরীর প্রলোভনে ফেলে দিয়েছিল!

মাঝে মাঝে গভীর রাতে টেবিলে লিখতে বসলে অতীশের এসব মনে হয়। আর মনে হলেই সেই দূরবর্তী নীহারিকা থেকে কে হেঁকে ওঠে লাভ ডাজ ব্রিং অ্যাবাউট জাস্টিস ইফ ইউ ওনলি ওয়েট অ্যাট লাস্ট। সে বাথরুমে স্নান সেরে বাসাবাড়ির খোলা বারান্দায় একটা চেয়ারে তখন চুপচাপ বসে থাকত। দূরের নক্ষত্রমালা দেখতে দেখতে কখন তার শরীর জুড়িয়ে যেত। দেখতে পেত সেখানে, এক অবারিত আকাশ, নীল সমুদ্র, একটা সাদা রঙের বোট। কবেকার কথা—অথচ মনে হয় এই মাত্র যেন সে সেই বোট ছেড়ে উঠে এসেছে ডাঙায়।

নির্মলা পাশের ঘর থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল অতীশকে। আজ সকালের দিকে কারখানায় বড় রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। অথচ এখন দেখলে কে বলবে, মানুষটা তার প্রাণ সংশয় করে কারখানার একজন কর্মীকে ঝুপড়ি থেকে তুলে এনেছে। যেন জীবনে এটা কোনো ঘটনাই নয়। ফিরে এসে একবারও বলেনি, কী সাংঘাতিক ব্যাপার জান? সবাই ঘিরে ধরেছে, বোমা ফেলেছে, হাতে লোহার রড, সোডার বোতল—মারদাঙ্গা—সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। তা হলে কী মানুষটা তার মৃত্যুভয় জয় করে ফেলেছে। নিজের জন্য ভাবে না! অথচ সেই মানুষটাই কী কারণে চোখের জল ফেলতে পারে বুঝতে পারল না। যে মানুষ মৃত্যুভয় জয় করতে পারে সে তো সাংসারিক শোকতাপ সহজেই অবহেলা করতে হয় কী ভাবে জেনে গেছে।

নির্মলা আজ মানুষটার জন্য বড় মায়া বোধ করছে। অতীশ টুটুলকে কোলে নিয়ে বসে আছে। যেন এ জন্যই অসময়ে ফিরে এসেছে বাড়ি। আর কোথাও বের হবে না। টুটুল মিণ্টু নির্মলা কাছে থাকলে সে কী নিরাময় হয়ে যায়।

অতীশকে তখন হাজার রকমের প্রশ্ন করছে টুটুল। চঞ্চল বালক, যা কিছু শোনে, দেখে সব তাতেই তার অনন্ত বিস্ময়। বাবা বাসায় ফিরে এলে বিস্ময়, বাবা বাসা থেকে বের হয়ে গেলে বিস্ময়, পাখি প্রজাতি দেখলে বিস্ময়, পাগল হরিশকে দেখলে বিস্ময়। রাস্তার বাস ট্রাম, রাজবাড়ির পুকুর, পুকুরের পাড়ে দেবদারু গাছ, কদম ফুলের গাছ, জঙ্গলের মতো হয়ে আছে কিছুটা জায়গা—যেন এমন জায়গাতেই রাতের জ্যোৎস্নার পরীরা নেমে আসে—রাক্ষস খোক্কস, অথবা মানুষ কেন পাখির মতো উড়ে যেতে পারে না—এমন সব প্রশ্ন বাবাকে তার অজস্রবার। দুমবার সিং পাতাবাহারের গাছগুলির পাশে এসে দাঁড়ালেও তার বিস্ময়ের শেষ নেই। সেই খবর দিয়ে গেছে, রাজবাড়ির ছাদে পরীরা নামে। ছাদের কার্নিশে পাথরের মূর্তি সব, পাখা মেলা, তাকে দুমবার বলেছে দিনের বেলায় ওরা পাথর হয়ে থাকে—রাত হলেই তারা প্রাণ পায়। উড়ে বেড়ায় কিংবা সেই জঙ্গলের মধ্যে নেমে খেলা করে। দুমবার বলে গেছে ওকে একটা বাচ্চা পরী ধরে দেবে। সেই থেকে টুটুলের বিশ্বাস—আজ হোক কাল হোক দুমবার একটা বাচ্চা পরী ধরে দেবে।

—কুয়াশা হলে বাচ্চা পরীদের পাখা ভিজে যায়।

টুটুল জানালায় দাঁড়িয়ে এত আগ্রহ নিয়ে শোনে যে পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় সত্য ঘটনা আর হয় না।

তখন পরীরা উড়তে পারে না। পাখা ভিজে গেলে ভারি হয়ে যায়, সকালের রোদে শুকিয়ে নিতে না পারলে উড়তে পারে না। দুমবার সব শিশুদেরই নাকি একটা বাচ্চা পরী ধরে দিয়েছে, টুটুলকেও দেবে।

দেখা হলেই টুটুলের এক কথা, দুমবার দাদা আমার পরী?

—খুঁজছি।

—কোথায়?

—পুকুরের পাড়ে।

—পাচ্ছ না?

ঠিক পেয়ে যাব খোকনবাবু।

নির্মলার মনে হয়, এই যে ফাঁক পেলেই সদর খুলে টুটুল বের হয়ে যায়, ঘরে থাকতে চায় না, পুকুরপাড়ে একা একা হেঁটে বেড়ায়, শুধু সেই বাচ্চা পরীটাকে সে ধরে আনবে বলে। এ বয়সে সবার জীবনেই একটা বাচ্চা পরী লাগে। তারপর বাচ্চা পরীরাই নারী হয়ে যায়, নির্মলা হয়ে যায়।

সে কতদিন টুটুলকে বলেছে, পরীরা তোমার মতো দুষ্টু ছেলেদের ভালবাসে না।

টুটুল তখন শান্ত হয়ে মার কথা শুধু শোনে!

—পরীরা চায় না, ওদের তুমি খুঁজে বেড়াও। বাচ্চা পরী ধরে আনলে ওদের মা বাবার কষ্ট হবে না!

টুটুল বড় বড় চোখে মাকে দেখে তখন। তারপর মার কাছে গিয়ে আবদার করে, আমাকে তবে কোলে নাও। নির্মলা টুটুলকে কোলে নিয়ে বলবে, পুকুরপাড়ে আর একা যাবে না বল!

—গেলে কি হবে মা?

—পরীরা যদি তোমাকে তুলে নিয়ে যায়—তখন আমরা তোমাকে কোথায় পাব?

টুটুলের তখন মুখ কেমন ভয়ে শুকনো। সে মার চুলে মুখ লুকিয়ে বলে, আমি আর যাব না মা। কোথাও যাব না।

এখন সেই টুটুল বলছে, বাবা আমাকে হাতি দেখাবে না?

অতীশ সব কথাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে। যা বলছে সব।

—দেখাব।

—বাবা তুমি আমি হাতির পিঠে চড়ে চলে যাব।

—কোথায়?

—সেই যে বললে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে—আমরা সেখানে যাব।

অতীশ বলল, জান সেই চরে একটা বিশাল তরমুজের খেত ছিল। কতদিন ঈশম দাদা আমাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে তরমুজের জমিতে চলে গেছে।

তরমুজ টুটুল দেখেছে, খেয়েছে। কিন্তু কোথায়, কেমন লতাপাতার মধ্যে ডুবে থাকে সেই নদীর চর অথবা বালিয়াড়ি—এক স্বপ্নময় জগৎ যেন পার হয়ে অতীশ আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজে সারাজীবন বড় বেশি ভালবাসার কাঙাল। অথচ তার মধ্যে এক পাপবোধ নিরন্তর আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। অফিসে গেলেই মনে হয় টুটুলটা না আবার একা একা বের হয়ে যায়। কত সতর্ক থাকে সে। কেবল নিরন্তর এক ভয় এরা একদিন সবাই তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। টুটুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মিণ্টুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এমন এক আতঙ্কে সব সময় সে অস্থির হয়ে থাকে। বাসায় ফিরে ডাকবে, টুটুল কোথায় রে। মিণ্টু। কিংবা রাজবাড়ির সদরে ঢোকার মুখে তার চোখ সর্বত্র এই দুই শিশুকেই খুঁজে বেড়ায়। সে যখন দেখতে পায় তারা তাকে দেখে দৌড়ে আসছে, তখন এত হাল্কা বোধ করে যে মনে হয় জীবনে এর চেয়ে সে বেশি কিছু চায়নি।

নির্মলা আড়ালে দাঁড়িয়ে আজ অতীশকে দেখছে। কতদিন পর এই চুরি করে দেখার মধ্যে প্রাণের ভিতর এক অতীব মায়া টের পাচ্ছে।

সে বোঝে কলকাতায় এসে মানুষটা বড় বেশি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। যেন যে কোনো দিন, রাজবাড়ির অফিস থেকে তাকে একটা চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হবে, অতীশদীপঙ্কর ভৌমিক বাড়তি লোক। কারখানা চালাবার মতো হিম্মত তার নেই।

তা হলে কী শেষে ফুটপাথ!

না বাড়ি।

কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলে তারা খাবে কী! সবাই তো এই মানুষটার মুখাপেক্ষী। অতীশ মরে গেলেও বাড়ি ফিরবে না। তার টুটুল মিণ্টুকে বড় করা আছে। ওখানে গেলে পড়াশোনাই হবে না। এই শহরে সুযোগ-সুবিধা কত। আজ ভাবল নির্মলা খবরটা দেবে। কয়েকদিন থেকেই ভেবেছিল, ওকে বলা দরকার। কিন্তু বলতে পারছে না। টুটুল মিণ্টুকে ছেড়ে থাকতে হবে ভয়েই সে বলতে পারছে না, জান সুবোধদার সঙ্গে দেখা।

—সুবোধদা!

—আমাদের বি. টি. কলেজের প্রিন্সিপাল।

—অ! হ্যাঁ হ্যাঁ! তোমাকে চিনতে পারল! কোথায় দেখা!

—বৈঠকখানা বাজারে। মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকেন। রিটায়ার করেছেন। বার বার বলেছেন, একদিন তোমাকে নিয়ে যেতে। দেখেই বললেন, তুমি শ্রী না! কী চেহারা হয়েছে তোমার!

নির্মলা মনে মনে এমন অজস্রবার ভেবেছে বলবে। সে বললে অতীশ কী বলবে, তাও ভেবেছে। কিন্তু সাহসে কুলায়নি। এই সংসারে সেও ইচ্ছে করলে যে উপার্জন করতে পারে, শহরে না হোক গাঁয়ে গেলে সে একটা শিক্ষকতার কাজ পেয়ে যাবে, এটা সে যেন অনেক আগেই জানত। অতীশ কম চেষ্টা করেনি শহরে, কিংবা কুমার বাহাদুরকেও অনুরোধ করেছিল, যদি কোনো মেয়েদের স্কুলে হয়। তার বাংলায় অনার্স আছে—কিন্তু হয়নি। হয় না। কারণ সব ক্ষেত্রেই একজন দক্ষ লোকের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। অথবা প্রভাব না থাকলে শুধু এলেমের জোরে এ বাজারে চাকরি হয় না।

নির্মলা এবার অতীশের সামনে এসে দাঁড়াল।

আসলে কী আজ মানুষটা বাড়ি ফিরে ঘাবড়ে গেছে। সকালের দিকে যেভাবে প্রাণ সংশয় করে এত বড় একটা দায় ঝোঁকের মাথায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল, এখন ফিরে এসে কি ভেবেছে, এটা তার করা উচিত হয়নি। কিংবা ক্রমেই নিরাপত্তা বোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠছে তার।

তার কিছু হলে, টুটুল মিণ্টুর কী হবে ভেবে কী চোখে জল এসে গেছিল!

নির্মলা বলল, কী ভাবছ এত বলত !

অতীশ এবার নির্মলাকে দেখল। এক সকালে এত-সতেজ দেখাচ্ছে যে সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, নির্মলা বড় অসুখ থেকে ভুগে উঠেছে। তাকে দেখলে জীবনে কোনো উত্তাপের প্রকাশ ছিল না এতদিন। সে বাসায় ফিরে এলে যতটা সম্ভব তাকে বিশ্রাম দেবার চেষ্টা ছাড়া নির্মলার অন্য কিছু করণীয় আছে মনে হত না। তিন চার মাস হয়ে গেছে, সে আর নির্মলাকে সহবাসের ব্যাপারে ঘাঁটায় না। নিজের মধ্যেই টের পায়, নির্মলার সেই তিক্ত কথাবার্তা।—শরীর ছাড়া তুমি কিছু বোঝ না।

রাতে ঘুম না এলে সে নির্মলার পাশে যাবার সময়ই মনে পড়ত কথাটা। সে ফিরে আসত। নির্মলা টের পেত না, একজন মানুষ তার স্ত্রীর পাশে শোবে বলে উঠে এসেছিল, আবার কী ভেবে ফিরে গেছে। অতীশ ভাবত সে নিজেই এখন যেন আর্চির প্রেতাত্মা। জাহাজে বনির কেবিনের পাশে ঘুর ঘুর করত আর্চি। সে যে প্রলোভনে নির্মলার পাশে শোবার জন্য পাগল হয়ে থাকে, সেই দীর্ঘ সমুদ্র সফরে আর্চিরও তাই হত। আর্চি স্থির থাকতে পারত না। বালিকা পুরুষের ছদ্মবেশে নারী হয়ে উঠছে, স্থির থাকে কী করে! মনে হত আর্চির সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই। আর তখনই সে টের পেত নির্মলা ঠিক টের পেয়েছে। নির্মলা ভয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। স্কাইলাইট দিয়ে রাজবাড়ির বিশাল পাঁচিলে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলতে থাকত তার রেশ ঘরে এসে আবছা জ্যোৎস্নার মতো ছায়া সৃষ্টি করত। মশারির নিচে নির্মলা, দীর্ঘাঙ্গী যুবতীর এই অসহায় শোওয়া দেখে ভাবত সে আর আর্চি একই দুষ্টগ্রহ থেকে সৃষ্ট। সেও একই প্রেতাত্মা হয়ে গভীর রাতে গোপনে পায়চারি করছে এই বাসাবাড়িতে।

নির্মলা গায়ে একটা হালকা র‍্যাপার জড়িয়ে নিয়েছে। অন্যদিন এ সময় সে সদর দরজায় তালা দিয়ে টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে লেপের নীচে শুয়ে থাকে। ওরা বোঝে মার শরীর ভাল না। মিণ্টু তো এখন অনেক কাজে নির্মলাকে সাহায্যও করে থাকে। মার কাজে এটা ওটা এগিয়ে দিতে পারলে কাজে সাহায্য হয় মিণ্টু এটা বুঝতে শিখেছে। মার খুব বাধ্যের। মার দুপাশে শুয়ে এ সময় তাদের দিবানিদ্রার অভ্যাস।

আজ অন্যরকম।

অন্যরকম—কারণ মানুষটা তাদের ফিরে এসেছে। এ সময় কখনও ফেরে না। আজ ফিরে এসেছে। সারা সকাল কী যে আতঙ্কে কেটেছে, এখনও ভাবলে, শরীর হিম হয়ে যায়।

এখন একই তক্তপোশে স্ত্রী সন্তান সব নিয়ে অতীশের একটা ভিন্ন গ্রহ।

নির্মলা বলল, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না!

—না।

অতীশের হাত তুলে নিজের হাতে নিতেই নির্মলার মধ্যে রক্ত আবার উষ্ণ হতে শুরু করেছে। অতীশের হাত সত্যি ঠাণ্ডা।

এ যে কতকাল পর। সে ভিতরে অতীশকে একা পাবার আকাঙ্ক্ষায় বলল, চাদরটা দিচ্ছি, গায়ে দাও। হাত পা তোমার ঠাণ্ডা কেন?

অতীশের কোলে টুটুল। সে নামছে না। মিণ্টু বাবার পিঠে পিঠ দিয়ে বেতাল পড়ছে। আফ্রিকার জঙ্গল, দুর্ধর্ষ বুম বুম উপজাতির হীরের মুকুট, করোটির সিংহাসন—বেতাল ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, চোখে মুখোশ পরা। কেমন গা শিরশির করছে পড়তে পড়তে। বাবার পিঠে পিঠ দিয়ে হাঁটুর নিচে ফ্রক টেনে সুদূরের জঙ্গলে সিংহ, বাঘ, কুমীর, জিরাফের সঙ্গে সেও যেন গভীর বনে ঢুকে যাচ্ছে। অধীর আগ্রহে সে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে, বেতাল তারই মতো একটা মেয়েকে উদ্ধারের জন্য নদী, বন, জঙ্গল, পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে ছুটছে। টুটুল টের পায়নি। দিদিটা ছবির বই গোপনে পড়ছে। টের পেলে এত মজা, মজা থাকত না। সেও উঁচু হয়ে বসত দিদির পাশে। এটা কীরে দিদি, সিংহটা হাঁ করে আছে কেন? জলে ওগুলো কী ভেসে বেড়াচ্ছে? পড়ার আনন্দটাই মাটি করে দিত। এত কথা বলতে পারে! এখন বাবাকে জ্বালাচ্ছে।

নির্মলা বলল, তোরা বাবাকে একটু ঘুমোতে দিবি না। ও ঘরে গিয়ে শোও না। অতীশের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

অতীশের দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। কিন্তু নির্মলার চোখে চোখ পড়ে যেতেই সে নিজেও ভিতরে আজ উষ্ণ হয়ে উঠছে। নির্মলার ভিতর যে মেঘের আভাস ছিল এতদিন, তা কেমন উড়ে গেছে। লক্ষ্য করে দেখল, অনেকদিন পর নির্মলা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেছে। মুখে হাল্কা প্রসাধনও করেছে। বিয়ের পর সে কত রাতে দেখেছে, সাঁঝ হলেই গা ধোওয়া, পাট ভাঙা শাড়ি পরা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করা, খোঁপায় রজনীগন্ধার ফুল, কেমন এক নীল লণ্ঠন জ্বালিয়ে অপেক্ষায় থাকা। আজ ক' মাস ধরে নির্মলা প্রসাধন করে না। বেঁচে থাকাটা বিড়ম্বনার সামিল। চোখে মুখে তিক্ততার আভাস। অথচ অতীশ দেখছে সংসারে বিন্দুমাত্র তার উপেক্ষা নেই। একমাত্র রাত হলেই সে অতীশকে কেমন এড়িয়ে যেত। কথাবার্তা যতটুকু দরকার, সংসারের প্রয়োজনে অতীশের যতটুকু দরকার তার সঙ্গে—অতীশের সঙ্গে আর কোনো যেন সম্পর্কের কথা মনে থাকত না। মনে করিয়ে দিলে মুখ চোখে তিক্ততা ভেসে উঠত।

সেই নারী আজ একেবারে অন্যরকম।

সে আজ নিজের জীবন বিপন্ন করে মাধাকে ঝুপড়ি থেকে তুলে এনেছে। সেই পুণ্যফলে কী আজ নির্মলার মধ্যে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে।

নির্মলা টুটুলকে বলছে, তোরা ঘুমাবি না! কীরে! আয়। শুবি।

নির্মলা টুটুল মিণ্টুকে জোর করে ঘুম পাড়াতে চাইছে।

টুটুল বিন্দুমাত্র টলছে না।

মিণ্টু বলছে, আমার ঘুম পাচ্ছে না মা।

অতীশ বলল, যাও। মার কথা শুনতে হয়।

টুটুল বলল, বাবা আমাকে রেলগাড়ি কিনে দেবে না ?

—দেব। মার কথা শুনলে দেব।

একসঙ্গে দুজনেই বুঝি এখন বুঝে ফেলেছে বড় অধীর তারা। কিন্তু এই বাসাবাড়িতে দিন দুপুরে নির্মলাকে একা পাবার উপায় নেই।

অতীশ বলল, আমার পাশে বোস।

নির্মলা এবার টুটুলকে জোর করে কোল থেকে তুলে নিয়ে বলল, বাবার খুব আদর খাওয়া হচ্ছে!

টুটুল বাবার কোল থেকে কিছুতেই নামবে না।

অতীশের শরীর যেন এক অমোঘ আকর্ষণে ভেতরে ভেতরে পাগল করে দিচ্ছে নির্মলাকে।

সে বলল, টুটুল মিণ্টু এস।

গলায় বেশ ধমকের সুর।

—এস ঘুমাবে। বাবাকে একটু শুতে দাও।

—আমরা বাবার সঙ্গে শোব।

—অতীশ আর কী করে। যদি ওরা দু পাশে শুয়ে বাবার পাশে ঘুমিয়ে পড়ে তবে নির্মলাকে পাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

নির্মলা বলল, তোমরা, বাবার পাশে শোবে আর আমি ভেসে এসেছি!

নির্মলা একটা বড় লেপ এনে বলল, আমরা আজ সবাই তোদের বাবার সঙ্গে শোব। কেমন!

—না না! মিণ্টু উঠে বসল। তুমি ওধারে গিয়ে শোও না মা। বাবা আমাদের।

নির্মলা বলল, ইস তোদের একার!

টুটুল বলল, বাবা তুমি মার সঙ্গে কথা বলবে না কেমন! মা কেবল তোমাকে বকে।

—আমাকে বকে তোমার মা? অতীশ শুয়ে পড়ল কথাটা বলতে বলতে। লেপ টেনে গা ঢাকা দিল।

—নির্মলা বলল, কী মিথ্যুক। কখন বকলাম!

—বারে বকো না, কেবল বলবে, তোমার বাবা যা একখানা মানুষ! সংসারে অচল। বাবা তুমি অচল!

নির্মলা কিছুতেই তার মানুষটার পাশে বসতে পারছে না। এত অধীর হয়ে পড়ছে, কেন এমন হয়! হঠাৎ আজ তার কী হয়েছে! সকালের আতঙ্ক থেকে মানুষটার অমঙ্গল আশঙ্কার ভিতরে তার যে ক্ষোভ ছিল, সব কি নিরাময় হয়ে যাওয়ায় আবার ভরাট জমিতে বৃষ্টিপাত ঘটছে! উর্বরা হয়ে উঠছে তার আবাদের ক্ষেত্রটি! ভেতরে জ্বালা ক্ষোভ সহজে মানুষকে নিরাময় হতে দেয় না। অবিবেচক করে তোলে।

কিন্তু সে করবে কি! দু পাশে মিণ্টু টুটুল। তার বিরুদ্ধে বাবার কাছে নালিশ। বাবার পাশ থেকে তারা নড়বে না।

—তুমি বল না বাবা অচল!

—বলি বেশ করি।

অতীশ মজা পাচ্ছে। এত সুন্দর বিকেল কতকাল পর তার জীবনে যেন এসেছে। বালিকার মতো মা মেয়েতে ঝগড়া করছে! মিণ্টু জরির সাদা ফ্রক গায়ে দিলে সত্যি একেবারে জলপরী। সবুজ বনভূমির মতো লাবণ্য শরীরে। দেখলেই বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করে। অথবা ভাইবোন মিলে যখন রাজবাড়ির মাঠে কিংবা বাগানে খেলা করে বেড়ায়, কিংবা বাবাকে সদর গেটে ঢুকতে দেখলে দৌড়ে আসে—অতীশের তখন কী যে হয়—যেন এই দুই শিশুকে বড় করে তোলার মধ্যে তার জীবনের সব কৃতিত্ব ধরা পড়ে গেছে। ঠিকঠাক বড় করে তুলতে পারলে বাবা হিসাবে তার অহঙ্কারের সীমা থাকবে না। ভাই বোন, তারই মতো গায়ের রঙ পেয়েছে। মিণ্টুর চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। নির্মলা বড় যত্ন করে চুল আঁচড়ে দেয়। পাউডার মাখিয়ে দেয়। ওর ফ্রক প্যাণ্টি, জুতো সব সময় তকতকে ঝকঝকে। মাথায় লাল রঙের রিবন বেঁধে মিণ্টু কত দেখতে সুন্দর এমন এক প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়ে গেছে নির্মলার মধ্যে। এত করে মিণ্টুর জন্য, সেই এখন বাবার পাশে মাকে কিছুতেই শুতে দিচ্ছে না। কেবল বলছে, তুমি তোমার ঘরে যাও না মা। বাবা আমাদের গল্প বলবে।

টুটুলের এক কথা, বাবা আমাকে কবে রেলগাড়ি কিনে দেবে? বল না।

টুটুল উঠে বসেছে। সে বাবার কাছে থেকে কথা আদায় না করে যেন ছাড়বে না।

নির্মলা বলল, দেখত টুটুল রান্নাঘরে কেক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে টুটুল লাফিয়ে নামল নিচে।

—কোথায় মা?

—মিটসেফে আছে।

মিণ্টু উঠে বসল। বলল, বাবা তুমি কেক এনেছ ?

অতীশ জানে সে কেক আনেনি। তবে নির্মলা আনতে পারে। আজকাল কেউ এলে বাসায়, নির্মলা চানাচুর বিস্কুট কিংবা কেক আনিয়ে দেয়। সে এনে রাখতেই পারে। গোপনে রেখে দেবার স্বভাবও আছে। কারণ যা দুটো বিচ্ছু, কোনো খাবারই ঘরে রাখা যায় না। এমন কি ঘরে কিছু না থাকলে, মিটসেফের মাথা থেকে চিনির কৌটো টেনে নামিয়ে মুঠো মুঠো গিলবে। তারপর মুখ মুছে ঘর থেকে বের হয়ে আসবে। নির্মলা আসলে টুটুলকে লেলিয়ে দিয়ে মিণ্টুকে তার পাশ থেকে তুলে দিতে চাইছে। কিংবা এও হতে পারে শরীরের অধীরতা এত সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে যে সে নিজের সন্তানের মঙ্গল অমঙ্গলের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

টুটুল দৌড়ে এসে বলছে, কোথায় মা।

—মাঝের তাকে আছে।

মিণ্টু দৌড়ে নেমে গেল। টুটুল নাগাল পাবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্মলা অতীশের লেপের ভেতর নিজেকে আড়াল করে ফেলল।

কে আগে সেই গুপ্ত জিনিসটি খুঁজে বের করতে পারবে তার তাড়া। সবাই এখন যে যার গুপ্ত রহস্য সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছে। মিণ্টু ঘর থেকে টুল টেনে নেবার সময় দেখল বাবার পাশে মা শুয়ে আছে। টুটুল খুঁজে পেলে সবটা একাই সাবাড় করবে। মিণ্টু বলল, মা কোথায় রেখেছ ?

—দেখ না খুঁজে, পাবে। যা না ও ঘরে।

—এই শোন !

—কী ?

—তুমি আজ কিন্তু বের হবে না।

—ঠিক আছে বের হব না।

—আমরা আজ সবাই মিলে বেড়াতে বের হব।

—ঠিক আছে।

—এই শোনো ! দাঁড়াও। ওরা আসছে। কী হল !

—ওরা বুঝতে পারবে নির্মলা।

—পাশ ফিরে শুচ্ছি। আঃ কী করছ ! লেপটা টানছ কেন। পা বের হয়ে যাচ্ছে !

মিণ্টু কেক পেয়ে গেছে। আর পেয়েই দৌড়ে চলে এসেছে বাবা মার কাছে।

মা পাশ হয়ে শুয়ে আছে। বাবাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না যেন।

নির্মলা আর পারছে না। সব ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু মিণ্টু কী কিছু বোঝে ! মিণ্টু তো একেবারে তক্তপোশের কাছে। নির্মলা কেমন নির্লজ্জ

হয়ে উঠছে।

মিণ্টু ডাকল, বাবা।

অতীশ লেপের তলা থেকে সামান্য মুখ বের করে বলল, আমাকে দিবি না ? সে হাত বাড়াল।

এবং দুজনেই এভাবে লুকোচুরি খেলার মতো দুই সন্তানের সঙ্গে যেন কিছুই হচ্ছে না, যৌন আস্বাদে আপ্লুত হবার মুখেই শুনল, টুটুল কোথা থেকে পড়ে গেছে। শুধু একটাই চিৎকার, মা !

নির্মলা নিজেকে সহজেই আলগা করে নিয়ে দৌড়ে গেল। অতীশ কেমন স্থির চোখে শুয়ে আছে। তার যেন কিছুই হয়নি। সব অধীরতা এভাবে সন্তানের আর্ত চিৎকারে ঠাণ্ডা মেরে যেতে পারে একদণ্ড আগেও অনুমান করতে পারেনি।

সে শুয়ে থেকেই চিৎকার শুনছে নির্মলার—শিগগির এসো, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

অতীশ কোনরকমে বেশবাস ঠিক করে নেমে গেল। সে গিয়ে দেখছে, নির্মলার কোলে টুটুল। টুল থেকে পড়ে গেছে। মাথার থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। সে দেখছে টুটুল বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কী করবে ঠিক করতে পারছে না।

অতীশ দরজা খুলে টুটুলকে কাঁধে ফেলে এখন রাস্তার দিকে ছুটছে। রাজবাড়ির এই শীতের বিকেলে টুটুলকে বুকে নিয়ে ছুটতে দেখেই কুম্ভবাবু রাধিকাবাবু, এবং সব মানুষজন ছুটে এসেছে, শিগগির ট্যাক্সি ডাক।

—কী হয়েছে !

—অতীশ কেবল বলছে জানি না।

বউ-রাণীর খাস বেয়ারা ছুটে এসেছে, কী হয়েছে ?

—জানি না, জানি না। আমি কিছু জানি না।

নির্মলা শুধু বলল, পড়ে গেছে টুল থেকে। নির্মলা এ সময় বেশ যেন শক্ত। নিয়তি মানুষের, মানুষ নিজেই এই নিয়তি তৈরি করে নিজের জন্য, তার থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই।

অতীশ টের পায় সেই প্রেতাত্মা আর্চি আজ সত্যি আবার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে না হতেই প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাবে টুটুল পড়ে গেছে। এতো টুটুল নয়, যেন সে নিজে ! ট্যাক্সির ভিতর সে আর নির্মলা ! দুজনের কোলে টুটুল নিথর।

কুম্ভবাবু, দুমবার সিং সামনে।

হাসপাতাল।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ড।

টুটুল যেন ঘুমিয়ে আছে।

সংজ্ঞা নেই।

নির্মলা উপুড় হয়ে পড়েছে, টুটুলের মুখের উপর, আমার বাবা। টুটুল আমার বাবা, টুটুল টুটুল! বাবা আমি এটা কী করতে গেলাম! টুটুল টুটুল বলে হাউহাউ করে কান্নায় নির্মলা টুটুলের বুকের উপর আছড়ে পড়ল।

এখন অতীশ কী করবে ঠিক করতে পারছে না। হাসপাতালে বসে থাকবে না বাসায় ফিরবে।

সে বলল, আমি কী করব? আমি এখন কী করব?

নির্মলা টুটুলের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির অবিচল—কোনও কথা বলছে না। ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কুম্ভ বুঝিয়েছে, নির্মলার মেজদির বান্ধবী বুঝিয়েছে, তবু সে নড়েনি।

—বউদি চলুন।

মেজদির বান্ধবী বুঝিয়েছে, বাসায় যাও। আমি তো আছি ফোনে জানিয়ে দেব।

অতীশের যেন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। বিকেল থেকে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। মেজদিকে ফোনে পায় নি। বার বার রিং বেজে গেছে। কেউ ধরেনি। এমন অসময়ে ফোন অথচ কেউ ধরছে না! ফোন খারাপ থাকতে পারে। নির্মলা হাসপাতালে থাকার সময় মেজদির বান্ধবী অনেক করেছে, আবার টুটুলকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে কে জানত! সে কুম্ভ ইমারজেন্সিতে টুটুলকে ধরাধরি করে নামাবার সময় নির্মলা সহসা উধাও হয়ে গেছিল। কোথায় গেল! তার তখন কিছু ভাববারও সময় ছিল না।

দুজন হাউসস্টাফ ছুটে এসে বলেছিল, ওদিকে না, এদিকে।

ওরা ঘাড় গলার রক্ত মুছে, টুটুলের মাথায় ব্যান্ডেজ করার সময় নির্মলা হাজির।

এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, সুরুচিদি আসছে। হাসপাতালে কেউ একজন নিজের লোক থাকলে সাহস অনেক বেড়ে যায়।

নির্মলা ঠোঁট চেপে রুদ্ধ আবেগ সংবরণ করছিল শুধু। কথা বলতে পারছিল না। টুটুল হাত পা ছড়িয়ে যেন ঘুমাচ্ছে।

অতীশ বলেছিল, ভাল হয়ে যাবে। আসলে অতীশ বলতে চেয়েছিল, আমার এমন হবে জানতাম।

সুরুচিদি খুব সাহস দিচ্ছিলেন প্রথম থেকেই। ও কিছু হয় নি ঠিক হয়ে যাবে। মণিকাকে খবর দিয়ে দিও। আমি আছি।

সুরুচিদি হাউসস্টাফশিফ শেষ করেই হাতপাতালে কাজ পেয়ে গেছেন। ক'মাস আগে নির্মলার মেজদি মণিকা এবং সুরুচি মিলে ওকে এই হাস-

পাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। নির্মলার হিসটেরেকটমি করতে হয়েছে। সে সময় অতীশ প্রায়দিন টুটুল মিণ্টুকে নিয়ে হাসপাতালে আসত নির্মলাকে দেখতে। আজ আবার টুটুলকে সেই একই জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। চারপাশে রোগীর আর্ত চিৎকার, ব্লাড সেলাইন সব চলছে। সারা ঘরে রোগী থিকথিক করছে। করিডরে পর্যন্ত জায়গা নেই। সুরুচিদি না এলে টুটুলকে এত সহজে ভর্তি করেও নেওয়া যেত না। তিনি কী করণীয় সব বুঝতে পারছেন। দুবার তিনি আড়ালে রেসিডেণ্ট সার্জেনের ঘরেও ঘুরে এসেছেন।

তারপরই একটা খাতায় সই করতে হল অতীশকে। প্রথমে ঠিকানা, পরে ফোন নম্বর।

টুটুলকে স্ট্রেচারে করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সুরুচিদি এবার আর টুটুলের সঙ্গে গেল না। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তিনি হয়ত জানেন।

অতীশ শুধু একবার বলেছিল, কোথায় নিয়ে গেল ওকে?

সুরুচিদির মুখ গম্ভীর। কেবল বললেন, আপনারা বাসায় যান। নির্মলা তুমি যাও। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ। আমরা যথাসাধ্য করব। বেশ রাত হয়েছে।

আসলে এই ফুটফুটে শিশুটির জন্য সুরুচিদিরও কোথায় যেন মমতা জন্মে গেছে। ছোট্ট শিশুদের এমনিতেই মানুষ ভালবাসতে চায়। টুটুল মার সঙ্গে দেখা করার সময় কতদিন সুরুচি মাসির কোয়ার্টারে গেছে মেজদির সঙ্গে। টুটুলের সেই দৌরাত্ম্য এখন মনে করতে পেরে সুরুচিদিও কেমন ভাল নেই। স্নেহ মমতা সবই মেয়েদের মধ্যে একটু বোধহয় বেশি। এই যুবতীও কেমন কী এক গভীর আশঙ্কায় কাতর।

কুম্ভ বলল, আপনার কী মনে হয়—কোথায় লেগেছে। ভেতরে হেমারেজ হচ্ছে না তো!

অতীশ শুধু বলছে, ও ভাল হবে তো সুরুচিদি?

সুরুচিদির সঙ্গে আরও কেউ কেউ হাসপাতালের ডাক্তার নার্স দাঁড়িয়ে আছে। টুটুল মণিকার যে বোনপো, নির্মলা যে বোন এসব শুধু বলছিল। অতীশ বুঝতে পারছে, এরা সবাই মণিকাদিকে চেনে। সে জানত মণিকাদি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। সেই সুবাদে ডাক্তার নার্সরা মণিকাদির প্রতি কোথাও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে যেন নির্মলাকে ঘিরে রেখেছে। যে বেডে এতক্ষণ টুটুল শুয়ে ছিল, নির্মলা তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

কিছু বললেই এক কথা, কোথায় নিয়ে গেল ওকে! আমাকে দেখতে দেবে না। ও কোথায় আছে?

সুরুচিদি বলল, এস।

অতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা নিচে অপেক্ষা করুন, ওকে দেখিয়ে নিয়ে আসছি।

ওরা লিফটে উপরে উঠে যাচ্ছে। নির্মলা কেমন অসাড়। কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। বুকের মধ্যে কেউ যেন কেবল হাতুড়ি পেটাচ্ছে। হাত পা অসাড়। ঘোরের মধ্যে নির্মলা বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। যেন এই যাত্রা তার অবিরাম, সে আর কোনদিনই নদীর পাড় দেখতে পাবে না। সামনে মনে হচ্ছিল সব ঝাপসা—এক বিভীষিকাময় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ আলোর মধ্যে সে দেখল বিশাল কাচের ঘরে সাদা চাদরে ঢাকা বেড। কেউ নেই, সব কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কাচের পাশ থেকেই সুরুচিদি বলল, ওদিকের তিন নম্বর বেডে টুটুল আছে। সেলাইন ব্লাড দেওয়া হচ্ছে।

মাথার ওদিকটায় ছোট স্ক্রিনের মধ্যে আঁবাবাঁকা সোনালি রেখা ফুটে উঠছে। সব রোগীর মাথার কাছেই ছোট ছোট স্ক্রিন। আঁকাবাঁকা রেখাগুলি বেঁচে থাকার লক্ষণ। মুছে গেলেই নিঃশেষ। খালি মাঠের মত কিংবা নক্ষত্র খসে পড়ার মত শুধু শূন্যতা।

ওদিকে দেয়ালে বড় একটা স্ক্রিন—সেখানেও সব জীবনের রেখা ভেসে যাচ্ছে। মৃত্যু মানুষের বড় কাছাকাছি বসবাস করে। অথবা সে আছে ছায়ার মত নিত্যসঙ্গী। এই বড় কাচের ঘরটার পাশে এসে নির্মলার শরীর কেমন কাঁপতে থাকল। টুটুলের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওর কোঁকড়ান চুল শুধু দেখা যাচ্ছে। আজ সকালেও টুটুল বউ-রাণীর বাগান থেকে মার জন্য ফুল তুলে এনেছিল, আজ দুপুরেও দিদির সঙ্গে মারামারি করেছে, আজ বিকেলেও কেক খাবার জন্য ছোটাছুটি করেছে—সেই টুটুল এখন কাচের ঘরে শুয়ে।

নির্মলা কাচের মধ্যে যেন পারলে সারা মুখ ঠেসে দিয়ে দেখতে চাইছে। ওর পা দুটো দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর ছোট দুটো পা। নির্মলা সহসা কেমন চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, আমার টুটুলের যদি কিছু হয়, আমি কী করব দিদি!

সুরুচিদি ডাকলেন, এস।

নির্মলা কাঁদছে না। সে পাথর। সে হেঁটে যাচ্ছে। সুরুচিদিকে কিছু যেন বলারও নেই। শুধু অনুসরণ।

সে বুঝতে পেরেছে, শেষ চেষ্টা চলছে।

সে নিচে এলে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসতে বলা হল। একবার তাকাল অতীশের দিকে। তারপরই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

অতীশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার কিছু হয়নি। টুটুল তার কেউ হয় না। সে ভাসমান সমুদ্রের ছবি এবং নিঃসঙ্গতা টের পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে, এক অতিকায় অ্যালবাট্রস পাখি ডাঙার সন্ধানে বের হয়ে

পড়েছে। বনি শুয়ে আছে, ঠোঁটে কস। গলা শুকনো। শরীর নিথর। আবার কখনও ঝোড়ো বাতাসে, পাগলের মত অজস্র ঢেউয়ের মাথা ভেঙে তার বোট এগিয়ে চলেছে। পালে হাওয়া লেগেছে—যেন আজ হোক কাল হোক ডাঙা তারা পাবেই। দিশেহারা সে কখনও হয় নি। অথবা কখনও ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। তারাবাতির মত নীল জলে ফুটে উঠছে অজস্র নক্ষত্র। বনি ছইয়ের নিচে প্রসাধনে ব্যস্ত। ছোট্ট দুটো বাংক। দুজনে পা ছড়িয়ে কোন রকমে শুতে পারে। বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাত, পৃথিবীর আকাশ একই রকম। দুজন তরুণ তরুণী মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সহবাসে লিপ্ত হচ্ছে।

জলের নিচে পারপয়েজ মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে।

জলের নিচে র‍্যামোরা মাছ হাঙ্গরের পেটে জোঁকের মত আটকে আছে।

গভীর জলের নিচে দেখা যায় তাদের বিশাল শরীর। ভয় করে না। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। এবং কেন যে মনে হয় প্রাণই হল প্রাণের উৎস। যত বীভৎস হোক সেই সব হাঙ্গরের বিশাল হাঁ, কখনও সমুদ্রের হাহাকারের মত ভয়ঙ্কর নয়। ওরা মাছ দেখলে সাহস পেত, ওরা দূরের দিগন্তে সূর্যাস্তের সোনালি রঙ দেখলে সাহস পেত। আকাশের নক্ষত্রমালা দেখলে সাহস পেত। সবচেয়ে বেশি নির্ভয় হতে পারত অ্যালবাট্রস পাখিটা সারাদিন পর উড়ে এসে বোটের মাথায় বসলে। দুজনেই তখন কথা শুরু করে দিত।

আমরা আর ডাঙা পাব না? বনি এমন প্রশ্ন করত।

অ্যালবাট্রস পাখির নীল চোখ দুটো কেমন অসহায় দেখাত তখন। যেন অতীশকে বলত, ছোটবাবু তুমি আমার ম্যান-অ্যালবাট্রসকে সলিল সমাধি দিয়েছ, আমি এ খবর রাখি। আমার মনে হয় সে আছে তোমাদের মধ্যে। তোমরা আছ বলে, আমি তার অস্তিত্ব টের পাই। আমি উড়ছি। সমুদ্রের অনন্ত হাহাকারের মধ্যে উড়ে যাচ্ছি। কোনো ডাঙার খোঁজ আজ হোক কাল হোক ঠিক পেয়ে যাব। তোমরা ভেঙে পড়বে না।

আসলে অতীশ নিজেই লেডি অ্যালবাট্রসের হয়ে তার কথা ভাবত।

সে বলত, জান আমাদের ডাঙায় ফিরতেই হবে। জান বনি কিছু খেতে চাইছে না। বনি চায়, আমি বাঁচি। আমি চাই, বনিকে ডাঙায় পেঁছে দেই। কাপ্তান স্যালি হিগিনসের পরম নির্ভর—আমি ঠিক বনিকে ডাঙায় পেঁছে দেব। পারব না? হে অ্যালবাট্রস, আমাদের প্রিয় এলবা, বল পারব না? সাহস দাও। আমাদের সাহস দাও। তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

পাখিটা শুধু ওদের দেখছে।

কি পারব না?

পাখিটা অসহায় চোখে যেন দেখছে।

কি বলছি শুনতে পাচ্ছ ?

না না। শুনতে পাচ্ছি না।

বনি, কিছু বলছে না কেন এলবা ? মুখ গোমড়া করে রেখেছে। আজ সারাদিন সমুদ্রের অতলে ডুব সাঁতার দিয়েও একটা মাছ পায় নি—এ কোন সমুদ্রে এনে ফেললে সে ! একটা মাছ নেই। কোনও জলজপ্রাণী নেই। এ কোন সমুদ্র ! আর্চি আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে এল ! এলবা তুমিও কী আর্চির অশুভ প্রভাবে পড়ে গেছ ! এখন আর আমরা কম্পাসের কাঁটা দেখছি না। তুমি যেদিকে উড়ে যাচ্ছ, বোটের মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। কী ঘাড় কাত কর। বল, হ্যাঁ তুমি সেই অশুভ প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছ। দুরাত্মা আর্চি আমাদের অজানা সমুদ্রে নিয়ে এসে তামাশা দেখছে।

আর তারপরই মনে হল, এই হাসপাতাল, এই রক্তপাত শিশুর সবই আর্চির অশুভ প্রভাব থেকে। সেই নিরন্তর হাহাকার সমুদ্রের মতো। সে হাত তুলে চিৎকার করে উঠতে চাইল, না. না, বনি, আমি বিশ্বাস করি না, কথা বল, বনি বনি বনি ! প্লিজ কথা বল, আমি যে একা। আমার যে কেউ থাকল না। বনি আমি কি করব। আমাকে বলে দাও আমি কি করব ! অতীশ প্রায় অনেকদিন পর পাগলের মত চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সুরুচিদি বলল, কিছু হলে ফোনে জানিয়ে দেব। ভাববে না। সব কিছুর জন্য মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয়। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে অতীশ দেখল নির্মলা সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। রাজবাড়ির গেটে অনেকে তাদের ফেরার অপেক্ষায় আছে।

এক প্রশ্ন, টুটুল কেমন আছে !

অতীশ শুধু বলল, ভাল আছে।

নির্মলা চোখ বুজেই আছে। মেস বাড়ির ঠিক দরজার সামনে দেখল হাসি দাঁড়িয়ে আছে। মিণ্টুকে কোলে নিয়ে বউ-রাণী দাঁড়িয়ে।

বউ-রাণী বলল, ভর্তি করে দিয়ে এলি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছে ?

—ভাল।

কারণ অতীশের আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে দরজা খুলে ডাকল, নিমু আমরা বাসায় এসে গেছি।

নির্মলা চোখ মেলে তাকাল। কিছু বলল না। বউ-রাণী, হাসি এবং রাজবাড়ির সবাই দেখল বড় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে নির্মলাকে। নাড়ি ছিঁড়ে গেলে মানুষের এমন হয়।

ওরা কুম্ভকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গেল—কেমন আছে।

—খুব ক্রিটিক্যাল কণ্ডিশন। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে। অপারেশন হতে পারে। অতীশ বউ-রাণীকে ডেকে শুধু বলল, অমলা, ফোন এলে খবর দিও। খারাপ কিছু হলে জানাবে।

প্রাইভেট অফিসে রাতে দুমবার শোয়। ঠিক ফোনের কাছটায় একটা ক্যাম্পখাট বিছিয়ে সে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে কিংবা সকাল পর্যন্ত ফোন তুলে তারই কথা বলার নিয়ম।

দুমবার আজ সারারাত জেগে থাকবে।

টুটুলের সঙ্গে তার ভারি ভাব। একা মানুষ। বয়েস হয়ে গেলে শিশুরাই তার সঙ্গী। টুটুল দেখলেই বলত, দুমবার দাদা, আমায় পরী ধরে দিলে না।

দুমবারের চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

কোথায় কীভাবে কে যে জীবনে নাড়ি ধরে টান মারে কেউ কখনও তা টের পায় না। খোকনবাবুর জন্য সে এতটা টান যেন জীবনেও বোধ করে নি।

অতীশ সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে।

বউ-রাণী বলল, মিণ্টু যা। তোর মার কাছে যা। নির্মলা মিণ্টুকে কোলে নাও। সেই কখন থেকে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এতক্ষণে মনে হল টুটুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়, মিণ্টুর কথা একবারও মনে হয় নি। সে কোথায় কার কাছে আছে মনে ছিল না। টুটুল এতক্ষণ জীবনের সর্বস্ব গ্রাস করেছিল।

—নির্মলা !

—নির্মলা সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে।

—নির্মলা !

বউ-রাণী ছুটে গেল। মিণ্টুকে ওর বুকে দিয়ে বলল, ধর।

নির্মলা মিণ্টুকে বুকে তুলে নিতে গিয়েই ভেঙে পড়ল।

হাসি বলল, দিদি কী করছেন ! এতে টুটুলের অমঙ্গল হবে।

বউ-রাণীর কোনো সন্তান নেই। সন্তানের জন্য কী গভীর উদ্বেগ ভোগ করতে হয় আজ যেন সে প্রথম টের পেল। এই উদ্বেগ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বড় দরকার। মানুষকে আলগা হতে দেয় না। নিঃসঙ্গ হতে দেয় না। মানুষ এরই মধ্যে বেঁচে থাকে বলে, জ্যোৎস্নার মত নিবিড় স্নেহ অনুভব করা যায়।

বউ-রাণী আজ কেন যে গোপনে কেঁদে ফেলল ! শিশুরাই মানুষের জন্য

এক গভীর অরণ্য সৃষ্টি করে রাখে। তারা সেখানে বাঁচে, বড় হয় হেঁটে যায়—আবার এক শিশু আসে পৃথিবীতে—কোনও বানভাসি প্লাবনের মত সে দামাল, সে নিষ্ঠুর, সে স্নেহ মায়া মমতা সব।

অতীশ দরজা বন্ধ করে দিল।

নির্মলা কোনোরকমে বিছানার কাছে এসে মিণ্টুকে শুইয়ে দিল। ঘুমে কাতর। তার ছোট ভাইটাকে কোথায় রেখে এসেছে, সকাল হলেই দুজনকে অভিযুক্ত করবে।—আমার ভাই কোথায়? কার কাছে রেখে এলে? কী হয়েছে! আমার ভাই কোথায় বল! কিছু বলছ না কেন! অতীশ টের পায়, এ আর এক বিপজ্জনক খেলা শুরু জীবনের—। এতটা সে সামাল দেবে কী করে! নির্মলা এবং মিণ্টুর উদ্বেগ যে তাকে পাগল করে তুলবে।

মিণ্টুর মশারি টাঙিয়ে দেবার সময় বলল, নিমু কিছু মুখে দাও।

আর তখনই দরজায় ঠকঠক শব্দ।

কোনও খবর।

হৃৎপিণ্ড উপচে রক্ত ছলাৎ করে অতীশকে নাড়া দিয়ে গেল।

দরজা খুলে দেখল, কুম্ভ, হাসি, রাধিকাবাবু।

অতীশ দেখল, তারা উঠে আসছে।

সে বলল, আপনারা বলুন। চুপ করে আছেন কেন!

হাসি বলল, খাবেন আমাদের বাড়িতে। দিদি কোথায়?

ভয় উদ্বেগ নিমেষে জল হয়ে গেল। সে কেমন কিছুটা হাল্কা বোধ করছে। এত মায়া টুটুলের জন্য তবে সে হৃৎপিণ্ডে পুষে রেখেছে। দরজায় খুটখুট শব্দ উঠলেও ভয় পায়। কে কি খবর নিয়ে আসবে!

সে বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না।

রাধিকাবাবু বললেন, পাগলামি করবে না। এস। মানুষেরই বিপদ আপদ থাকে। এ সময় যে যত অবিচল থাকতে পারে নিয়তি তার কাছে তত জব্দ। ওঠো। খাবে। বউমা, ও বউমা—এভাবে না খেয়ে থাকলে চলবে কেন? বউমার বাপের বাড়ি ফোন করেছ?

—লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। অতীশ বলল।

—সকালে দুমবারকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেব। এস তোমরা।

নির্মলাকে কিছুতেই ওঠান গেল না। কোনও কথা বলছে না। যেন সহসা নির্বাক হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় জীবনেও আর সে কথা বলবে না। কেবল মিণ্টু তার ভরসা। অতীশ বলল, সত্যি খেতে ইচ্ছে করছে না। বমি পাচ্ছে।

ওরা আর জোরজার না করে চলে গেল।

কুম্ভ যাবার সময় বলল, দরজাটা বন্ধ করে দেন। এই কুম্ভকে এখানে

আসার পর থেকে কেমন অবিশ্বাস করে আসছে। আজ কুম্ভ যা করেছে—আসলে তার কেন জানি আজ মনে হল, হোয়াট ইজ রাইট, সে বোধহয় ঠিক জানে না। কুম্ভর এই একটা গুণ অতীশকে মাঝে মাঝে সত্যি ভারি বিব্রত করে। যে কুম্ভ ঠগ, ধাপ্পাবাজ, দুনম্বরী মাল দিয়ে পয়সা কামাবার তালে থাকে, সেই কুম্ভ যেন আজ অন্য মানুষ। তার কেন জানি মনে হয় মানুষ দোষে গুণে। গুণেরই প্রশংসা করা উচিত। কুম্ভ চলে গেলে সে ভারি অসহায় বোধ করতে লাগল।

দরজা বন্ধ করে এসে দেখল নির্মলা মিণ্টুর পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। নির্মলা ঘুমায় নি। ঘুম আসবে না সে জানে। কুলুঙ্গিতে আছে তার শেষ আশ্রয়। সেই ধূপবাতিদান, পাথরের ছোট্ট নারীমূর্তি, মাথায় মুকুট এবং কয়েকটা ফোকর। এই বাতিদানটা হাতে নিতেই সেবারে সে কেমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেছিল। ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলে হয়। পাথরের নারীমূর্তি থেকে এক দূরাতীত আত্মা যেন তার সঙ্গে কথা বলে। সে শুনতে পায় সেই কণ্ঠস্বর। বনি তাকে সাহস দিচ্ছে।

বাতিদানটা হাতে নিয়ে ঠিক বনির মত প্রতিধ্বনি করল, আই উইল প্রেইজ দ্য লর্ড নো মেটার হোয়াট হেপেনস।

বনির তারবার্তা ভেসে আসছে।

এই তারবার্তা থেকে সে সাহস সঞ্চয় করে। টেবিলের উপর সে বাতিদানটা রেখে তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলছে না। গভীর জগৎ যেখানে জন্মমৃত্যু কালের যাত্রা রূপক মাত্র। যেখানে বেঁচে থাকা এক অদৃষ্ট শক্তির ইচ্ছে। যেখানে মানুষের বেঁচে থাকা কোনও এক অলৌকিক জলযানের মতই শুধু আশ্চর্যভ্রমণ। যে ভ্রমণ ক্ষণকালের আবার চিরকালের। তার পরবর্তী বন্দর কী সে জানে না, সে ভেসে চলেছে। অতীশের মনে হয় এ এক যেন মানুষের নিরবধি ভ্রমণ—মানুষের, প্রেমের, ঈশ্বর এবং শয়তানের। জন্ম থেকেই শুরু, এ জন্মেই তা শেষ।

বনি বোটে অসহায় বোধ করলে যেমন ঈশ্বরের বন্দনা করত, আজ অতীশও বনির মত ঈশ্বরের বন্দনা করছে। সে জানে না সত্যি ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কিনা, সে সেভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসীও নয়, তার মনে হয় এক মহাজাগতিক শক্তি তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনও দেব-দেবী কিংবা স্বর্গ-নরক সে বোঝে না। মানুষের মৃত্যুই শেষ। এক জীবনেই ইহকাল পরকাল—তবু আজ সে বড় নিরাশ্রয়—টুটুলের জন্য সেই অজ্ঞাত শক্তির কাছে মাথা হেঁট করে প্রায় বনির কথাগুলিই বলে যেতে লাগল—ইয়োর স্টেডফাস্ট লাভ, ও লর্ড ইজ অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ অল দ্য হেভেনস। ইয়োর ফেইথফুলনেস রিচেস বিয়ণ্ড দ্য ক্লাউডস। ইয়োর জাস্টিস ইজ

অ্যাজ সলিড অ্যাজ গড'স মাউণ্টেন। ইয়োর ডিসিশানস আর অ্যাজ ফুল অফ উইজডম অ্যাজ দ্য ওসেনস আর উইথ ওয়াটার।

অতীশ আবার কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সে সব ভুলে যাচ্ছে। ইহকাল পরকাল জন্মমৃত্যু টুটুল মিণ্টু সব। তার একটাই যেন কাজ আর্চি'র প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে বনিকে রক্ষা করা। বনিকে না টুটুলকে!

সে বিড়বিড় করে বকছে, ও গড মাই স্ট্রেনদ, আই উইল সিঙ ইয়োর প্রেইজেস ফর ইউ অ্যাজ মাই প্লেস অফ সেফটি।

যেন সেই দূরাতীত কোনও অস্তিত্ব তাকে দিয়ে আজ শপথ করিয়ে নিচ্ছে। সে তার পুত্রের মঙ্গলার্থে যে কোনও অবিশ্বাসের কাছে মাথা নত করতে পারে। এমন কী সব কীটপতঙ্গ, ধূলিকণা, ঝড়, পাখি, গাছপালা সবার কাছে। মাথা নত করে সে পুত্রের জীবন ভিক্ষায় পাগল হয়ে উঠছে।

সে উঠে দাঁড়াল। সেই ধূপবাতিদান, যার মারফত সে দূরাতীত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, এক রাতে সে ঘোরের মধ্যে দেখেছিল মূর্তি'টা বনির অবয়ব ধারণ করছে, তাকে আজ হাতে তুলে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলবে বলে চিৎকার করে উঠল, টুটুলের কিছু হলে আমি তোমাকে খুন করব। আই শ্যাল কিল ইউ। ইউ নো মি ভেরি ওয়েল।

আর তখনই নির্মলা বিছানা থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। তার শাড়ি সায়া পর্যন্ত ঠিক সেই। সে ছুটে এসে বলছে, তুমি কী বলছ! কার সঙ্গে কথা বলছ!

অতীশ আর পারল না। বলল, আমি খুন করেছি। আমার নিস্তার নেই, আমাকে পিঠে ক্রুস বহন করতেই হবে।

—তুমি খুন করেছ!

—হ্যাঁ। আর্চি'কে। আর্চি'কে আমি খুন করেছি।

—কোথায়, কবে!

—জাহাজে। সে বড় নিষ্ঠুর হত্যা নির্মলা। তুমি বুঝবে না। কেন আমি খুন করেছিলাম। কেন কেন! কেন খুন করতে গেলাম! আমি আর্চি'র চেয়ে এক বিন্দু মহৎ নই। আমি অমানুষ। আমার পাপের শেষ নেই। বলতে বলতে সে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

—তুমি কী পাগল হয়ে যাচ্ছ!

—আমি জানি না। আমি জানি না।

—না তুমি কখনও খুন করতে পার না। তোমার মাথা ঠিক নেই। এস। বলে হাত ধরে শিশুর মত বিছানার পাশে নিয়ে গিয়ে বলল, শোও। তুমি এমন করলে আমরা যাব কোথায়!

অতীশের মধ্যে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে। সে কেমন বোকার মত বলল, আমি চিৎকার করছিলাম! কখন!

—না তুমি কিছু কর নি। কপালে যা আছে হবে। তুমি আমাদের সব। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কেউ নেই।

আর তখনই দরজায় খুটখুট শব্দ।

—কে? কে?

অতীশ দৌড়ে গেল।

—বাবু ফোন।

—ফোন!

আর সঙ্গে সঙ্গে অতীশ বলল, সব শেষ। আমি কি করব! দুহাত তুলে সে ঘরের ভেতরে ছুটে গেল। বাতিদানটা হাতে তুলে আছাড় মেরে ভাঙতে গেল।

নির্মলা অসহায়। আর্ত চিৎকার। সে পাগলের মত অতীশকে ঝাঁকাতে থাকল। ফোন, কার ফোন! কোথা থেকে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন! অতীশের মনে হল, সব শেষ। তবু মানুষকে শেষ খবরের জন্যও অপেক্ষা করতে হয়। শেষ খবর মানুষের জন্য কী থাকে কেউ জানে না। বাতিদানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে দরজা খুলে সোজা অন্দরমহলের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল। ফোন ধরে বলল, কে? কে আপনি? আপনি কি সেই ঈশ্বর!

—আমি সুরুচিদি। ঈশ্বর নই। টুটুলের জ্ঞান ফিরেছে। ক্রাইসিস কেটে গেছে। তুমি অতীশ বলছ তো?

অতীশের যেন বিন্দুমাত্র আর ক্ষমতা নেই নড়বার। শুধু বলল, হ্যাঁ, আমি অতীশ।

এত উত্তেজনা, অধীরতার পর এমন শুভ বার্তা মানুষের জন্য অপেক্ষা করতে পারে সে জানত না। তার হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে গেল।

দুমবার বলল, কে ফোন করেছিল?

সে বলল, সেই দূরাতীত রহস্য দুমবার। তুমি ঠিক বুঝবে না। সে আবার ছুটতে থাকল। ঘরে ঢুকে দেখছে নির্মলা দরজার ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ স্থির। বাতিদান কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছে নির্মলা।

তার কোনও আজ কাণ্ডজ্ঞান নেই। সে নির্মলাকে বুকের কাছে টেনে আনল। পাগলের মত জড়িয়ে ধরে বলল, টুটুলের জ্ঞান ফিরেছে। ক্রাইসিস কেটে গেছে। সুরুচিদি ফোনে জানিয়েছে। সে নির্মলাকে বুকের মধ্যে সাপটে ধরে এসব বলার সময়ই মনে হল নির্মলাও সাপটে ধরেছে। কতকাল

পর সেই স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা যেন আবার ফিরে পেয়েছে উভয়ে।
গাছপালায় ঝড় উঠে গেছে। ডালে পাতায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকায় আশ্চর্য
সুষমা।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত